জোয়ারের বেলা

গোপাল হালদার

এই উপন্যাসের কাল মোটের উপর ইং ১৮৭০ থেকে প্রায় ইং ১৮৯০ পর্যন্ত। সমসাময়িক কোনো কোনো অনুষ্ঠান ও ঘটনার উল্লেখ তাতে আছে, কিন্তু চরিত্র সমূহ ও মূল কাহিনী কাল্পনিক, অথবা একালের মানুষেরই রূপ সেকালের ভূমিকায়।

১৫।৯।৫৪ লেখক

শ্রীযুক্তা অমিয়ারাণী সিংহ

পূজনীয়াসু—

জোয়ারের বেলা

—লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ—

কথা-সাহিত্য : ভূমিকা, নবগঙ্গা, ভাঙন, স্রোতের দীপ, উজান গঙ্গা, একদা, অন্যদিন, আর-একদিন, পঞ্চাশের পথ, উনপঞ্চাশী, ১৩৫০, ধূলিকণা ॥

প্রবন্ধ সাহিত্য : সংস্কৃতির রূপান্তর, বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, (ছাপা নাই : বাজে লেখা, বাঙালী সংস্কৃতির রূপ, এ যুগের যুদ্ধ) ॥

১

উপাসনা চলিতেছিল: হে নিরাকার পরম ব্রহ্ম! তুমিই সত্য। তোমার স্পর্শেই আমাদেব সকল সম্পর্ক সত্য হইয়া উঠে। তোমাকে হারাইলে পরিবারও শত্রু। পিতা বলি, মাতা বলি, পত্নী বলি, বন্ধু বলি, যাহাকে তোমার পরিচয়ে পাই না, তাহাকে আমরাও আপনার বলিতে পারি না। তোমার স্বীকৃতিতেই আত্মীয় আত্মীয় হন, পতি পতি হন, পত্নী পত্নী হন। তুমিই পতির পতি, সকলের স্বামী!

চিন্তাহরণ চমকিত হয়। এই বোধ অন্তরে লইয়া সে ধর্মজীবনের পথে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা তিন জন পিতা, মাতা, আত্মীয়-বন্ধু সকলের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া ঢাকা হইতে কলিকাতায় পলাইয়া যায়,—চিন্তাহরণ, তাহার অনুজ গিরীশ এবং তাহাদের বন্ধু রাজীব চৌধুরী। সমাজের উৎসব-দিবসে স্বয়ং আচার্য তাহাদের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দান করেন। অথচ পিতা, মাতা, মাসীমা কাহাকেও চিন্তাহরণ শত্রু মনে করে নাই। তাহার বালিকা বধূ মনোরমার কথাও বার বার মনে পড়িয়াছে। চিন্তাহরণ অবশ্য তাহাকেও তখন আপনার সংকল্প জানায় নাই; জানাইলেও সে তাহা বুঝিতে পারিত না। সেদিন উৎসব-মুখর গম্ভীর পরিবেশে আচার্যের অগ্নিমন্ত্র তাহাদের দৃঢ় সংকল্প ভক্তিশুদ্ধচিত্তকে সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছিল—'সূর্যচন্দ্র তারকার আরতিতে সমুজ্জল বিশ্বনিয়মের অধিপতির' উদ্দেশে চিন্তাহরণও আপনার অন্তরের প্রদীপটি তুলিয়া ধরিতে যাইতেছে। হঠাৎ তাহার সম্মুখে জাগিয়া উঠিল একটি মুখ; সরল জিজ্ঞাসার মত সে মুখখানি মনোরমার।

রাম-নির্বাসিতা সীতার মত জিজ্ঞাসা সেই মুখেঃ শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য ?—এই সীতা-পরিত্যাগ কি রঘুকুলের ধর্ম ? ইহাই কি তোমার সত্যধর্ম, চিন্তাহরণ ? —চিন্তাহরণের পদতলে যেন মাটির পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিয়া জানাইল সূর্যচন্দ্র তারকার আরতিতে সমুজ্জ্বল বিশ্ববিধানই শুধু সত্য নয়, এই মাটির পৃথিবীও তাহার সকল সম্পর্কও সত্য, তাহাকেও অস্বীকার করা যায় না।· একদিন সে মনোরমাকেও ত অগ্নিসাক্ষী করিয়াই ধর্মপত্নী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। আচার্যের কণ্ঠ তখন আত্মনিবেদনে আকুল, 'হে প্রাণের প্রাণ। আজ আমি তোমার শরণ লইলাম। তোমার চরণ আশ্রয় করিলাম।' চিন্তাহরণ লুটাইয়া পড়িল সেই চরণের উদ্দেশে। ক্রমে হৃদয় আশ্বস্ত হইল, সেই ভক্তিধারার শান্ত ঔজ্জ্বল্যে আবার তাহা পবিত্র হইল, স্থির হইয়া উঠিল। তিনিই আত্মার আত্মীয়, প্রিয় তাঁহারই জন্য প্রিয়, আত্মীয় তাঁহারই জন্য আত্মীয়। – কিন্তু চিন্তাহরণ সেই জিজ্ঞাসা-ভরা মুখ ভুলিতে পারে নাই—সত্যধর্ম বটে, কিন্তু এই কি ন্যায়ধর্ম ? একটি একটি করিয়া আত্মীয়-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, আর সেদিনের মত চিন্তাহরণের মনে পড়িয়াছে —সেই জিজ্ঞাসার মত মুখ। বারবার চিন্তাহরণ প্রার্থনা করিয়াছে,— হে কল্যাণময়, পথ দেখাও তুমি চিন্তাহরণকে, পথ দেখাও সেই অসহায় পত্নীকে—পথ দেখাও, হে পতির পতি, অগতির গতি তুমিই। ···

কাল সেই মনোরমা স্বচ্ছন্দ মাতৃযের মত' আপনিই সেই পথ বাহিয়া আসিয়া চিন্তাহরণের গৃহে উপস্থিত হইয়াছে। তাহার প্রার্থনা বৃথা হয় নাই। মনোরমা মায়ের সহিত গিয়াছিল বারুণী স্নানে; শহরে ফিরিয়া চলিয়া আসিল এখানে। ইহা ত শুধু মনোরমার পতিগৃহে আগমনই নয়; 'পর্বত গৃহ ছাড়ি বাহিরায় যবে নদী'—সেদিন সমতলের পৃথিবীই শুধু ধন্য হয় না, সমুদ্রও শুদ্ধ হয় সত্যের সহজ আবির্ভাবে। তাই চিন্তাহরণ ও রাজীব দুইজনে মিলিয়া তাহাদের গৃহে আজ ব্রহ্মোপসনার এই

আয়োজন করিয়াছিল। ব্রাহ্মধর্মের ও 'রিফর্ম' আন্দোলনের এমন জয় বিনা উপাসনায়, বিনা উৎসবে তাহারা ব্রাহ্মসমাজের যুবক বন্ধুরা যাইতে দিতে পারে না। রাজীব কালই কলিকাতায় গিরীশকে লিখিয়াছে, 'স্বাধীনতা বোধ ইহাকে বলে না তো আবার কাহাকে বলে? আমাদের মেয়েরা শুধু লক্ষ্মী নয়, শক্তিস্বরূপিনী; এই সত্যটাই আমরা ব্রাহ্ম যুবকেরা জগতের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিব। এই স্রোতকে কে রোধ করিবে?— দেশে জোয়ার লাগিয়াছে!' সেই জিজ্ঞাসার মত মুখখানা আর চিন্তাহরণের সম্মুখে নাই, আজ তাহাতে চিন্তাহরণ লেখা দেখিতেছে গৃহজীবনের সহজ আশ্বাস। বিধাতা তাহাদের জীবনকে নূতন শ্রীতে এবার মণ্ডিত করিবেন।

মনোরমা পার্শ্বস্থ গৃহে দ্বারের আড়ালে বসিয়া প্রার্থনা শুনিতেছিল; ইহাই ব্রহ্মোপাসনা। তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহে জন সাত-আট শিক্ষিত ভদ্রলোক; আরও যাঁহাদের আসিবার কথা, তাঁহারা আসিতে পারেন নাই। মেঝের উপর পাটি পাতা। গৃহের এক প্রান্তে বেদি, বেদির উপরে আচার্য বসিয়া উপাসনা পরিচালনা করিতেছেন। তাহার সম্মুখে ক্ষুদ্র জল চৌকির মত বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি চৌকি; দুই পার্শ্বে গুটি দুই করিয়া মোম বাতি। ধূপদানী হইতে ধূপের ধোঁয়া উঠিতেছে, গৃহে তাহার গন্ধ। দুইদিকে দীপাধারে আরও দুইটি প্রদীপ। মনোরমা একদৃষ্টে আচার্যকে দেখিতেছিল—দীর্ঘশ্মশ্রু পুরুষ, সুগঠিত দেহ, বিশাল বক্ষ, গম্ভীর কণ্ঠস্বর। চোখ মুদিয়া কাহাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি কি বলিতেছেন? ভগবানকেই বলিতেছেন কি? ভগবানকেই বলিতেছেন। কিন্তু যেন কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতেই তিনি চান। কি বলিতেছেন, মনোরমা এক একবার শোনে, বুঝিতে চেষ্টা করে, "মাতা বলি, পিতা বলি পত্নী বলি, বন্ধু বলি, যাহাকে তোমার পরিচয়ে পাই নাই, তাহাকে আমরাও আপনার বলিতে পারি না।" কে সে? পরম ব্রহ্ম— ইনিই ত ভগবান্? তিনিই ত মাতা পিতা—সব। তবে পরিবার

শত্রু হইবে কেন? কিন্তু না তিনি মাতা নন, পিতা নন, পত্নী নন, বন্ধু নন, পতিও নন, পতির পতি। তবে পতি নন কেন?

হঠাৎ পার্শ্বের বাড়িতে শাঁখ বাজিয়া উঠিল! আগেই সাঁজ দেখাইয়াছে, ইহাদের গৃহদেবতার এইবার আরতি হইবে। কাঁসর ঘণ্টার শব্দে এই ঘরের পরিবেশ যেন আহত বিদ্ধ হইতে লাগিল। আচার্য চোখ বুজিয়া ছিলেন। একটু পরে চোখ খুলিলেন—গোল চোখ দুইটিতে একটা অস্বাভাবিক অস্থিরতা আছে, বুঝা যায়। এখন তাহার অস্থির দৃষ্টি চিন্তাহরণ ও রাজীবের মুখের উপর বিচরণ করিতে লাগিল; তাহার যেন বক্তব্য,—এইটুকু সুব্যবস্থা তোমরা করিতে পার নাই?

চিন্তাহরণ তিরস্কৃত গৃহস্বামীর মত মস্তক অবনত করিয়া রাহল। কিন্তু রাজীব অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। নিশ্চয়ই ইহার প্রতিবিধান প্রয়োজন। ইহা তাহাদেরই উপাসনা-সভার অবমাননা। রাজীব উঠিয়া যাইতেছিল। চিন্তাহরণ তাড়াতাড়ি নিরস্ত করিল: না রাজীব! জানোই ত ওরা শুনবে না। মিছিমিছি গোলমাল বাধবে। বরং জানালা দুয়ার বন্ধ করে বসো।

একটা প্রতিবিধান করিতে না পারিয়া রাজীব অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। কাঁসর ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। জানালা বন্ধ করিয়া দিলে শব্দ আর তত উৎকট ঠেকিতেছিল না। রাজীব বলিল: আচার্য্য মশায়, আপনি উপাসনা পরিচালনা করুন। দেখি, ওদের কাঁসর-ঘণ্টার কত জোর আর কত জোর আমাদের প্রার্থনার।

রামজীবন চক্রবর্তী খাড়া হইয়া বসিলেন। মাথা নাড়িয়া সানন্দে বলিলেন: ঠিক!—এইরূপ বিরোধিতা তাঁহাদের ব্রাহ্মদের প্রায়ই সহিতে হয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, দৌরাত্ম্য ইত্যাদি অত্যাচারে পশ্চাৎপদ হইবার মত মানুষ তাঁহারা ব্রাহ্মরা নহেন। এই সব বাধা-বিঘ্ন নিরস্ত করিবার কৌশলও সেই প্রয়োজনেই তাঁহারা আয়ত্ত করিয়াছেন।

রামজীবন বলিলেন : ঠিক, আসুন আমরা একসঙ্গে ব্রহ্মসঙ্গীত করি, বলিয়া নিজেই তিনি আরম্ভ করিলেন :

মনে করো শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর।

রামজীবনবাবুর এইটিই প্রিয় ব্রহ্মসঙ্গীত।

মনোরমা অবাক্ হইয়া থাকে। রাগ রাগিণীব জ্ঞান না থাকিলেও সে সংকীর্তন শুনিয়াছে, ভালো কীর্তনও শুনিয়াছে, শৈশবে পিতার সহিত মালসী গাহিয়াছে, কৈশোবে মেয়েদের বিবাহের গানে, ছেলেদের উপনয়নের গানে, অন্য মেয়েদের সঙ্গে যোগ দান করিয়াছে। সুর জ্ঞান তাহার আছে। এমন বেসুবা গলায় এতগুলি বয়স্ক পুরুষেব চীৎকার সে আব শোনে নাই। বাজীব ও রামজীবন চক্রবর্তীর উৎসাহ দেখিয়া সে অবাক হইয়া চাহিযা দেখিল—তাহারা যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে। হয়ত তাহার হাসি পাইত, কিন্তু চাহিয়া দেখিল চিন্তাহরণও এই সমবেত সঙ্গীতে যোগদান করিয়াছে, তবে তাহার স্বর মৃদু, অত নিবঙ্কুশ সঙ্কোচমুক্ত নয। কিন্তু সেও গানে যোগদান করিয়াছে, ব্রহ্মসঙ্গীত যে।

অতএব মনোরমা মনের হাসি সংযত করিল। সে বিমূঢ ভাবে বসিয়া রহিল। শঙ্খ-ঘণ্টা থামিয়াছিল, কিন্তু গান আর থামে না। রামজীবন চক্রবর্তীর কোনো দিকে দৃষ্টিই নাই।

শেষে হঠাৎ চৈতন্য হইল—সকলে নীরব যে। এইবার তাহাদের গান থামিল। চক্রবর্তী মহাশয় বিজয়ীর মত দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। সত্যধর্মের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, বিরাম লইবার এখন অবকাশ পাইয়াছেন। কপালের মুখের ঘামে দাড়ি সিক্ত হইয়া গিয়াছে ; দুই এক ফোঁটা দাড়ি বাহিয়া বুকে পড়িতেছে। রামজীবন চাদরের প্রান্তে মুখ মুছিয়া লইলেন। একটু কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিলেন। সকলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হইল। এইবার উপদেশ দান

আরম্ভ হইবে। রাজীব আবার জানালা খুলিয়া দিল—মুক্ত বাতাস পাইয়া যেন সকলে বাঁচিল।

জগদীশ্বর। তুমি আমাদিগকে পিতার স্নেহ, মাতার মমতা, পত্নীর প্রেম সব কিছু দিয়া ধন্য করিয়েছ জানি। কিন্তু হে মহাবিচারক! তুমি ন্যায়ের অধীশ্বর। আমাদিগকে তুমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার সৈনিকরূপে নিযুক্ত করিয়াছ, তাহা যেন একবারও বিস্মৃত না হই। তুমি আমাদের বল দিয়ো, সাহস দিয়ো, অন্ধ সমাজের পাপের বিরুদ্ধে আমরা যেন দাঁড়াইতে পারি। তুমিই বল, তুমিই সাহস, তুমিই জীবন।—ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং।

কণ্ঠস্বর তখনো বিজয়দৃপ্ত। কিন্তু একবার আচার্য থামিলেন, সম্ভাষণ করিবার মত কণ্ঠে উপদেশ দান আরম্ভ করিলেন।

বিধাতার মহদভিপ্রায় আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ, এই দুর্মতি ও দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের একমাত্র আশা। সেই সত্যেরই প্রকাশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—আজ আমাদের এই ভ্রাতা ও এই ভগ্নীর সংসারে। কাহার সাধ্য হইল—বিধাতার মহৎ অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিবার? ভ্রাতা চিন্তাহরণ! আপন সহোদর গিরীশের সঙ্গে সঙ্গে যেদিন তুমি অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিলে সেদিন হইতে কত ভাবেই না হিন্দু সমাজ তোমাকে বাধাদানের চেষ্টা করিয়াছিল। তোমার সহধর্মিণীকে পর্যন্ত তোমার পার্শ্বে তাঁহারা আসিতে দেয় নাই। কিন্তু সত্যধর্মের জয়গতি কে প্রতিরোধ করিতে পারিল? এই ত আমাদের ভগিনী—আজ যথার্থ ধর্মপত্নীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হইলেন। সমাজের কত মিথ্যা তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল,—লোকাচার দেশাচারের কত বাধা তাঁহার মন বুদ্ধি সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল, কিন্তু আমাদের সত্যের সাধনা তাঁহাকে আজ উদ্ধার করিয়াছে।

হে ভ্রাতা, হে ভগ্নী, তোমাদের মধ্য দিয়া আজ সত্যধর্ম আপনার

শক্তিতে প্রকাশিত হইল—তোমরা আজ ব্রাহ্মসমাজের নবজীবনের ব্রত গ্রহণ করিলে! এসো, অগ্রসর হও, সত্যের দীক্ষা গ্রহণ করো! —ভ্রাতা চিন্তাহরণ! তুমিও তোমার ধর্মপত্নী মনোরমা, তোমরা ধন্য, আমরা ধন্য, ধন্য সেই নিরাকার পরম ব্রহ্ম! ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং।

চিন্তাহরণ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে শান্ত-স্বভাব যুবক, ভাবুক প্রকৃতির মানুষ। রাজীবের মত কর্মে উদ্যোগে ঝাপাইয়া পড়িতে উৎসাহ বোধ করে না, আবার গিরীশের মতও বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন আত্ম-বিশ্বাসের জোরে আত্মীয় বন্ধু সকলকে আঘাত করিয়া অগ্রসর হইতেও তাহার ক্লেশ বোধ হয়। অনেকটা নির্মলচরিত্র শ্রদ্ধাশীল পুরুষ বলিয়াই তাহাকেও লোকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। কাল হইতে তাহার সেই শান্ত মনে একটা উৎসাহের স্রোতও দেখা দিয়াছে—মনোরমা তাহার সহিত যোগদান করিয়াছে। যে গভীর মানসিক সংকটে সে গোপনে গোপনে এতকাল আত্ম-পীড়িত হইতেছিল কাল অভাবনীয় রূপে তাহার মীমাংসা হইয়া গেল, চিন্তাহরণ এই কথা ভাবিয়া বারে বারে গভীর কৃতজ্ঞতায় ও আনন্দে ভগবানের উদ্দেশে নত হইয়া পড়িতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহার মনে এই চেতনা ও জাগ্রত হইয়াছে যে ইহাতেও বিধাতার একটা মহদভিপ্রায় আছে। মনোরমাকে লইয়া চিন্তাহরণের সত্যকারের ব্রাহ্মদম্পতির জীবন গঠন করিতে হইবে; সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রে সেই ব্রাহ্ম আদর্শ স্থাপন করাই হইবে তাহাদের জীবনের ব্রত।

মনোরমা এই উপদেশ ভালো করিয়া শুনিতে পায় নাই। বড় উত্তেজিত কথাবার্তা ও কণ্ঠস্বর এই ভদ্রলোকের। চোখ দুইটি দিয়া যেন তিনি চিন্তাহরণকে গ্রাস করিতে চান। কথায় কেমন এক বলপ্রয়োগের চেষ্টা। মানুষকে ধাক্কা মারিতে চায় তাঁহার কথা। মনোরমা তাঁহার

কথার অর্থ করিতে পারে না; কিন্তু ধাক্কাটা টের পায়। তাহার নিজের মেরুদণ্ড দৃঢ় হইয়া উঠে—কেন? এমনভাবে মনোরমার উপর জোর খাটাইবার অধিকার তোমরা কি করিয়া লাভ করিলে? দেবদেবী লোকাচার দেশাচার, শ্বশুর শাশুড়ী,—ইহারা মনোরমাকে বঞ্চিত করিয়াছে? আর তোমরা? তোমরা যখন তাহার স্বামীকে তোমাদের সমাজে টানিয়া লইতেছিলে—তখন কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছিলে মনোরমার কি হইবে?

রামজীবন আহ্বান করিলেন. ভ্রাতা চিন্তাহরণ! ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে তোমাদের জীবন-শিক্ষা শোনাও।

চিন্তাহরণের মনে শিহরণ জাগিল। সে শান্তভাবে প্রস্তুত হইয়া লইল। আজ প্রভাতেই উপাসনান্তে চিন্তাহরণ রচনা করিয়াছে—

তোমারে প্রণাম করি, হে কল্যাণময়!
তোমারই কল্যাণ বহে দুঃখের আকাশ
নিদ্রাহীন নক্ষত্রের সম জ্যোতির্ময়,
রাত্রিরে অভয় দেয় উষার আশ্বাস।

তোমার আশ্বাস রহে মানুষেরে ঘিরি,
যত তাপ, যত জ্বালা, দেহের দহন,
প্রাণের পিপাসা লয়ে কেঁদে কেঁদে ফিরি,—
ভুলে যাই—মানুষ যে অমৃত-নন্দন।

অমৃতের পুত্র মোরা, হে অমৃতময়!
আমার মাঝারে তুমি করেছ সঞ্চয়
তোমার প্রেমের সুধা, যত আলোড়ন
বিচ্ছেদ বিরোধ দ্বন্দ্ব, প্রিয়ের পীড়ন—
তোমারি যে প্রেম তাহা; জানিনু নিশ্চয়
তুমি জায়া, তুমি পতি! জয় জয় জয়!

রাজীব উৎসাহ ভরে বলিয়া উঠিল—জয় জয় জয়।— তারপর—চতুর্দ্দশপদী! চিন্তদাদা! কখন লিখলে? কোথায় লেখাটা রেখেছ? দাও 'নারীশক্তির' জন্য।

রামজীবনও উৎসাহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আচার্য, কাজেই স্থিরস্বরে বলিলেন: পরে দেখিও, রাজীব, এখন উপাসনা হোক। ভ্রাতা চিন্তাহরণ, উত্তমরূপেই উদ্বোধন করিয়াছেন, এখন উপাসনা হোক্।

চিন্তাহরণ বিনীতভাবে আরম্ভ করিল: হে পরমব্রহ্ম! চৈতন্য-স্বরূপ! আমরা আজ তোমার চরণে আশ্রয় লইলাম, তুমি আমাদের ভার গ্রহণ করো।

এতদিন একা একা পথ চলিতে গিয়াছি, নিজেকেই বড় করিয়া দেখিয়াছি—তোমাকে দেখিতে চাহি নাই। তোমার পথ যে ক্ষুরধার তাহাই শুধু জানিয়াছি; কিন্তু তোমার পথ যে পরম সরল, তাহা বুঝিতে চাহি নাই—পরিবারকে দেখিয়াছি শত্রু! কিন্তু সরল অন্তরের কাছে তোমার পথ কত সরল—আজ তোমার এই সরল সাধ্বী কন্যা তাহাই বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার মধ্য দিয়া দেখিলাম তোমার অপার করুণা, তোমার আশ্বাস, তোমার আশীর্বাদ। কেহই দূর নয়, পর নয়; সবই তোমার আশ্রিত। আমাদিগকে পথ দেখাও, হে জ্যোতিঃস্বরূপ, আলোক দেখাও, আলোক দান করো—আলোকে আলোকময় হউক তোমার বিশ্বভুবন। আমরা জীবন ভরিয়া ঘোষণা করি—একমেবাদ্বিতীয়ং, জয় জয় জয়। ...

মনোরমা অপলকনেত্রে চাহিয়া ছিল। সে জানিত—তাহার স্বামী বিদ্বান, বিনয়ী, শান্তস্বভাব। ইহাও শুনিয়াছে—চিন্তাহরণ পদ্য লিখে। পিতৃকুলে ও শ্বশুরকুলে সেও কিছুটা শিক্ষালাভ করিয়াছে। কিন্তু সেই লেখা বুঝিবার মত বয়স হইতে না হইতেই সে চিন্তাহরণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সেই কবিতা বুঝিবার, পড়িবার আর সুযোগ

লাভ করে নাই। শাশুড়ীকে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস পড়িয়া শুনাইযাছে। কিন্তু আজ চিন্তাহরণের কবিতা শুনিয়া তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কখন চিন্তাহরণ ইহার মধ্যে এই সব লিখিল? মনোরমা অবশ্য তাহার মর্ম সম্পূর্ণ বুঝে নাই। কিন্তু ইহা বুঝিয়াছে তাহা ভগবানের উদ্দেশে লেখা।

'তুমি জায়া, তুমি পতি'—বুঝি সেই অর্ধনারীশ্বর দেবতার কথা—ইহারাও তাঁহাকে না মানিযা পারেন না। যাহাই হউক বড ভালো লাগিয়াছে মনোরমার এই পদ্য খণ্ড! ভালো লাগিয়াছে বারে বারে মনে মনে জপ করিতে এই কথাটি 'জয়—জয়—জয়।' কাহার জয়, কিসের জয়, তাহা মনোরমা জানিতে চাহে না। কথাটিই যথেষ্ট। সে সৌভাগ্যবতী, মহা সৌভাগ্যবতী সে।

চিন্তাহরণ উপাসনা আরম্ভ করিতে মনোরমা লজ্জায় গর্বে আপনার মধ্যে আপনি আরক্তিম হইয়া উঠিল।

'তোমার পথ কত সরল—আজ তোমার সরল সাধ্বী কন্যা তাহাই বুঝাইয়া দিলেন'—কি পাগল চিন্তাহরণ! তাহার কথা এইভাবে দশজনের সম্মুখে বলিতেছে! আর বলিতেছে ত একেবারে এই সব কথা বলিতেছে।...

কাল সন্ধ্যায় চিন্তাহরণ যখন বলিল, তোমাকে তখন ডাক দিতে সাহস করি নি, ভেবেছি তুমি ত আমার ধর্মের কথা জানো না।

মনোরমা তখন তাহার কথা বুঝিতে পারে নাই। বলিয়াছিল, তোমার ধর্ম আমার ধর্ম পৃথক নাকি?

চিন্তাহরণ একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইল, বলিল: আমি যে ব্রাহ্ম—

তা জানি।

চিন্তাহরণের বিস্ময় বাড়িয়া গেল: আর তুমি হিন্দু।

হলই বা—

তবে?—চিন্তাহরণ প্রশ্ন করিল, সে নিজেও কিছুই নিশ্চিত করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না।

'তবে আবার কি? আমি মেয়ে মানুষ। আমার ধর্ম হল সংসার-ধর্ম।' —ইহাই তাহার স্বর্গগতা শাশুড়ীর শেষ বাণী, 'আপন সংসার আপনি গ্রহণ করো। স্বামীই সংসার।'

চিন্তাহরণ কেমন বিমনা হইল। ইহা তো চিরদিনের কথা; কিন্তু সে ব্রাহ্ম, নারীর স্বাধীনতায় ও ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী। নারীকে এত সীমাবদ্ধ দেখিলে সে খুশী হইবে কিরূপে? বলিল: কিন্তু তুমি ত ব্রাহ্মধর্মের কথা জানো না।

এ কথা ত জানি—তা তোমার ধর্ম। তাতেই আমার হবে।

চিন্তাহরণ মনের আশা ও আশঙ্কা গোপন করিয়া সহজভাবে জানিতে চেষ্টা করিল: তুমি কি সেই ধর্মের পথে আমার সহায় হবে?

মনোরমা মিনতি করিল: তুমিও কি আমাকে সাহায্য করবে না? —তোমার ধর্মই যে আমার ধর্ম।

শান্ত, স্থিরপ্রকৃতি পুরুষ চিন্তাহরণ। হঠাৎ ব্যাকুলতা ফুটিল তাহার কণ্ঠস্বরে: তুমি কি সত্যই আমাদের সমাজে আসবে?

না হলে তোমার কাছে এলুম কেন?—সহজ, সচ্ছন্দ কণ্ঠ মনোরমার।

চিন্তাহরণের এ কি হইল! দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। মনোরমা বুঝিতেই পারে নাই—কি ব্যাপার! চিন্তাহরণ বলিল: সত্যই, 'সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর, তাহার সহায়।' প্রভু! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

মনোরমা বুঝিল—ভগবানের উদ্দেশেই চিন্তাহরণের এই নিবেদন। সে প্রথমে একটু বিস্ময় ও কৌতুক বোধ করিল—ইহাতে এমন কি ভগবানের করুণা চিন্তাহরণ দেখিল? কিন্তু ইহাও বুঝিল—তাহার

স্বামী সাধু পুরুষ, ভক্তিমান। আর, সত্যই ত, ভগবানের দয়া না হইলে কি মনোরমাই এইভাবে তাহার স্বামীকে লাভ করিতে পারিত?

হঠাৎ চিন্তাহরণ তাহার কাছে বসিয়া গেল: আমি তোমাকে আগে বুঝতে পারি নি, মনোরমা! আমাকে ক্ষমা করো।—চিন্তাহরণ মনোরমার হাত ধরিল।

ওকি, ওকি কথা বলছ তুমি?—আমার যে মহাপাতক হবে।

আশঙ্কায় আনন্দে মনোরমার সর্বদেহে রোমাঞ্চ হইতেছিল। হাত কাঁপিতেছে, বুক কাঁপিতেছে, সে হাত ছাড়াইবার সাধ্য নাই, তবু অবনত হইয়া প্রণাম করিতে গেল। প্রণাম করিয়া আর উঠিতে পারে না। দুই চক্ষু ছাপাইয়া জল পড়িতেছে।

সহসা যেন এতদিনের দূরত্ব সংকোচের সব ব্যবধান পথ ছাড়িয়া মনোরমাকে একান্তভাবে চিন্তাহরণের কাছটিতে আনিয়া ফেলিয়াছে। চিন্তাহরণ দুই হাতে প্রণতদেহা পত্নীর মুখখানি উঠাইয়া পূর্ণচক্ষে উহার পানে তাকাইল। মনোরমার দুই গালে তখনও অশ্রুচিহ্ন, তাহার চোখের পাতা আপনিই নামিয়া আসিল। একটি ক্ষণের মধ্যে মাথার মধ্যে কেমন সব ভাব-ভাবনা তালগোল পাকাইয়া চিন্তাহরণকে বুঝি বড়ই অসহায় করিয়া ফেলিল। সেই সংযত শান্ত মুখে শত ভাব বিদ্যুতের মত খেলিতেছে। কিন্তু অকস্মাৎ চিন্তাহরণ একরকম প্রায় ছুটিয়া বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল। মনোরমা অবাক বিস্ময়ে বিস্ফারিত দুটি সজল চক্ষু চিন্তাহরণের গমনপথে মেলিয়া তাকাইয়া রহিল। কেমনতর মানুষ ইনি?

২

গিরীশ আসিয়াছে।

রাজীব উৎসাহবশে যাহাই লিখুক, কলিকাতায় বসিয়া গিরীশ তাহার পত্র পড়িতে পড়িতে মোটেই উৎসাহ পায় নাই।

গিরীশ স্থির করিয়াছিল—এইবার সে তাহার তিনজনার কলেজে পাঠের ব্যবস্থা করিবে, আর গিরীশের জন্য ইস্কুলে মাষ্টারি করিয়া চিন্তাহরণের অর্থসংস্থান করিতে হইবে না। উচ্চতম কৃতিত্ব লাভ করিয়া গিরীশই এইবার বি এ পাশ করিবে, মোটা বৃত্তিলাভ করিবে; তখন বড় দাদা বি-এ পড়িবেন, রাজীব এফ্ এ পড়িবে;—অবশ্য রাজীবকে চিত্রিসারের চৌধুরী পরিবারের সংসারের ব্যয় বহন করিতে হয়। এইবার কিন্তু অর্থার্জনের দায়মুক্ত হইয়া তাহারা তিনজনে 'রিফর্মের' কাজে আত্মনিয়োগ করিবে। উদ্যোগবলে বিদ্যা, উন্নতি, প্রতিষ্ঠা—এই সব অর্জন না করিয়া গতানুগতিক ভাবে সংসার পাতিয়া বসা,—গিরীশ কল্পনাও করিতে পারে না। ছুটির সময়ে গিরীশ প্রচারের ভার লইয়া ঘুরিতেছে বলিয়াই ঢাকা আসিয়া এই সব কথা আলোচনা করিয়া স্থির করিতে পারে নাই। কিন্তু গিরীশের সেই কল্পনা এখন সম্পূর্ণ ওলট-পালট হইয়া যাইবে। কোথা হইতে আসিয়া পড়িল মনোরমা তাহাদের মধ্যখানে। শ্বশুর-বাড়ি, হিন্দুসমাজের দেবদেবী এই সব ছাড়িয়া মনোরমা কখনো চিন্তাহরণের নিকট আসিবে, গিরীশ সেরূপ ভাবে নাই। সে বুঝিয়াছিল—পীতাম্বর গাঙ্গুলী এই সূত্রটিকে হাত ছাড়া করিবেন না; তাহার জোরেই তিনি চিন্তাহরণকে হিন্দু-সমাজে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিবেন। কারণ চিন্তাহরণের দুর্বলতা তিনি বিলক্ষণ জানেন। তাই গিরীশ মনে করিয়াছিল—আইন ও সমাজের বাধা এড়াইয়া মনোরমার

পরিণয়ের একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবে। রাজীব তখন সেইরূপ চেষ্টাও করিতেছিল, কিন্তু তাহা তাড়াতাড়ি হইয়া উঠিতে পারে না। আইনের বাধা আছে, মনোরমাও তাহাদের সহযোগিনী নয়। এখন অবশ্য তাহা অসম্ভব, মনোরমাই গিরীশের গৃহে আসিয়া পড়িয়াছে। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল? রাজীব মনে করিয়াছে মনোরমা আপনি সহজেই আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছে। রাজীব কিছু বোঝে না! পীতাম্বর গাঙ্গুলী নূতন দার পরিগ্রহ করিয়াছেন, নূতন শাশুড়ী এই পুত্রবধূকে গাঙ্গুলী বাড়ির কর্ত্রীপদ হইতে স্থানচ্যুত করিয়াছে—গৃহ হইতেই হয়ত বিতাড়িত করিয়াছে। মা-মাসীর আমল হইতে গিরীশ দেখিয়াছে ঘর, সংসার, কর্ত্রীপদ লইয়া এই সমাজের অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের নানা কদর্য কলহ, নানা ইতরতা ও শোচনীয় নীতিহীনতা। কন্যাকে চিন্তাহরণের হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছে—হয়ত সেই চতুরা মহিলা মনোরমার জননীই। মোহবশে চিন্তাহরণও তাহাকে পত্নী হিসাবে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে নাই। আর রাজীব মনে করিয়াছে ইহাই বুঝি নারীজাগরণ, জাতীয় স্বাধীনতার আয়োজন,—রাজীবের সব কিছুতেই উৎসাহ! না-বুঝিয়া না-শুনিয়া সেই গ্রাম্য ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হিন্দু মহিলার আগমনেই ইহারা গৃহে ব্রহ্মের উপাসনার উদ্যোগ করিতেছে। গিরীশের পক্ষেও এখন অন্য কথা ভাবিয়া লাভ নাই। মানিতেই হইবে—মনোরমা তাহার ভ্রাতৃবধূ,—'বউঠান।' কিন্তু গিরীশ জানে—ব্রাহ্মসমাজেও এই বিবাহিতা হিন্দু পত্নীদের লইয়া দীক্ষিত ব্রাহ্মদের কত বিপদে পড়িতে হইতেছে। বড় বড় নেতাদের কথা সে জানে,—আচার্যদেরও অনেকের গৃহ ও পরিবার হইতে কিরূপে কুসংস্কার বিদূরিত করা যাইতেছে না, সে বিষয় লইয়াও তাহাদের যুবকদের ক্ষোভ রহিয়াছে। বেদি হইতে যিনি উপদেশ দেন, তিনিও গৃহে গুরু পুরোহিতকে ঠেকাইতে পারেন না। গিরীশ এই কথা ভাবিতেও ক্লেশ পায়—তাহারা নবীন ব্রাহ্মযুবকেরা

নিজেদের গৃহে, সমাজে এইরূপ হিন্দুধর্ম ও আচার নিয়ম সহ্য করিবে। খ্রীষ্ট মিথ্যা বলেন নাই—গিরীশ মনে মনে আবৃত্তি করে,—লবণ যদি তাহার গুণ হারায় তবে তাহা আর লবণ থাকে না, তাহা পরিত্যজ্য। চিন্তাহরণ ও রাজীব হয়ত বুঝিতেও পারিতেছে না—বিপদ কোথায়; কোন্ কুসংস্কার দুর্নীতিতে তাহারা অলক্ষিতে জড়াইযা পড়িতেছে।

অতএব গিরীশ দুই একদিনের মধ্যেই ঢাকা যাত্রা করিল।

বাহিরের ঘরে তক্তপোষে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রাজীব কাগজে কি লিখিতেছিল—সম্ভবত তাহাদের সাময়িক পত্রের ঠিকানার মোড়কের উপর গ্রাহকদের নামও ঠিকানা। গিরীশকে দেখিয়া সে অবাক্। আনন্দের আতিশয্যে লাফাইয়া উঠিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল।

গিরীশ! বলা নেই, কওয়া নেই—একেবারে হঠাৎ।

মুটিয়ার মাথা হইতে মোটপত্র নামাইতে নামাইতে গিরীশ বলিল: কেন, চিঠি লেখা থাকলে সম্বর্ধনার আয়োজন করতে নাকি? তোমাদের ত এখন সম্বর্ধনার জোয়ার লেগেছে।

হাসি মুখে বলিলেও কথাটা গিরীশ খুব স্বচ্ছন্দে বলিতে পারে নাই।

কিন্তু রাজীবের কানে উহার অভিযোগ অংশ গ্রাহ্য হইল না। গিরীশকে দেখিয়া সে উৎফুল্ল। হাস্যমুখে বলিল:

বলো কি, তোমার জন্যও তেমন একটা সম্বর্ধনা প্রয়োজন নাকি? একেবারে জোড়ে নেমেছ ষ্টীমার থেকে? তা হলে বউঠানকে খবর দিতে হয়—আলপনা দিন, বধূবরণ করুন্।

গিরীশ গম্ভীর হইল। বলিল: রাখো, মুটেটা বিদায় করে দিই আগে।

তা করো। আমি বউঠানকে খবর দিয়ে আসি—দাদা ত এখন বাড়ি নেই।

কোথায় গিয়েছেন ?

কাছেই ; এখনই আস্‌বেন।—

বলিতে বলিতে রাজীব পার্শ্বের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া ভিতরের দিকে ছুটিয়া গেল : বউঠান। গিরীশ! গিরীশ এসেছে! আপনার 'দেবর লক্ষ্মণ।' কিন্তু কি জ্বালা! দাদা বাড়িতে নেই, আপনিও কথা বলবেন না আমার সঙ্গে। তা আমাকে নয় না দেখলেন দু'চক্ষে, ঘোমটা টেনেই থাকুন। এখন গিরীশের ত স্নানাহারের ব্যবস্থা করতে হবে। দু' দিন ষ্টীমারে এসেছে।

একা একটা লোকের যতটা কোলাহল সম্ভবপর রাজীব তাহা বাধাইয়া দিয়াছে। উচ্চ কণ্ঠ, মুক্তমন, সে একাই একশত। গিরীশ একাকী ঘরে কয়েক মুহূর্ত একটু অস্বস্তি বোধ করিল। তাই ত, তাহাদের সহিত মনোরমার কথা না বলিবারই সম্ভাবনা। তাহাদের সম্মুখে হয়ত সে বাহিরও হইবে না।' দেবর হইলেও সে বালক নয়। এইরূপই সামাজিক নিয়ম। এবং পারিবারিক নিয়মও ইহাই ছিল পূর্বে। এদেশের মেয়েরা একেবারে গৃহকর্ত্রী না হইতে শ্বশুরকুলে অবগুণ্ঠন অন্তরালেই থাকে।

গিরীশ একবারে দাঁড়াইয়া ঘরটা দেখিয়া লইল—কোথায় যেন কি নূতন ঠেকিতেছে। বাহিরের এই ঘরেই তো সেই তাহাদের সাপ্তাহিক পত্রের অপিসঘর ছিল। 'নারী-শক্তি'র আপিস ঘরও পরে সেখানে চলিয়া আসে। শহরে ব্রাহ্মরা দুই চারজন সর্বদাই অন্য স্থান হইতে আসেন যান,—মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা আসামের পথেও ছাত্রবন্ধুরা আসেন। কলিকাতার পথে এইখানেই দুই-একবেলা স্নানাহারও তাঁহাদের করিতে হয়—শহরে আত্মীয় পরিজন যাহারা আছে—তাহারা ব্রাহ্মদের স্বগৃহে স্থান দিতে ভয় পায়। এই গৃহই তাহাদের ব্রাহ্মযুবকদের অপিসঘর, অতিথিশালা, সভাগৃহও। ইহার

মধ্যস্থলের দুয়ার দিয়া ভিতরে ঢুকিলে বড় ঘর—তাহাদের তিনজনের বাসগৃহ সেখানে। তিন বন্ধুতে তাহারা একযোগে এই বাড়িতে প্রথম দীক্ষাগ্রহণান্তে আসিয়া আপনাদের বাসস্থান রচনা করিয়াছিল; ছিল মাত্র—তিনখানি মাদুর, তিনটি লেখাপড়ার ডেস্ক। নিজেরা রাঁধিত, জল তুলিত, বাজার করিত, সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী। কালক্রমে কিছু কিছু আসবাবপত্র সঞ্চয় হইয়াছে। বিছানা লেপ, ছোট বসিবার চৌকি ক্রমে আসে, বেতের মোড়াও থাকিত। কিছুদিন পূর্বে গিরীশই তিনখানি তক্তপোষের ব্যবস্থা করিয়াছিল। বাহিরের এই ঘরে গতবার গিরীশ চেয়ার-টেবিলেরও বন্দোবস্ত করে—কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক ও ব্যাপটিষ্ট মিশনের সাহেবদের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা ও গতায়াত ছিল; তাঁহারাও গিরীশের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। চৌকিতে কেন, মাদুরেও তাঁহারা পা ছড়াইয়া বসিতে পারেন, বসিবেনও। মিশনারি সাহেব ত পা মুড়িয়াও বসেন। কিন্তু ইংরেজ অধ্যাপক বলেন, 'খাড়া বসা, খাড়া চলা, খাড়া দাঁড়ানো, মিষ্টার গাঙ্গুলী, ওটা ইংলিশ লাইফের শিক্ষা। আমাদের আসবাব-পত্রও ছাখো তদুপযোগী—চেয়ার-টেবিল। তাতে শোয়া চলে না, গা এলিয়ে দিতে পারিবে না, ঝিমুনো অসম্ভব। সেজন্য আমাদের ভিন্ন ধরণের জিনিসপত্র।—যখন কাজ করবে সোজা হয়ে বসো, যখন আরাম করিতে চাও, আরাম কেদারায় গিয়ে বসো।' গিরীশ মানে—সত্যই কাজের মানুষের জাতি ইংরেজ—কুড়েমির প্রশ্রয় দেয় না। বাইরের আপিসঘরে ইহা বুঝিয়া গিরীশও চেয়ার টেবিল স্থাপন করিয়াছিল। একজন ইংরেজ কর্মচারীর বদলি হইয়া গিয়াছিল। তাহার জিনিসপত্র বিক্রয় হইল। খান দুই চেয়ার ও একটি টেবিল গিরীশ কিনিয়া আনে—এখন হইতে চেয়ার টেবিলে বসিয়া তাহারা আপিস চালনা করিবে,—সাহেবেরাও দেখা করিতে আসিলে উহাতেই বসিবেন। গিরীশ এখন দেখিল সেই চেয়ার টেবিল ঘরের কোনে, মধ্যখানে তক্তপোষ

পড়িয়াছে—উহাতে বসিয়াই রাজীব কাজ করিতেছিল। শুধু তাহা নয়। আরও পরিবর্তন,—সেই বাহিরের ঘর হইতে ভিতরের ঘরে প্রবেশের দ্বারটাও এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভিতরে যাইতে হইলে এখন পার্শ্বের সরু বারান্দা দিয়া যাইতে হয়,—গিরীশও তাহাই গেল। সেই খোলা দুয়ার আর নাই। বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র শিক্ষক যে কেহ আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহা আর সম্ভব নয়। গিরীশ এইবার বুঝিল · হাঁ, এই গৃহে একটা সদর-অন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই ভিতরের ঘর হইতে একটি তক্তপোষ ইতিমধ্যে বসিবার আপিস ঘরে আসিয়া গিয়াছে,—আর একটিও যে এখনি আসিয়া যাইবে, তাহাও গিরীশ বুঝিতে পারে। চেয়ার টেবিলের স্থান আর হইবে না। অবশ্য উপরের তলায় সংকীর্ণ একটি চিলে কোঠা আছে; সেখানেও উহার স্থান থাকিতে পারে,—পূর্বে সেখানে গিরীশই তাহার অধ্যয়নের স্থান নির্বাচন করিয়াছিল। কিন্তু উহার যাতায়াতের পথ মধ্যস্থলের বড ঘর দিয়া। তাই এখন তাহা দুর্গম ও সুদূর। তাহাদের তিনজনের নিজস্ব এই গৃহের মধ্যে একটা দূরত্ব রচনা করিয়া দিয়াছে ইতিমধ্যেই এই নূতন ব্যবস্থা।

গিরীশ!—রাজীব ডাকিতে ডাকিতে পুনঃপ্রবেশ করিল।—চলো, বউ ঠানকে প্রণাম করে আসবে।

হুঁ!—গিরীশ উঠিল। একবার বলিল, দাদা নেই?—তারপর বলিল, চলো।

বারান্দার পার্শ্বে উঠান। কুয়া, বাসন-কোষন মাজিবার জায়গা, এঁটো, ছাইয়ের গাদা, সবই বেশ পরিচ্ছন্ন—গৃহকর্মকুশল হস্তের স্পর্শ যেন এই সামান্য স্থানটুকুর মধ্যেও টের পাওয়া যায়। এখানে থাকিতে তাহারা তিনজনেও নিজ হস্তে ঘর দুয়ারে ঝাড়ু দিত। যথেষ্ট তাহারা পরিশ্রম করিত, ব্রাহ্মযুবক হিসাবে শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতার তাহারা পক্ষপাতী। গিরীশ ও রাজীবের অপেক্ষা চিন্তাহরণ তাহা সুচারুরূপ

নিষ্পন্ন করিত, ধীর কষ্টসহিষ্ণু সে। কিন্তু এমন পরিচ্ছন্ন এই বাড়ি তখনো দেখাইত না। রন্ধন, ধোয়া-মাজা প্রভৃতি ব্যাপারে মেয়েরা পুরুষদের অপেক্ষা স্বভাবতই বেশী কুশলী। এই সাধারণ নারী-সুলভ পরিচ্ছন্নতা দেখিয়াই রাজীব এত উৎসাহিত বোধ করিয়াছে,—সে সমস্ত জিনিসকে বিশেষ তলাইয়া বুঝিতে পারে না। হাঁ, ইংরেজরা বলেন, পরিচ্ছন্নতা পবিত্রতারই অনুরূপ। কিন্তু তাহা মনের পরিচ্ছন্নতা, চিন্তার, জ্ঞানের, কর্মের পরিচ্ছন্নতা; শুধু গোবর জল ও ন্যাতার ব্যাপার নয়।

গিরীশ ঘরের ভিতরে পা বাড়াইয়া মানিল,—হাঁ, ঘরটাও সুশ্রী দেখাইতেছে। কাগজপত্র এলোমেলো পড়িয়া নাই, বিছানা মাদুর অগোছাল নাই—এখানে ধুতি ওখানে জামা, এখানে ডেক্‌স্ ওখানে আসন, তাহাও নয়। গুছাইয়া রাখায় ঘরটায় যেন জায়গাও বাড়িয়াছে। কিন্তু মানুষ কোথায়? কাহাকেও গিরীশ দেখিতে পাইতেছে না। অবশেষে চোখ পড়িল—রাজীবের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সে দেখিল—ঘরের অন্যপ্রান্তে এক অবগুণ্ঠনবতী মূর্তি, অন্যদিকে পাশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে—শুধু অনাবৃত হস্ত ও পদদ্বয়ই দেখা যায়। বাধা পাইল গিরীশ। সত্যই, নন্দীগ্রামের পীতাম্বর গাঙুলীর পুত্রবধূ বটে। সমাজ ও পরিবারের নিয়মে গৃহকর্ত্রীর পদে সমারূঢ়া না হইতে তাঁহার এই অবগুণ্ঠন এমনি সুদীর্ঘ থাকিবে। ইহার অন্তরাল হইতেই বাড়ির বউদিগকে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইবে—কোনো বয়োজ্যেষ্ঠা বা বয়োকনিষ্ঠার মারফতে। অন্তত স্বামী, দেবর, শ্বশুর প্রভৃতি পুরুষ সমাজের সঙ্গে তাহার বাক্য বিনিময় নিষিদ্ধ।—সেই সনাতন ধর্ম! সেই নন্দীগ্রামের গাঙুলীবাবুদের নিয়মরীতি! ইহাদের গৃহের স্ত্রী সম্পর্কের পবিত্রতা যে কতটা এই ভাবে রক্ষিত হয় তাহাতো গিন্নি ঠাকুরাণী ও পীতাম্বর গাঙুলীকে দিয়াই গিরীশ জানিয়াছে। অদ্যাপি তাহাই চলিতেছে। শুধু তাহাও নয়, নন্দীগ্রামের চৌধুরী বাড়ির

সেই প্রথা-নিয়ম এই পুরুষে এই চিন্তাহরণ গাঙ্গুলীর উপর আসিয়া চাপিয়া বসিতেছে। গিরীশকেও তাহারই কাছে এখন নতি স্বীকার করিতে হইবে।

রাজীব বলিল, প্রণাম করো।

গিরীশের আর প্রণাম করা হইল না। দুই হাত কপালে ঠেকাইয়াই বলিল: প্রণাম!—একমুহূর্ত পরে বলিল—দাদা আসুন। আমি বাইরে বসছি ততক্ষণ। —বলিয়া সে বাহিরের ঘরে চলিয়া আসি।

কেমন সুর কাটিয়া গেল। কিছুই জমিল না। রাজীব বিড়ম্বিত বোধ করিল। একটা ব্যবধান ছিল, কিন্তু তাহা যে এমন স্থূলভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে তাহা ইতিপূর্বে রাজীব কল্পনা করিতে পারে নাই।

সেই অশোভনতা দূর করিবার জন্যই রাজীব গিরীশের পিছনে পিছনে বলিতে বলিতে আসিল, ততক্ষণ হাত মুখ ধুয়ে নাও, স্নানও তো করতে হবে। বউ-ঠান নিশ্চয়ই একটু খিচুড়ি-টিচুড়ি কিছুর ব্যবস্থা করে ফেলবেন।

গিরীশ উত্তর দিল না। জামা-কাপড় খুলিয়া স্নানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহার গম্ভীর, পথপরিশ্রম-বিরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া রাজীব বলিল, কি হয়েছে তোমার বলো ত, গিরীশ?

গিরীশ এইবার তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, আমার নয়। তোমাদের কি হয়েছে, তাই বরং বলো।

রাজীব সংকুচিত হইল। গিরীশের বিদ্যা বুদ্ধিতে তাহার অসীম শ্রদ্ধা। রাজীব চিন্তাহরণের স্নেহানুগত, কিন্তু গিরীশের সে নেতৃত্বাধীন-গিরীশই তাহাদের মধ্যে তীক্ষ্ণধী, তেজস্বী। তাহার উগ্র যুক্তিতর্কের প্রতিবাদ চিন্তাহরণও করে না। রাজীব সভয়ে বলিল, কেন?

তাও বুঝিয়ে বলতে হবে তোমাকে?—দাদা কোথায়?

রাজীব জানাইল, ওঁর শাশুড়ী এসেছেন এখানে। বউঠান কোথায় গেলেন, তা নিয়ে মিথ্যা গোলমাল না হয় সেজন্য আমরাই তাদের সংবাদ

দিয়ে এসে ছিলাম—'বউঠান এবাড়ীতে এসেছেন'। এদিকে কাল আবার জামাইষষ্ঠী ছিল। জামাইয়ের জন্য ধুতি চাদর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বউঠানের মা।

কি পাঠিয়ে দিয়েছেন ?—গিরিশ তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করিল।

কেন, জামাইয়ের ধুতি চাদর।—রাজীব জানাইল,—বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেননি, চক্রবর্তীরা দূর সম্পর্কের মামাত ভাই তাঁর,—সেখানেই আছেন,—তাদেরও সমাজের ভয় আছে।

গিরীশ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল : তোমাদেরই বুঝি সমাজও নেই সমাজের ভয়ও নেই ?

রাজীব ক্ষীণ হাস্যে বলিল : কি যে বলো ? আমাদের সমাজ ও হিন্দুসমাজ এক নাকি ? আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোক।—রাজীব উত্তেজিত হইল ; কিন্তু কণ্ঠোদ্যমে ফলোদয় হইল না।

তীব্র কণ্ঠে গিরীশ বলিল, সে কথা মনে থাক্‌লে এই জামাইষষ্ঠী করতে কি যেতেন দাদা ?

কে বল্‌লে তিনি জামাইষষ্ঠী করতে গিয়েছেন ? —গিরীশ প্রতিবাদ করে। —তিনি গিয়েছেন আজ ফলমূল কিছু কিনে তাঁকে প্রণাম করে আসতে।—বলিয়াই রাজীবের মনে হইল 'প্রণাম' কথাটা হয়ত গিরীশের মনঃপূত হইবে না। কিন্তু কেন ? রাজীব বলিল, তিনি বয়োজ্যেষ্ঠা, ভক্তিভাজন, বউঠাকুরাণীর মা– প্রণম্যা, ভক্তি ও সাধারণ ভদ্রতা একটা তো আছে।

হাঁ হাঁ আছেই তো—গিরিশ প্রবল কণ্ঠে বলিতে থাকে,—ষষ্ঠী, মনসা, দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুপুরোহিত, ওলা শীতলা—এসবই বা বাদ যাবে কেন। না ?

এই আক্রমণে কিন্তু রাজীবেরও আপত্তি আছে। সেও গম্ভীর হইল। বলিল, ছাখো গিরীশ, তুমি দাদার প্রতি অবিচার করছ। শুধু অবিচার

নয়, মিথ্যা অপমান করছ তাঁকে। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হয়ে আর একজন সভ্যের প্রতি এরূপ দোষারোপ করবার পূর্বে তোমার বোঝা উচিত ছিল—চিন্তাহরণ গাঙ্গুলী তোমার-আমার কারও অপেক্ষা সমাজের আদর্শে কম শ্রদ্ধাশীল নয়। বরং তার মত ব্রাহ্মধর্মকে জীবনের জপতপধ্যান তুমি আমিও করিনি।

কথাটায় উত্তাপ অপেক্ষা আন্তরিকতা বেশি ছিল। গিরীশ তাহা অনুভব না করিয়া পারিল না। তথাপি আপনার অভিমান ও উগ্রতা বজায় রাখিবার চেষ্টায় সে বলিল: এতদিন তাই জানতাম। দাদা আমার পথপ্রদর্শক, গুরুর তুল্য। আর তাই আজ জিজ্ঞাসা করছি—তোমরা কি জানো তোমরা এখন কোন পথে কোন্ অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়াচ্ছ?

'পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেসের' প্রত্যেকটি উপাখ্যান গিরীশের মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িল খ্রীষ্টের উক্তি, 'মুক্তিপথ সংকীর্ণ দুর্গম। ইহাতে আপোষ মীমাংসার স্থান নাই'।

রাজীবও ছাড়িবে না, সে বলিয়া বসিল, বেশ ত, জানি কিনা তা জিজ্ঞাসা করো। পথ কি, কে আমরা, কোথায় পদক্ষেপ করছি, তা ছাখো, বিচার করো। এ ত যুক্তির কথা, বিচারের কথা—স্বাধীন মতামতের কথা।

'যুক্তি', 'বিচার', 'স্বাধীন মতামত'—গিরীশের নিকট কথাগুলি পরম মূল্যবান, ইংরেজি সভ্যতার মূল কথা, ব্রাহ্মাদর্শ। রাজীব তাহা জানে, তাই সে শক্ত করিয়া কথা কয়টি প্রয়োগ করিল। বলিল: তোমার স্বাধীন মতামত তুমি ব্যক্ত করবে নিশ্চয়ই। কিন্তু দাদা আসুন, তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করো, শোনো, বোঝো,—তারপরে মতামত দাও। —যাও এখন ওঠো ত, স্নান করে নাও, জল-টল খাও তারপর।

গিরীশ উঠিল। দু'দিন পথে চিঁড়া ছাড়া আহার্য জোটে নাই।

মনোরমা ত্বরিতপদে একেবারে রন্ধনশালায় ঢুকিল, গিরীশ তাহা লক্ষ্য করে নাই। লক্ষ্য করিলেও তাহাতে সে কুণ্ঠিত হইত না। তাহার স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিতে সে নিঃসঙ্কোচ—হ্যাঁ, সত্যবাদী হইতে হইলে স্পষ্টবাদী হইতে হয়। যুক্তির ক্ষেত্রে অপ্রিয়বাদী হইতে হয়, চিন্তাহরণের মত শান্তভাষী হইলে চলে না। সত্যের কাছে মাতা পিতা নাই—যীশুই তাহার প্রমাণ।

চিন্তাহরণের আসিতে একটু বিলম্ব হইল। বহু বৎসর পরে এই তাঁহার শাশুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটিতেছে। অবশ্য চক্রবর্তীদের বৈঠকখানাতেই সে বসিয়াছিল—অন্তর্বাটিতে তাহাকে আহ্বানও কেহ করে নাই। দুয়ারের অন্তরালে বহু বালিকা ও বর্ষিয়সী কুটুম্বিনীদের ফিস্‌-ফিস্‌, কুতূহলী দৃষ্টি সে অনুভব করিতে পারিয়াছে। শাশুড়ী বয়স্কা হইয়াছেন—চুল পাকিয়া যাইতেছে। তথাপি যথেষ্ট বড় রকমের অবগুণ্ঠন টানিয়াই তিনি জামাতৃ-সম্ভাষণে আসিয়াছেন—পাড়াগাঁয়ের সেই নিয়ম এখানে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। চিন্তাহরণও তাহাই প্রত্যাশা করিয়াছিল, তাই প্রসন্ন মনেই সে ফিরিয়া আসিয়াছে। চিন্তাহরণ বুঝিয়াছে—তাঁহার কন্যা যে স্বামীর সংসার করিতে আসিবে, ইহা এই গ্রাম্য নারীর পক্ষে অন্যায় মনে হয় নাই; হয়ত বা অভিপ্রেতই মনে হইয়াছে। তিনি অন্তত 'অদৃষ্টের লেখন' রূপে ইহা মানিয়া লইয়াছেন; চিন্তাহরণ ও মনোরমার সঙ্গেও তিনি আত্মীয়তা সংরক্ষণ করিবেন—যতটা তাঁহার অবস্থায় সম্ভব। 'বিয়ে যখন হয়েছে তখন তুমিই তার গতি। না হলে তার ইহকালও নেই, পরকালও নেই।' সেই পুরাতন অদৃষ্টবাদ; —কিন্তু ইহার মধ্যে সমস্তটাই নিষ্ক্রিয়তা নয়। বিধাতার বিধানকে মানিয়া

লইবার একটা শিক্ষাও ইঁহাদের আছে—'নারায়ণ যা করেন তা'ই মঙ্গল'। ইংরেজিতে বলিলে ইহাই 'দাই উইল বি ডান্।' তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক—এই প্রার্থনা কি নিষ্ক্রিয়তা? উহা কি শুধু অদৃষ্টবাদ? না, ইহাকে শুদ্ধমাত্র নিষ্ক্রিয়তা কেন বলিবে চিন্তাহরণ? নিষ্ক্রিয় হইলে সমাজের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মনোরমা তাহার সহিত যোগদান করিতে আসিতেন না; তাহার ধর্মভীরু মাতাও মায়ের প্রাণ দিয়া তাহাকে সমর্থন না করিয়া, বরং সামাজিক দণ্ড-নিপীড়ন ও অপযশের ভয়ে তাহাকে অভিসম্পাত করিতেন। তাহা ত নয়, তিনি বরং বলিলেন, 'নারায়ণ যা করেন তাই মঙ্গল।' নারায়ণ বলিতে হয়ত শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্তিও তাঁহার মনে জাগিতেছে। সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস তাঁহার দূর হয় নাই; কিন্তু ধর্মবোধটা আছে। আন্তরিক একটা ধর্মবিশ্বাস তাঁহাব আছে,—মনোরমারও তাহা আছে। সেই বলেই মনোরমা আন্তরিকভাবে সত্যধর্মকেও গ্রহণ করিতে পারিবে—অবশ্য ধর্মের সেই স্বরূপ বুঝাও মনোরমার প্রয়োজন। চিন্তাহরণ সেইদিকে তাহাকে সহায়তা করিবে। 'সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।'

গিরীশকে দেখিয়া চিন্তাহরণের প্রফুল্ল হৃদয় হঠাৎ যেন থমকিয়া দাঁড়াইল। একই সময়ে, একই দিনে তাহারা তিনজন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। গিরীশের নিকট সেই দিন হইতে পূর্ববর্তী জীবন, পূর্বকৃত কর্ম, কোনো কিছুই আর গ্রাহ্য নয়। দীক্ষার ফলে তাহারা যে জীবন গ্রহণ করিয়াছেন, উহাকে তাহারা বলে 'নবজীবন'। চিন্তাহরণও বুঝে—সত্যই এই জীবনে আর সেই জীবনে বিরাট ব্যবধান, নবজীবনের ব্রত পবিত্র ব্রত। কিন্তু সেই পুরাতন জীবনটাকে অস্বীকার করিলেই ত তাহার অস্তিত্ব শেষ হইয়া যায় না। হইল কোথায়? হইবে কি করিয়া? পিতাও পিতা থাকিবেন, মাতাও মাতা থাকিবেন, আর পত্নী—যিনি ধর্মপত্নী—তাহাকে বর্জন করিয়া ধর্মকে গ্রহণ করা কি সম্ভব?—এই

প্রশ্নের একটা মীমাংসা আজ চিন্তাহরণ উপলব্ধি করিতেছে,—সত্য ধ্বংস করে না, সম্পূর্ণ করে। কিন্তু গিরীশের পক্ষে এখনো তাহা দুর্জ্ঞেয়, এবং সেইজন্য অগ্রাহ্য।

গিরীশের উষ্মার প্রথম উত্তাপটা রাজীবের সঙ্গে তর্কে কাটিয়া গিয়াছিল, চিন্তাহরণের সঙ্গে কথায় তাহার ক্ষোভ প্রথম তেমনভাবে প্রকাশ পাইল না। চিন্তাহরণ ভিন্ন রকমের মানুষ—উচ্ছ্বাসে উৎসাহে সে উদ্বেলিত হইবে না; গিরীশের মত আঘাত করিতে,—বা আঘাত পাইলে রাজীবের মত প্রতিঘাত করিতে,—সে ব্যস্ত হয় না। তাহার স্থির দৃষ্টি তখন আরও গভীর হয়, শ্মশ্রুমণ্ডিত প্রশান্ত মুখে একটা বিষাদের ছায়া দেখা দেয়। ইহা জানিলে আর তাহাকে আঘাত করা সহজ নয়। গিরিশও তাহা পারে না।

গিরীশ অভিযোগের কণ্ঠে বলিতে পারিল মাত্র,—এ তুমি কি অভাবনীয় জটিলতায় জড়িয়ে পড়লে দাদা!

চিন্তাহরণ মৃদু হাস্যে বলিল: এ ত অভাবনীয় নয়, গিরীশ। এতদিনে আমাদের প্রয়াস সার্থক হল, এইমাত্র। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা বরাবরই বলি—আমরা ভাঙতে আসি নি, গড়াটাই সম্পূর্ণ করতে চাই। তুমি যা বলতে সেই খ্রীষ্টের কথা—আই কাম নট টু ডেস্ট্রয়, বাট টু ফুলফিল।

গিরীশ এবার জোর দিয়া বলিল,—না, দাদা, এভাবে খ্রীষ্টের নামকে তুমি তোমার দুর্বলতার সঙ্গে জড়াতে পারবে না। তা অন্যায়। এমন কি, তোমাকেও বলব—এ তোমার পক্ষে আত্মপ্রতারণা। সত্যের সুনীতির সুরুচির সম্পূর্ণতা দান করেছেন খ্রীষ্ট। বিধাতার বিধানকে তিনি পূর্ণ করেছেন পৃথিবীতে। তিনি পূর্ণ মানব—'একে হোমো!'

মানব-মাহাত্ম্যের বিগ্রহ তিনি। হিন্দু সমাজের মিথ্যাচার, কুসংস্কার, পাপ, এসবকে তুমি ওকথা বলে সমর্থন করতে চেষ্টা করো না।

চিন্তাহরণ ধীরভাবে বলিল,—তা বলিনি। মিথ্যাচার, পাপ, কুসংস্কার সব সমাজেই আছে। যে সমাজেই তা থাকে মিথ্যাচার, পাপ ও কুসংস্কার ছাড়া তা আর কিছু নয়। কিন্তু সত্যও কিছু না কিছু সব সমাজেই আছে। আমাদের সমাজের সেই সত্যকে সম্পূর্ণ করাই আমাদের কাজ।

গিরিশ এইবার ক্ষুব্ধ হইল: আমাদের সমাজের সেই সত্যটা কি? বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ, আমরণ ব্রহ্মচর্য বা পাপাচারে ডুবিয়ে মারা বিধবাকে, আর ইট পাথর থেকে এই তোমার ষষ্ঠী শীতলা সকলের নিকট মাথা খোঁড়া?

গিরীশের ক্রোধ চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চিন্তাহরণ জানে ইহা শুধু ক্রুদ্ধ মানুষের কথা নয়, ইহা গিরীশের অভিমতও; এ সমাজের মন্দটাই তাহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আর সত্যই সেই মন্দ, সেই মিথ্যাচার নিতান্ত কম নয়। চিন্তাহরণ তথাপি জানে—তাহাই এই সমাজের পক্ষে চূড়ান্ত কথা নয়।

সে বলিল: এ কি ঠিক কথা হল? আজ নয় এই সমাজ অধঃপতিত হয়েছে, পঙ্গু, পরাধীন, পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত। কিন্তু এই সমাজেই ব্রহ্মবাদী ঋষিরা আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদেরই মন্ত্র অসতো মা সদ্গময়, তমাসা মা জ্যোতির্গময়, মৃর্ত্যো র্মা অমৃতং গময়।

গিরীশের সেই সম্বন্ধেও আসলে গভীর বিশ্বাস নাই। কিন্তু কথাগুলি ব্রাহ্মধর্মের মূল কথা। আর, কথাগুলি এই দেশেরই ভাষায়। তাই একেবারে বলা যায় না—এই দেশ, এই জাতি, এই সমাজ চিরদিনই বর্বর কুসংস্কারাবদ্ধ, অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। বরং বলা যায়—ব্রহ্মোপাসনা এই দেশেরই প্রাচীনতম সাধনা। কিন্তু উহা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার

আদি সমাজের মতবাদ, গিরীশ তাহাতে বিশ্বাসী নয়। তাই সে বলিল: সে কবেকার কথা ছেড়ে দাও! বেশ ত উপনিষদ এই সমাজে কে জানে? এরা জানে কালী, কৃষ্ণ, শিবলিঙ্গ, আর এই তোমার ওলাই মঙ্গল-চণ্ডী শীতলা ষষ্ঠী;—যে সবের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম। তুমি হিন্দুসমাজের এসবই আশ্রয় করেছ।

চিন্তাহরণ একটু আহত হইল: এসব আশ্রয় করেছি?

গিরীশ একটু সামলাইয়া লইল: অর্থাৎ প্রশ্রয় দিচ্ছ, আর প্রশ্রয় দিলেই আশ্রয় করতে হয়।

শান্ত ভাবে চিন্তাহরণ বলিল: কি তুমি শুনেছ, তা ত জানি না। কিন্তু বোধহয় আমার সম্বন্ধে ভুলই শুনেছ।

গিরীশ আবার ক্ষুব্ধ হইল। এত সাধু সরল সাজিতে চাহে কেন তাহার দাদা? গিরিশ বলিল, শুনিনি—দেখছি। তুমি বাল্যবিবাহকে স্বীকার করছ দেখছি; বহু বিবাহও অস্বীকার করতে পারবে না। তুমি কাল জামাই ষষ্ঠীর আশীর্বাদ পেয়ে আজ গিয়েছে কুটুম্ব সম্ভাষণ করতে, আগামী কাল তোমাকে যেতে হবে পূজার প্রসাদ নিতে। তারপর একটু থামিল গিরীশ। তারপর যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল, কঠিন ভাবে স্থির স্বরে বলিয়া ফেলিল,—তুমি একজন হিন্দু মেয়েকে এনে তোমার গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেছ—জানি তিনি হিন্দু মতে তোমার বিবাহিতা পত্নী, আমারও তাই ভ্রাতৃজায়া, প্রণম্যা। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মরা সেই হিন্দু নিয়ম রীতি সংস্কার মানি না, মানতে চাই না। আমাদের নিকট এ বিবাহের মূল্য নেই, বরং এ একটা অনাবশ্যক জটিলতা। শুধু তাই নয়, কুসংস্কার; শয়তানের কুটিল চক্রান্ত, ছলনা, প্রলোভন—

চিন্তাহরণ সেই সংযত গভীর দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইয়া রহিল, গিরীশের ক্ষোভ জলিয়া উঠিতেছে। ক্রোধ তো প্রতিবাদের দ্বারা শান্ত করা যায় না। তাহাকে সময় দিতে হইবে। উপশম হওয়া চাই, যুক্তিও

তখনই গিরীশ শুনিবে। গিরীশ আবার বলিয়া চলিল, কেন বল্‌ছি ?—কি করে তুমি তোমার হিন্দু স্ত্রীকে নিয়ে কার্যতঃ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে জীবন-যাপন করবে ? তিনি কি আমাদের ধর্ম গ্রহণ করেছেন ? তিনি ব্রাহ্ম সাধনা গ্রহণ করবেন বলছেন ? ত্যাখো দাদা, ব্রাহ্ম ধর্ম কি গুরুর মন্ত্র ? কানে দেবার মত জিনিস। ওঁ, হ্রীং ফট্‌, ওঁ তোট, তোটয়, বল্‌লে আর হয়ে গেল ! মনে করে ত্যাখো না নিজেদের কথা ? কতখানি জ্ঞান, কি চিন্তা, কি তপস্যা—কত রাত্রি দিনের প্রার্থনা, ব্যাকুলতা, অসম্ভব নিপীড়ন ও বেদনা সহ্য করে আমাদের পেতে হয়েছিল এই সত্যের সন্ধান। তাও কতটুকু আমরা পেয়েছি—কতটুকু আমরা অগ্রসর হয়েছি ? ইতিমধ্যেই সমাজের মধ্যে 'মানুষ পূজা', 'গুরুবাদ' বাসা বাঁধতে চাইছে,—স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ পর্যন্ত এ দুর্বলতার প্রশ্রয় দেন। ওদিকে সমাজের নেতাদেরও গৃহে তাদের হিন্দু পরিবার-পরিজন পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার আঁকড়ে আছে। 'পরিবার শত্রু'—কেশববাবুও তা বুঝতেন, বলতেন। সমাজের একমাত্র ভরসা আমরা ব্রাহ্ম যুবকেরা। জ্ঞানে, ধ্যানে কর্মে সমস্ত দুর্নীতি, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমরা আমরণ শপথ নিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করছি—লুথার-কালভিনের সেই মহাযুদ্ধ আমাদের সম্মুখে। আর তুমি এ সময়ে আমাদের দলত্যাগ করে চললে—তোমার হিন্দুপত্নীর নামে।

রাজীব অনেকক্ষণ ধৈয ধারণ করিয়াছিল, আর পারিল না, বলিল, চুপ করো, গিরীশ! হিন্দু হউক, খ্রীষ্টান হউক, তিনি মহিলা—আমাদের বউঠান। আর তা যদি না মানো—তাহলেও কি অধিকার আছে তোমার আমার এমন ভাবে তাঁকে তাঁরই স্বামীগৃহে—তাঁর প্রায় সামনেই—তাঁকে অপমান করি।

গিরীশ একটু হতবুদ্ধি হইল। তারপরেই দাঁড়াইয়া উঠিল, বেশ। তাঁর স্বামীগৃহে তিনি থাকুন, আমি যাচ্ছি।

গিরীশ!—চিন্তাহরণ উঠিয়া তাহার হস্তধারণ করিল।—কি অযথা কথায় তুমি রাগ করছ! রাজীব, তুমি এমন অন্যায় কথা কেন বললে?

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া রাজীবও একটু বিমূঢ় হইয়া গেল; সত্যই, কি সে বলিযা ফেলিল! আত্মপক্ষ সমর্থনের তথাপি একটা ক্ষীণ চেষ্টা না করিয়া রাজীব পারিল না।

—মানছি আমার কথাটা অন্যায় হয়েছে। কিন্তু বউঠানেরও ত একটা মানঅপমান আছে। আমরা ব্রাহ্ম যুবক, মহিলাদের সেই সম্মান বিস্মৃত হলে কিসের ব্রাহ্ম আমরা?

চিন্তাহরণ বলিল, সে সম্মান গিরীশই কি বিস্মৃত হবার মত মানুষ? বরং সেই আদর্শ আমরা বিস্মৃত হই বলেই গিরীশের এত ভয়। সে ই ত আমাদের এদিকে পথ প্রদর্শন করেছে—তাঁব কাছেই ত তোমার-আমার নারী-স্বাধীনতার শিক্ষা। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এমন করে আমরা না হলে দাঁড়াতে পারতাম কি? নারীশিক্ষা, নারীজাতির উন্নতি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রধান লক্ষ্য।

কিন্তু গিরীশ বসিবে না। বলিল, একটু অসুবিধা হল তোমাদের, কিন্তু ক্ষমা করো। আমি রামজীবন বাবুর ওখানে আজ থাকব, কাল চলে যাব কুমিল্লা—সেখানে প্রচার সভা আছে ক'দিন পরে।

গিরীশের হাত ধরিয়া চিন্তাহরণ রাখিতে পারিল না। গিরীশ উঠিয়া জামা পরিতে গেল, জিনিস-পত্র গুছাইতে লাগিল। রাজীব অপরাধীর মত শেষে বলিল, গিরীশ, আমাকে ক্ষমা করো;—কিন্তু উত্তর পাইল না। চিন্তাহরণ ব্যাকুল উদ্বিগ্ন মুখে পদচারণা করিতে লাগিল; ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল: না, গিরীশ। না, এ হবে না। তোমার আমার গৃহ স্বতন্ত্র নয়। এ গৃহে তুমি থাকলে তবেই তা আমার; —তুমি আমাকে ত্যাগ করলে, বিধাতা আমার প্রতি বিমুখ হয়েছেন বুঝব।

সে ঠিক নয় দাদা। মানুষ বিবাহ করে সংসার বাঁধে। তখন স্বতন্ত্র গৃহ বাঁধাই শ্রেয়ঃ। এই সভ্য জগতের নিয়ম ;

যাদের সমাজে তা নিয়ম তাদের সমাজে তাই হয়। তোমার-আমার সমাজ তত সংকীর্ণ নয়। সেরূপ একক সংসারের কথা থাক, আমরা ছোট সংসারকে বৃহত্তর সংসার করব ; তাকে আমরা আমাদের সমাজে, 'সাধন-আশ্রমে' পরিণত করবারও আশা রাখি।

গিরীশ উত্তর দিল না। ধৌত বস্ত্র উঠানে শুকাইতেছে, তাহা তুলিয়া আনিতে গেল। বস্ত্র হস্তে ফিরিয়া আসিতে গিয়া দেখিল—এ কি, দুয়ার রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া সেই অবগুণ্ঠনবতী—মাথা অবনত, শুধু গৌরাভ করাঙ্গুলি ও পদদ্বয়ই তাহার দেখা যায়। গিরীশ থমকিয়া দাঁড়াইল--পথ ছাড়িয়া না দিলে গিরীশ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না। গিরীশ দাঁড়াইয়া আছে—মূর্তি নিশ্চল—শুভ্র পদদ্বয়ে চাঞ্চল্য নাই, করাঙ্গুলি আবদ্ধ।

গিরীশ মরীয়া হইয়া বলিল, আমি ঘরে যাব।

কিন্তু সে মূর্তি নীরব। হঠাৎ সে বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মার্জনা করিল। ততক্ষণে চিন্তাহরণও আসিয়া গিয়াছে। অবগুণ্ঠনবতী তাঁহার দিকে ফিরিয়া অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বলিল, আমিই মন্দভাগিনী! কিন্তু তোমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে বিচ্ছেদ ঘটাতে আমি আসিনি। আমি থাকব না। আমাকেই তোমরা বিদায় দাও—বলিয়া চিন্তাহরণের চরণে সে অবনত হইয়া পড়িল।

গিরীশ বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নাটকীয় পরিণতি অবশ্য ঘটিল না। বিচ্ছেদান্ত পরিণতির সম্ভাবনা দূর করিতে চিন্তাহরণকেই বেশ বেগ পাইতে হয়। রাজীবকেও সেরূপ

চেষ্টা কম করিতে হয় নাই। গিরীশকে শান্ত করা সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়, কারণ সে গিরীশ। সর্বত্র তাহার মতই গ্রাহ্য হইবে, সে জানে ইহাই নিয়ম, তাহার অধিকার। রাজীবের কথা অপমানের মত গিরীশকে বিঁধিল। কিন্তু রাজীবও সহজে অন্যায় স্বীকার করিবার মত মানুষ নয়—একজন মহিলাকে না জানিয়া, না শুনিয়া এমন অপমান করা? আসলে কথাটা এইখানেই—মনোরমাকে মানুষরূপে জানিবার মত আগ্রহ ও ধৈর্য লইয়া গিরীশ আসে নাই অথচ একথা গিরীশ নিজের কাছে মানিবে না। রাজীব বুঝিতেছিল শেষ মীমাংসা যাহাই হউক, এখনকার মত গিরীশের নিকট তাহাকেই নতি স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য মনোরমাকেও মর্যাদায় ও স্বাধিকারে এই গৃহে স্বীকার করিতে হইবে তাহাদের সকলকে—বিশেষ করিয়া গিরীশকে। মনোরমা আকস্মিকভাবে তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হওয়ায় উহার একটা নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইল। —গিরীশ একটু চমকিত হইয়া বুঝিয়াছে—ইহাকে সাধারণ একজন রমণী ভাবিয়া সে হয়ত সুবিচার করে নাই। বেশ ত তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এই নারী। তাহার পর হইতে গিরীশ ও রাজীব তাহার সহিত দেবরোচিত আত্মীয়তায় বাক্যালাপও করিতে পারে, জড় পুঁটুলি নয় মনোরমা। রাজীবের যুক্তি ও মিথ্যা নয়—মনোরমাকেই যদি তাহাদের আদর্শানুগামিনী করিয়া তুলিতে না পারে, তাহারা তবে'এ সমাজের মহিলাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম কি করিয়া প্রচার করিবে? নিজের আদর্শে গিরীশের এই বিশ্বাস নাই কেন?

নাটকীয় ঘটনার সমাপ্তিটা তাই মিলনান্ত হইল—প্রয়োজনীয় সংস্কারেরও আয়োজন হইল —ব্রাহ্মোপসনা হইতে ব্রাহ্ম-সহধর্মিণীর উপযোগী সমুদয় শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা মনোরমার জন্য চিন্তাহরণ করিতেছিল। মিশনের মিস্ ইর্ক সপ্তাহে আপাতত তিন দিন করিয়া মনোরমাকে পড়াইতে আসিবেন, পরে এই গৃহেই এই পাড়ার জন্য তিনি

অন্তঃপুর-শিক্ষার একটি স্কুল খুলিবেন—কথাটা পাকা করিয়া গিরীশ কতকটা আশ্বস্ত বোধ করিল।

গিরীশ তখন আবার আলোচনা আরম্ভ করিল—সে বৃত্তিলাভ করিয়া উত্তীর্ণ হইলে এইবার চিন্তাহরণ ও রাজীবও তাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত করিবে। রাজীব উদগ্রীব হইয়া কথাটা শোনে, কিন্তু চিন্তাহরণ যেন তাহাতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করে না। ধর্ম প্রচারের কাজেই সে আত্মনিয়োগ করিতে চায়, তাহাই তাহাদের আদর্শ। গিরীশ ক্ষুণ্ণ হয়—সেই উচ্চ আদর্শ পালন করিতে হইলে নিশ্চয়ই উচ্চ শিক্ষাও আয়ত্ত করিতে হইবে, নিজের শক্তির ও প্রতিভার সার্থকতা সাধন করা চাই।

রাজীব বলিল, বউঠানকে ধরো—তিনি চিন্তদাদাকে বুঝিয়ে বলুন।

'বউঠান?'—গিরীশ চমকিত হয়। চিন্তাহরণকে বুঝাইবার জন্য গিরীশকে লইতে হইবে বউঠানের শরণ; রাজীবই অবশ্য মনোরমাকে ধরিল: দাদাকে একটু বোঝান, বউঠান।

স্বল্প অবগুণ্ঠনঅন্তরাল হইতে মনোরমা সহাস্যে বলিল, বোঝাবে কে? আমি?—কথাটা যেন একেবারেই অবিশ্বাস্য। গিরীশ রাজীবের নিকটে ছিল, এই দ্বিধায় একটু প্রসন্নই হইল। কিন্তু রাজীব বলিল, আপনিই বুঝিয়ে বলবেন তাঁকে।

মনোরমা বলিল, কবে থেকে আপনারা আবার এই প্রতিজ্ঞা করলেন—স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করবেন।

গিরীশ ব্যঙ্গটা বুঝিল। বলিল; স্ত্রী যখন সত্যই স্ত্রী হবেন তখন জিজ্ঞাসা করতে হবে বৈকি।

গিরীশকে মনোরমা ভয় করে। তাই তাহার হাসি মিলাইয়া গেল। নতমুখে বলিল, আপনার দাদাই তাহলে জিজ্ঞাসা করবেন, আমিও তাঁকে বলব তখন।

রাজীব হাসিয়া ব্যাপারটাকে লঘু করিতে চাহিল, সেই দরবারই ত করছি আমরা।—কিন্তু গিরীশ হাসিতে পারিল না।

শেষ পর্যন্ত সেই মিলনান্ত গৃহ-দৃশ্যের মধ্যখানে বসিয়া রাজীব যতটা উৎফুল্ল হউক, গিরীশ বেশ অনুভব করিতে পারে—তাহাদের মাঝখানে চিরদিনের মতই একটা ভেদ-রেখা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে।

৩

"ফলতঃ বিদ্যাবান উদার-স্বভাব মহাশয় পুরুষের সহিত কোন বিদ্যা-হীনা কলহপ্রিয়া ক্ষুদ্রাশয়া রমণীর পাণিগ্রহণ হওয়া অশেষ ক্লেশের বিষয়। উহার উদাহরণ সংগ্রহার্থে আর অধিক দর্শনের প্রয়োজন নাই। এ দেশের অনেক বিদ্যার্থী ব্যক্তিই এ বিষয়ের বিশিষ্ট রূপ দৃষ্টান্তস্থল। বিদ্যাবান পাত মানব জন্মের সার্থক্যসাধক জ্ঞান-রসের রসিক হইয়া তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। ইহাতে মূর্খ স্ত্রীর সহবাসে কোনক্রমেই তাহার মনস্তুষ্টি জন্মে না এবং স্ত্রীও পতির ভিন্নমতি দেখিয়া কখনই সন্তোষ প্রকাশ করেন না। স্বামী যে সকল বিষয় অলীক ও অপকারী বলিয়া জানেন, তাঁহার কুসংস্কারাবিষ্টা পত্নী তাহাই অবশ্য কর্তব্যরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ধর্মবিষয়ে উভয়ের অতিশয় অনৈক্য-বশতঃ একের অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় পদার্থও অন্যের অপেক্ষা অনা-দরের আস্পদ হইয়া উঠে। এক্ষণে এতদ্দেশীয় বিদ্যাবান যুবক মণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ শত শত ঘটনা ঘটিতেছে এবং তাহা অনেকেরই মনস্তাপ ও দুষ্প্রবৃত্তিরও কারণ হইয়াছে।..."

মনোরমার বুক কাঁপিতে থাকে। তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই কি এই সব কথা লেখা হইয়াছে? অন্তত কি বুঝিয়া এই গ্রন্থ তাহাকে পড়িতে দিয়াছে ইহারা? সে মূর্খ তাহাতে ভুল নাই, চিন্তাহরণও বিদ্যাবান্—জ্ঞান-রসের রসিক; কিন্তু মনোরমা ত কখনো স্বামীর অনভিপ্রেত কাজ করে না, বরং স্বামীর ধর্মকে সে বরং নিজের ধর্ম বলিয়াই গ্রহণ করিতে চায়। তাহার স্বর্গগতা শাশুড়ী বলিয়াছিলেন—'স্ত্রীলোকের ধর্ম সংসার, যেখানে স্বামী সেখানেই সংসার।' গাঙ্গুলী বাড়ির বৃহৎ সংসার ছাড়িয়া মনোরমা তাই অনায়াসে আসিয়া চিন্তাহরণের নিকট উপস্থিত হইয়াছে।

যতদিন গিরীশ এই বাড়ীতে আসে নাই ততদিন মনোরমা বুঝিতে পারে নাই—ইহাতে কোনো আয়াস আয়োজনের প্রয়োজন আছে। অবশ্য সে লেখাপড়া বিশেষ জানে না, আর চিন্তাহরণ বিদ্বান পুরুষ। কিন্তু তাহাতে কি?—স্ত্রী আবার কাহার কবে মহামহোপাধ্যায় হয়? মনোরমা একেবারে নিরক্ষরাও নয়। এক সময়ে তাহার শ্বশুর পীতাম্বর গাঙুলী ছিলেন শহরের 'উন্নতিশীল দলে'র মানুষ। তিনি চাহিয়াছিলেন পুত্রবধূও তাঁহার গৃহে কিছু পড়াশুনা করুক। কিন্তু পীড়িতা শাশুড়ী পুত্রবধূকে আগলাইয়া রাখিলেন। পীতাম্বর গাঙুলীকে তিনি কথাটা পাড়িতেই প্রায় দিলেন না—'যাও, যাও, বউএর আর তোমাদের মত উন্নতিশীল হতে হবে না।'

স্ত্রীর সম্মুখে পীতাম্বর গাঙুলীর মুখে আর কথা ফুটিল না। মনোরমা সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে, লেখাপড়া তাহারা সকলেই কিছু কিছু শিখে। কিন্তু শাশুড়ীর ইচ্ছা—মনোরমাকে সংসারের কর্ত্রী করিয়া তুলিবেন। মনোরমাও তাই গৃহকর্মে অভিজ্ঞা হইয়া উঠিয়াছে—নন্দীগ্রামের গাঙুলীদের সংসার-ব্যবস্থা করিতে গিয়া পড়াশুনা করিবার বিশেষ অবসর পায় নাই। প্রয়োজনও তেমন করিয়া বোধ করে নাই।

প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিতে হইত শ্যামার মা, সদি দাসী 'বাসি কাজে' হাত দিয়াছে কিনা, খোঁজ করিত হরকুমার দাদা ও কানাই খুড়া বাহিরের ঘর দুয়ার পরিষ্কার করিতেছে কিনা। গোয়ালের গরু বাহির করিয়া দুধ দুহিবে—দেখা দরকার। বাড়ির চারিদিক ঝাড়ু দেওয়া হইলে, স্বহস্তে ধুইতে লেপিতে নিজেও সে লাগিয়া যায়। চতুর্দিকে গোবর-জল ছিটাইয়া বাড়ির প্রাঙ্গণ পথ-ঘাট সে নিজে পবিত্র করে। শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া ঠাকুর ঘরে যায়, তখন দেবতা শয্যাত্যাগ করেন। তারপর পীড়িতা শাশুড়ীর গৃহে গিয়া মনোরমা তাঁহার খোঁজ লয়, তিনি শয্যাত্যাগ করিলে তাঁহার হাতমুখ ধোয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দেয়। ঠাকুরের প্রভাতীর

ব্যবস্থা করিয়া আসে। ফিরিয়া আসিয়া দেখে শ্বশুর উঠিয়াছেন কিনা। দাসী চাকরেরা অবশ্য তাঁহার পরিচর্য্যায় অবজ্ঞা করিবে না; তবু মনোরমা পুত্রবধূ, শাশুড়ীও প্রায়ই ব্যাধিতে অচল। মনোরমারই কাজ শ্বশুরের সেবা-পরিচর্যা। রূপার হুঁকা মাজা হইয়াছে, হাত-মুখ ধুইবার ঘটি, চৌকি, জল, সব যথারীতি সাজাইয়া রাখা আছে; দেখিয়া মনোরমা ভাঁড়ারে যায়—ভাঁড়ার বাহির করিয়া দিবে। বাড়ির দাসদাসীরা পান্তা ও বাসি খাদ্য খাইয়া লইতেছে। বাহিরের বেহারা-পাটনী ও মুনিস-কামলা দাসী-চাকরের মধ্যে চিঁড়া-গুড়-দই দিয়া মনোরমা প্রাতরাশের ব্যবস্থা করিবে। বহির্বাটিতে তেমন অতিথি কেহ থাকিলে তাহার জন্যও বিশিষ্ট বন্দোবস্ত করিয়া রাখে—ভাণ্ডার হইতে নাড়ু, সন্দেশ, মোয়া বাহির করিয়া আনে; ক্ষীর দুধের ব্যবস্থা করে। শ্বশুর মহাশয় নিজেই হয়ত অতিথির ফলারের সময় উপস্থিত থাকিবেন। আত্মীয়-কুটুম্ব হইলে অন্দরের দালানে তিনি নিজেই অতিথিকে লইয়া ফলারে বসেন, গৃহ-মধ্যে অন্তরাল হইতে মনোরমা তাঁহাদের আহারের তদারক করে। তৎপূর্বেই অবশ্য সে স্নান সারিয়া আসে, ধৌত ক্ষৌম বস্ত্র পরিয়া শ্বশুর ও শাশুড়ীর পূজা-আহ্নিকের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। স্নাত বিশুদ্ধ বেশে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করে—পূজায় আয়োজন করিয়া রাখে, পুরোহিত ঠাকুর পরে আসিয়া দৈনন্দিন পূজা সারিবেন। মনোরমা ফুল-পাতা বাছিয়া ধুইয়া গুছাইয়া রাখে; চন্দন ঘষিয়া বাটিতে সাজাইয়া রাখে। কোশাকুশি মাজিয়া পূর্বেই পরিষ্কার করিয়াছে—এখন গঙ্গাজল ছিটাইয়া সমস্ত কিছুকে পবিত্র করে।—ততক্ষণে রন্ধনগৃহের বারান্দায় বাটনা বাটা, কোটনা কোটা চলিয়াছে। উনুন হইতে প্রথম দফায় ছেলেদের ভাত নামিবে; ঘি-ভাত, ভাজা মাছ লইয়া ছেলেরা সোরগোল করিয়া খাইতে বসিবে। নিত্যকারের রন্ধন আরম্ভ হইবে তাহার পরে, —ওদিকে নিরামিষ উনুনে মনোরমা নিজে ভোগ রাঁধিবে, এ কাজ

আর কেহ করিতে পারিবে না। শ্বশুরের জন্যও স্বতন্ত্র রাঁধিতে হইবে; শাশুড়ীর জন্য পথ্য হউক, খাদ্য হউক সে-ই তৈরী করিবে,—এই দুইটিও তাহারই কাজ, অন্যের নয়। ইহা ছাড়া, দশ জনের মধ্যাহ্ন রন্ধন—ভাত, ডাল, মাছ-তরকারী। এই রন্ধনে নিত্য পিসী আছেন, তিনি গাঙুলীদের প্রতিপাল্য ব্রাহ্মণবংশীয়া আশ্রিতা, মনোরমা তাঁহাকে সাহায্য করে। পুরোহিত ঠাকুর আসিবেন, নিত্যকারের মত পূজায় বসিবেন, মনোরমা দীপ জ্বালিয়া দিবে, ধূপ জ্বালাইবে, ভোগ নিবেদন চালতে থাকিবে।

পরিবারের পুরুষদের সকলের আহার চুকিলে মেয়েদের পালা, মনোরমার নিজের আহার। মধ্যাহ্ন তখন অতিক্রান্ত হইয়া যায়। তাহার পরে ইদানীং শ্বশুরকে শুনাইতে হইত মহাভারত। কালী-সিংহের মহাভারতের প্রথম কয় খণ্ড তিনি প্রথম দিকেই ক্রয় করিয়াছিলেন, পণ্ডিতদের সঙ্গে বসিয়া তাহা আলোচনাও করিতেন —তিনি পীতাম্বর গাঙুলী, একটা শিক্ষিত মানুষ। কিন্তু সে দর্প চূর্ণ হইয়াছে—ছেলেরা ধর্মত্যাগ করিল। এখন আর তাই অত গুরুতর শাস্ত্রে পীতাম্বর গাঙুলীর রুচি নাই। পণ্ডিতেরা বলেন তন্ত্রসার। কাশীদাসী মহাভারতই এখন মনোরমা তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইবে— কঠিন শব্দবহুল মহাভারত বউমা পড়িতে পারিবে না।

অপরাহ্ন শেষ না হইতেই মনোরমার শেষ করিয়া রাখিতে হয় নানা কাজ—দেখিয়া আসে চিঁড়া কুটিতেছে কিনা দাসীরা। প্রতিবেশিনীরা সেখানে আসে, নিজেদের ধান কুটিয়া লয়। গুজব, গল্প, খবর কিছুই তাহারা আলোচনায় বাদ দেয় না। নিম্নকণ্ঠে কেহ হয়ত বলিতেছে— 'কালাপাহাড়! বাপের সঙ্গে বিধবা মাসীর বিয়ে! কেন, মাসী যা ছিল তা ছিল, তোরা চুপ করে থাকতে পারিস না।' মনোরমা দূরে সরিয়া যায়,—এই গুজনিন্দা সে শুনিতে চায় না। সন্ধ্যার রন্ধনের নির্দেশ এখুনি দিতে হইবে।—সাঁঝ দেখানো ও গৃহদেবতার আরতি হইয়া

গেলেই আহারের পালা। গ্রামে রাত্রিতে দীপ জ্বালিয়া কেহ আর কিছু করে না। অবশ্য বাবুদের বহির্বাটিতে কথকতা, কবিগান, কীর্তন থাকিলে স্বতন্ত্র কথা। না হইলে সন্ধ্যার পরেই সমস্ত গ্রাম ঘুমাইয়া পড়ে। সারাদিনের কর্তব্য উর্ধ্বশ্বাসে উদ্‌যাপন করিয়া মনোরমাও তখন আসিয়া শাশুড়ীর গৃহের পার্শ্বে আপন শয্যায় শুইয়া পড়ে। চোখ জুড়িয়া আসে ঘুমে, কিন্তু কেমন একটা শূন্যতা আসিয়া চোখের ঘুম কাড়িয়া লয়। শ্রান্ত শয্যায় মনোরমার মনে হয়—এই গৃহ, এই সংসার, এই কর্ত্রীত্ব—যাহার পরিচয়ে সে এই সব লাভ করিয়াছে—কোথায় সে? কোথায়? কোথায়? গৃহকর্মে মনোরমার আলস্য নাই, কাজেকর্মে সে আনন্দই পায়। কিন্তু এই রাত্রিতে মনে হয়—যাহাকে লইয়া তাহার গৃহ, তাহার সংসার, তাহার এই আত্মপ্রকাশের সার্থকতা,—সে-ই ত ইহার মধ্যে নাই। আর সেই স্বামী না থাকিলে, কিই বা স্বামীগৃহ, কিই বা শ্বশুর? 'স্বামীই সংসার'—সব না হইলে শূন্য,—গৃহ শূন্য, সংসার শূন্য, হৃদয় শূন্য…

'স্বামীই সংসার'—মনোরমা তাই স্বচ্ছন্দমনে দৃঢ়পদে আসিয়া চিন্তাহরণের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। চিন্তাহরণ তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্যই যেন অপেক্ষা করিতেছিল, মনোরমাও স্বামীর সংসারের ভার গ্রহণের জন্যই যেন এতদিন প্রস্তুত হইতেছিল।—সহজ, স্বাভাবিক সবটাই। চিন্তাহরণের গৃহ, রাজীবের উৎসাহ, তাহাদের ব্রহ্মোপাসনা, তাহার ব্রাহ্মবন্ধু ও সহযোগীদের মনোরমার আগমনে উৎসব—সবই মনোরমার নিকট নূতন; জনশ্রুতি শুনিলেও ব্রাহ্মদের সে দেখিল প্রথম। যাহা দেখে তাহাতে মনোরমা পুলকিত হয়, বিস্মিত হয়; মাঝে মাঝে কৌতুকও বোধ করে—ইহারা সবাই ক্ষ্যাপা নাকি! মনোরমা এক একবার বিভ্রান্তও বোধ করে। কিন্তু সবশুদ্ধ ঘরবাড়ি ঝাড়িয়া পুছিয়া, রাঁধিয়া বাড়িয়া—জল তুলিয়া, বাটনা বাঁটিয়া, কুটনা কুটিয়া—এই দুইটি প্রায়-উন্মাদ যুবকের

সংসারকে সে সহজে আপনার হাতে লইয়াছে, আপনার করিয়া ফেলিতে কোথাও বেগ পায় নাই। বরং পাশের বাড়ির মেয়েটির সহিত পরিচয় করিতেই তাহার অপেক্ষা ধাক্কা খাইতে হইয়াছে বেশি।

গিরীশ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মনোরমার এই ভুল ভাঙিয়া গিয়াছে। স্বামীকে বিনা আয়াসে পাইলেও স্বামীর সংসারকে সেরূপ বিনা আয়াসে সে পাইতে পারে না। প্রথম দর্শনেই গিরীশ যেন একটা অনমনীয় প্রতিবাদের মত আপনাকে তাহার সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিল—অমন করিয়া প্রণাম করে নাকি গুরুজনকে! কপালে হাত ঠেকাইয়া নমস্কার করা আবার একটা নমস্কার! তাহার পরে ত সেই ঝড় মাথায় ভাঙিয়া পড়িল। ভাগ্যক্রমে তাহা কাটিয়াও গেল, না হইলে মনোরমার লজ্জা ও কলঙ্কের সীমা থাকিত না। দশজনকে লইয়া নন্দী-গ্রামে সে সংসার করিয়াছে, আর এখানে সে এই তিনটি মানুষের সংসারেও বিবাদ বাধাইয়া দিল? স্বামীকে সে চায়, স্বামীর সংসারে আপনার স্থান সে কামনা করে—ইহাকে রাজীব 'অধিকার' বলিতে চায়, বলুক; মনোরমা কিন্তু চিন্তাহরণের মত বলিবে ইহাই তাহার 'ধর্ম'। কি 'ধর্ম', আর কি 'অধিকার'—মনোরমা তাহা বুঝিতে পারে না; সেই তর্ক গিরীশ ও রাজীব করুক। কিন্তু স্বামী যখন তাহার ধর্ম, তখন স্বামীর আত্মীয় বন্ধুদের বাদ দিলে মনোরমার চলিবে কেন? ইহাদের লইয়াই ত তাহার স্বামীর ঘর—সংসার, গিরীশ সে গৃহ ত্যাগ করিলে মনোরমার কলঙ্ক, অপমান, অধর্ম সবই হইত।

সেদিনের ঝড় কাটিয়া গেলেও আকাশটা একেবারে পরিষ্কার হইয়া যায় নাই। গিরীশ দুই সপ্তাহকাল এই গৃহের ও সমাজের নানা সংস্কার মূলক কার্যক্রমে শহরের যুবকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছে শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা অঞ্চলে প্রচারে। সঙ্গে সে এইবার রাজীবকেও লইয়াছে—গিরীশ বক্তৃতা করিবে, রাজীব সংগঠনে সাহায্য করিবে।

মনোরমা গিরীশের সহিত আচরণে এই কয়দিনেও কিছুতেই স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিতে পারে নাই,—গিরীশ যেন কি একটা উগ্র বাধা, যেন সে তাহাকে দূরেই সরাইয়া দেয়। না হইলে রাজীব তো তাহাদের তেমন আত্মীয় নয়,—মনোরমা রাজীবের উপরও পূর্বে বিরূপ ছিল,—কিন্তু রাজীবের সরল নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের জন্য মনোরমা এখন বরং তাহার বিষয়ে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে। গিরীশ সম্ভবত মনোরমাকে অশিক্ষিতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতে পারে না।

লেখাপড়ায় মনোরমার যেরূপ ভক্তি, তেমনি ভয়। অথচ ইহারা সকলেই একমত, মনোরমাকে শিক্ষালাভ করিতেই হইবে। মনোরমারও বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু বিদ্যাভ্যাস সে সত্যই পূর্বে করিতে পারে নাই। এখন ইহাদের পীড়াপীড়িতে সে বিষয়ে তাহার ভয়ই জন্মিতেছে। সেই খৃষ্টান মেম সাহেব আসিতেছেন পড়াইবার জন্য। অন্তরাল হইতে প্রথম যখন মনোরমা তাঁহাকে দেখে মেমসাহেব তখন গিরীশদের সঙ্গে বাহিরের ঘরে কথা বলিতেছেন। মনোরমা প্রথম দর্শনেই কেমন ভীত হইয়া পড়িল। মিস্ ষ্টর্ক বর্ষীয়সী, একহারা, লম্বা চেহারা, চোখে সোনার চশমা, লম্বা মুখখানায় বয়সের ও পরিশ্রমের ছায়া ও রেখা দুইই পড়িয়াছে। কপালের উপরে থাকে থাকে তিনটি ভ্রূকুটি রেখা— এখনো দৃঢ় গতি, অক্লান্ত চলাফেরা— মনোরমার কি যেন কেন দেখিয়াই মনে হইল 'তুরুক সওয়ার'। স্পষ্ট, তীক্ষ্ণভাষিণী মিস্ ষ্টর্ক; গিরীশের কথায় তিনি হাসিতেছিলেন,—হাসিলেও মনে হয় যেন প্রসন্ন হন নাই, কৃপা করিতেছেন। এদিকে চিন্তাহরণ সংযত কথায় কি তাহাকে বুঝাইতে চাহিতেছেন, রাজীব অসন্তুষ্ট বোধ করিতেছে। একবার সে বলিয়াই ফেলিল বাঙলায়, 'এ দেশের সবই দোষ, এমন কথা বলাও কম দোষের নয়।' মিস ষ্টর্কের মুখ অমনি গম্ভীরতর হইল, তাহাদের ইংরেজি কথাবার্তা মনোরমা কিছুই বুঝিল না, কিন্তু বুঝিল ইনিই

গিরীশের মনোনীতা শিক্ষয়িত্রী; মানুষ নয়, একখানা কঠিন যষ্টি মাত্র।

মিস্ ষ্টর্ক চিন্তাহরণের সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পরিচয় শেষ হইতেই মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মনোরমা, তোমাকে আমার শিক্ষা দিতে হবে। তোমার বয়স কত?

মনোরমা সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে বলিল, এখনো কুড়ি হয় নি।

মিস্ ষ্টর্ক বলিল, কুড়ি! যাক্, তবু যে তোমাদের দেশের মেয়েদের মত গুটি পাঁচ সাত ছেলেমেয়ে প্রসব করে বসো নি।

মনোরমা কুণ্ঠিত আরক্তিম হইয়া উঠিতেছিল। চিন্তাহরণও লজ্জায় মুখ নত করিল। কিন্তু মিস্ ষ্টর্ক বলিলেন, না, মিষ্টার গাঙ্গুলী, আমি বলি ড্রেডফুল, তোমাদের বাল্যবিবাহ একটা 'ক্রাইম'। তোমাদের আণ্ডা-গণ্ডা মনে হয় ভগবানের দান নয়; তাঁর প্রদত্ত শাস্তি। কি শিক্ষা পাবে সেই স্ত্রী যে পাঁচ-সাতটা ছেলের মা?—তুমি বেঁচেছ যে তোমার এখনো সে শাস্তি পেতে হয় নি; আমিও বেঁচেছি—না হলে কি শিক্ষা দিতাম? 'সন্তান-পালন'? —শেষের কথাগুলি তিনি মনোরমার উদ্দেশে তিনি ছুঁড়িয়া দেন।

'তুমি বেঁচেছ যে তোমাকে এখনো সে শাস্তি পেতে হয় নি'—মনোরমার মন কথাটা শুনিয়াই বাঁকিয়া দাঁড়াইতেছিল। মিস ষ্টর্ক কিন্তু এবার হাসিলেন বক্র তির্যক হাসি। তারপর তিনি মনোরমাকে বলিলেন: তুমি কি পড়েছ? হাঁ, হাঁ, রামায়ণ, মহাভারত, সে জানি!—তোমার স্বামী মানবেন না, কিন্তু তোমার দেওর মানেন,—ওসব যত শীঘ্র ভুলে যাও ততই মঙ্গল—সেই তোমাদের দেব-দেবীদের অশ্লীল গল্প,—গাঁজা-খুরী মিথ্যা কথা।

মনোরমা চোখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল। চিন্তাহরণ বুঝিয়াই হয়ত মিস্ ষ্টর্ককে ইংরেজিতে বলিল, মহাশয়া, তা বল্‌লেই কি রামায়ণ-মহা-

ভারত কেউ পড়বে না? আপনাদের শিক্ষিতেরাও ইলিয়াড পড়ে, অডিসি পড়ে। বাইবেলেরও ত কত গল্প মনে হয় অলৌকিক।

মিস্ ষ্টর্ক গম্ভীরভাবে বলিলেন: নিশ্চয়ই।—ভগবানের পুত্র যীশুর সুসমাচার—আমাদের খৃষ্টানদের নিকট বাইবেলই সত্য গ্রন্থ। নিশ্চয়ই ভগবানের পুত্র অলৌকিকমূর্ত্তি সত্য। ভগবানের পুত্র তোমার আমার মত লোক নন। আমি বাইবেল বর্ণে বর্ণে মানি, এ কথা জেনেই কিন্তু আপনার স্ত্রীকে আমার নিকট শিক্ষালাভ করতে হবে।

চিন্তাহরণ কেমন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়িল: সে ত গিরীশ আপনাকে বলেছেন—আপনার ধর্মকে আমরাও শ্রদ্ধা করি। ইনিও নিশ্চয়ই শিক্ষালাভ করলে সেরূপ শ্রদ্ধা করবেন। এখন কাজেই প্রথম প্রয়োজন শিক্ষা—সে আপনার হাতে।

মিস্ ষ্টর্ক নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, সে ভার আমি গ্রহণ করছি—আমার সব কথা কিন্তু ওঁকে শুনতে হবে।

পৃথিবীতে শাসন করিতে যাহারা জন্মিয়াছে, ইহা তাহাদেরই কণ্ঠস্বর—সগর্ব, নিঃসংশয় উক্তি। মনোরমাও তাহা অনুভব করিতে পারিল। সেও গাঙুলী বাড়ির কর্ত্রী, কর্ত্রীপনার সুর তাহার পরিচিত। কিন্তু কি হিসাবে ইনি এই কর্ত্রীত্ব লাভ করিয়াছেন—মেম সাহেব বলিয়া? সভয়-বিস্ময়ে সেই যষ্টিদেহীর কঠিন মূর্তির দিকে মনোরমা তাকাইয়া রহিল।

কেমন শুনবে ত?—মিস্ ষ্টর্ক প্রশ্ন করিলেন।

মনোরমা চমকিত হইল, বলিল: আপনি শিক্ষয়িত্রী. গুরুমা।

মিস্ ষ্টর্ক কৃপাভরে হাসিলেন, আশা করি, তুমি সত্য আলোক প্রাপ্ত হবে—আমাদের পরিশ্রম ভগবানের কৃপায় সার্থক হবে।

সেইদিন হইতেই মিস্ ষ্টর্কের কথাবার্তা, বই-পত্র, ছবি,—যীশুর জন্ম, যীশু ও তাঁহার মেষপাল ইত্যাদি,—কোনো জিনিসই মনোরমাকে আর আকর্ষণ করিতে পারিল না। মনোরমা তাঁহার কথা শোনে—প্রতিবাদ করে না,

করিতে সাহস করে না; চিন্তাহরণও বলে, মেম সাহেবের কাছ থেকে কিছু কিছু ইংরেজি বাঙলা, সভ্যদেশের রীতিনীতি, সূচীকর্ম—এসব শিক্ষা করো।

রাজীব কিন্তু গোঁড়া: সে বলে: ইংরেজি পড়ায়, ইতিহাস পড়ায়, ভূগোল পড়ায়—তা একশ' বার পড়াক, শুনবও। তবে ওদের ধর্মের কথা তুললেই বলব, 'ধর্মের কথা আমাদের শোনাতে এসো না। নিজেরাই তা পালন করোগে, যাও'।

রাজীব ও চিন্তাহরণের নিকট হইতে মনোরমার আর এক প্রস্থ বই লাভ হইল—ইহাও তাহার পড়িতে হইবে। চিন্তাহরণের নিকট হইতেই মনোরমা পডিবার মত গ্রন্থ পাইল বেশি—তাহা পড়িতে সে আগ্রহও বোধ করে। 'রত্নাবলী' নাটক, 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'শর্মিষ্ঠা', বীরাঙ্গনাও ব্রজাঙ্গনাকাব্য, 'কৃষ্ণকুমারী', 'নীলদর্পণ', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা'—সে বুঝিয়া না বুঝিয়া পড়ে, আনন্দলাভ করে। 'বিষবৃক্ষের' নাম শোনে, উহারবিরুদ্ধে নানা আলোচনা শোনে। চিন্তাহরণকে গিরীশ ও রাজীব আঘাত দিয়াই বলে-'লোকটা ব্রাহ্মদের ত নিশ্চয়ই শত্রু, আসলে সুশিক্ষা, সুনীতিরও বিরোধী।' মনোরমা সেই তর্ক বোঝে না, বুঝিতে উদ্‌গ্রীবও নয়। কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা' পড়িতে পড়িতে সে ভাবিত হইয়া পড়ে—কেমন মেয়ে কপালকুণ্ডলা—নবকুমারকে লাভ করিয়াও চিনিল না? মতিবিবির দুর্ভাগ্য সে বোঝে—এমন মন্দভাগ্য কোনো মেয়ের যেন না হয়। কিন্তু তারপর? কি চাহে পদ্মাবতী? স্বামীকে পাইবার কি সহজ পথ তাহার ছিল না? ছিল না বলিয়া কি অমন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ঘুরিয়া মরিতে হইবে? আর, সত্যই, কেমনই বা নবকুমার? কেমনতরই বা নবকুমারের সমাজ-সংসার?—পদ্মাবতীকে তাহারা বিনাদোষে কেন বর্জন করিয়াছিল? পদ্মাবতীরও তাই বলিয়া কি মতিবিবিই হইতে হইবে? মনোরমার কি হইত স্বামীকে না পাইলে?—না, না, মনোরমা তাহা ভাবিতে চাহে না। স্বামীকে তাহার পাইতেই হইত—সে পাইয়াছে, পাইবে।

৪

গিরীশের সঙ্গে রাজীব উৎসাহ-ভরে ধর্মপ্রচারে নামিয়াছিল। দুই-চারিটি শহর-মহকুমায় তাহারা বক্তৃতা দিয়া ঘুরিবে। কোথাও ইংরেজি শিক্ষিত স্থানীয় নূতন হাকিম সাহেব তাহাদের আশ্রয়, কোথাও বা কোনো জমিদার বর্গের নবশিক্ষিত পদস্থ মানুষ তাহাদের পরিপোষক। দুই একজন প্রধান শিক্ষক বা উকিল, ডাক্তারও তাহাদের দলভুক্ত বা দলের সহায়ক কর্মী। স্কুলঘরে সভা বসে, কখনো হাকিম বা জমিদারের বৈঠকখানায়ও উহার আয়োজন হয়। গিরীশ বক্তৃতা করিতে দাঁড়ায়—ইংরেজি বক্তৃতা শুনিবার জন্য স্থানীয় শিক্ষিত মানুষেরা ভিড় করিয়া আসে, ছাত্ররা খাতা খুলিয়া নূতন ইংরেজি ও চমকপ্রদ 'ফ্রেজ' টুকিয়া লয়, মাষ্টাররা পরদিন স্কুলে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করেন, না বলিতে পারিলে ছাত্ররা লজ্জিত হয়। পরস্পরের মধ্যে তাহারা বক্তৃতা লইয়াও আলোচনা করে—সত্যই, কাহাকে তাহারা অবতার বলে? ঈশ্বরের পুত্র যীশু ও অবতার নহেন; তিনি আদর্শ পুরুষ, মানুষ রূপে মানুষ হইয়াই তিনি মানুষের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—তিনি 'মনুষ্যপুত্র', পূর্ণ স্বাধীনতার, পূর্ণ চরিতার্থতার আদর্শ। —কিন্তু বক্তৃতার বিষয় লইয়া নয়, ইংরেজি শব্দ ও বাক্যাংশ লইয়াই ছাত্রমহলে উৎসাহ অধিক। ইংরেজি বক্তৃতা যিনি অনর্গল করিতে পারেন সে মানুষের ভদ্রসমাজে অপরিসীম সম্মান, ছাত্রদেরও তাঁহার প্রতি অগাধ ভক্তি।

রাজীব হিসাব করিয়া দেখিয়াছিল—ত্রিপুরার এই সভায় প্রায় চল্লিশটি ছাত্র আসিয়াছিল, সাগ্রহে তাহারা গিরীশের বক্তৃতা শুনিয়াছে, মুগ্ধ হইয়া তাকাইয়া রহিয়াছে। বক্তৃতার পরে ভদ্রলোকেরা কেহ কেহ তাহাদের ঘিরিয়া ধরিল, তাহারা ব্রাহ্মধর্মের কথা আরও জানিতে চায়।

আরও দুই চারিদিন কি গিরীশবাবু এই শহরে বক্তৃতা করিবেন ? বরাবর-কার মত কোনো ব্রাহ্মপ্রচারক এখানে থাকিতেও পারেন—ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত করা যায়, শিক্ষক বা উকিল ডাক্তাররূপে তাঁহার জীবিকার্জনও সম্ভব।

তখন অনেকেই চলিয়া গিয়াছিল। একটি ছেলে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল : দাদা ভাই।

রাজীব চমকিয়া উঠিল। এই নামে তাহাকে চিত্রিসারের বাড়িতে ছাড়া আর কেহ ডাকে না। এখানে কে ডাকিল? বৎসর তেরো চৌদ্দর একটি বালক, রাজীব ইহাকে পূর্বে কোথাও দেখিয়াছে কি ?

বিভূতি!—রাজীবের মনে পড়িল,—ওঃ, হাঁ, তুমি ত এখানেই পড়ো! —তাহার পিতৃব্য স্বর্গগত দেবপ্রসাদ চৌধুরীর পুত্র, এই কয় মাসেই সে কত বড় হইয়াছে! আশ্চর্য! বেশ স্বাস্থ্যবানও;—দেবপ্রসাদ চৌধুরী কিন্তু ছিলেন একটু দুর্বলদেহ মানুষ। বিভূতি প্রণাম করিতেছিল, রাজীব আপন স্বভাবমত বালককে বুকে জড়াইয়া ধরিল। তাহাদের তিন বন্ধুর মন ছোটখুড়াই লেখাপড়ায় প্রথম আকর্ষণ করেন, তাহাদের সামনে সুশিক্ষার দুয়ার খুলিয়া দেন। তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র বিভূতি। রাজীব তাহাকে নিজের কাছে রাখিয়া স্কুলে পড়াইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু মহেশ্বরী রাজী হন নাই। কারণ, রাজীবেরা ব্রাহ্ম।

রাজীব বলিল, কোথায় থাক তুমি এখানে ? মধুসূদন সেনের বাড়ী ? হাঁ, মধু সেন এখানকার বড় মোক্তার, মনে আছে। —বলিয়া রাজীব বাড়ির খবর জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছেন ছোট খুড়ী মা ?—তোমার ছোট ভাই জানু ? আর—বলিয়াই রাজীব থামিল, পরে জিজ্ঞাসা করিল, আর শৈলী ? —শৈলী তাহাদের পিসতুত ভগিনীর কন্যা—চৌধুরীদের আশ্রিতা।

বিভূতি বলিল, ভালোই আছেন তাঁরা।

রাজীব সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। কিছুকাল পূর্বে গিরীশের পিতা পীতাম্বর গাঙুলীর সহিত শৈলীর বিবাহ স্থির হইতেছিল। রাজীবের ধমকেই ভয় পাইয়া পীতাম্বর গাঙুলী সেই বিবাহ ভাঙিয়া দেন এবং অন্যত্র বিবাহ করেন। সেই বুদ্ধিটা রাজীবকে অবশ্য শৈলীই দিয়াছিল '—গাঙুলী মহাশয়কে ধমক দিও।' কিন্তু রাজীব তাহাতে নিজের বুদ্ধি ও কৃতিত্বের প্রমাণ যোজনা করিয়া, মনে মনে বেশ খানিকটা উৎফুল্লও ছিল। রাঘবও এদিকে চৌধুরী বাড়িতে তুমুল কাণ্ড করিয়াছে। ইহার কারণ গাঙুলী মহাশয় চৌধুরী বাড়ির পুরাতন কুটুম্ব, রাঘব চৌধুরীকে পরে তিনি গোপনে সেই কথাটা জানাইতে ত্রুটি করেন নাই। রাজীবের পক্ষে তাই চৌধুরী বাড়ির পথ এখন প্রায় বন্ধ হইয়া আছে।

শৈলীর অপরাধ অবশ্য কেহ বুঝিতে পারে নাই। তাহারা বলে, বিভূতির মাতা মহেশ্বরীই রাজীবকে এই বিষয়ে সংবাদ দিয়া উত্তেজিত করিয়াছে। অন্ততঃ রাঘবের ইহাই অনুমান। তাহার ক্রোধটা তাই অনুপস্থিত রাজীবকে না পাইয়া উপস্থিত বিধবা মহেশ্বরীর উপর দ্বিগুণ রূপেই পড়িয়াছে। রাজীব এত খবর জানিতে পারে নাই, তাহার বিশেষ আশঙ্কা ছিল শৈলীর জন্য—সে-ই বুঝি মেজ দাদা রাঘব চৌধুরীর অত্যাচার সহিতেছে। বিভূতির মুখে এখন সে শুনিল শৈলীর মা আরও বিপন্ন হইয়াছেন। একে তিনি নিজে ভ্রাতাদের গলগ্রহ, তাহার উপর কুলীন-কন্যা শৈলীর বিবাহ হয় না। নন্দীগ্রামে সে পাত্রস্থা হইলে তাঁহারা মাতাপুত্রী বাঁচিতেন। সত্যই, বড়লোক জামাই হইতেন গাঙুলী মহাশয়। কিন্তু তাঁহাদের দুরদৃষ্টা! শত্রুরা বাদ সাধিল!

রাজীব হাসিতে লাগিল, বিভূতিকে বলিল, ওই গিরীশেরই বাপ পীতাম্বর গাঙুলী, আর শৈলী এই গিরীশেরও ছোট।

বিভূতি সলজ্জভাবে হাসিল,—তা আর বলতে। মা সে কথা বললেও পিসীমা শোনেন না। তিনি বলেন, 'একটা গতি হত, ছোট বউ,

আমাদের।' মাকে, মেজদাদা ও মেজ খুড়ামশায় তাই স্বতন্ত্র করে দিতে চাচ্ছেন, পারছেন না বড়দাদার জন্য।

রাজীব চমকিয়া উঠিল। প্রশ্ন করিল, কেন?

মহেশ্বরী তাহার প্রতি স্নেহশীলা। কিছু না বুঝিলেও দেবপ্রসাদের নিকট তিনি কতকটা উদার ধারণা লাভ করিয়াছিলেন—চৌধুরী গৃহে এখনো তিনিই রাজীবের কতকটা সান্ত্বনা, লেখাপড়ার পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া রাজীব তাই চমকিত হইল।

বিভূতি জানাইল, ওদের ধারণা মা-ই তোমাকে সেই সম্বন্ধের সংবাদ দিয়ে বাড়ি আনিয়েছিলেন।

মিথ্যা কথা! শৈলী সংবাদ দিয়াছিল —রাজীব ক্রোধভরে কথাটা বলিল। বলিয়াই সচেতন হইল,—বলে ফেললাম যে তার নাম তোমার সামনে! কিন্তু তুমি কাউকে বলবে না বলো,—তা হলে শৈলীর অত্যাচারের একশেষ হবে।

বিভূতি বলিল, আমি জানি।

কি করে?—রাজীব সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে। মহেশ্বরীর কথা অপেক্ষাও এই কথাটা জানিতে তাহার আগ্রহ অধিক।

বিভূতি জানায়, আপনি রাগ করে না খেয়ে নৌকায় উঠলেন দেখে মা আমাকে পাঠিয়েছিলেন নদীর ঘাটে আপনাকে ধরতে; নিজে আসছিলেন পিছনে, ধরে বাড়ী নিয়ে যাবেন। আমি দৌড়ে গিয়ে দেখলাম—সেখানে আপনার সঙ্গে শৈলীদির কথা কাটাকাটি হচ্ছে, শেষটায় আপনি চলে গেলেন। শৈলীদি তখন ফিরে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। তখন মাও এসে গেলেন। কাছে গেলে আমাদের শৈলীদি সব বলে ফেললেন,—'আমি ওঁর সঙ্গে গেলে বাঁচতাম। না গিয়ে এখন কি করব? জলে ডুবে মরা ছাড়া আমার পথ নেই।' মা তাকে বুঝিয়ে বাড়ি নিয়ে এলেন।

রাজীব বলিল, ওই ত্যাখো। তখন হাত ধরে অত বললাম, 'চল,

চল্,' এল না। তারপরে চৈতন্য হল। যাক্, ভাগ্য ভালো, ওর ফাঁড়া কেটে গেছে।

বিভূতি জানায়, এখনও বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। সবাই মস্ত পণ চায়।

রাজীব উন্মনা হইয়া দাঁড়াইল। নিজের মনেই বলিল, কে বলবে কি হবে তার? —তারপর বিভূতিকে বলিল, শৈলীকে বলো,—তোমাকেও এ কথাই বলি—সাহস চাই। তুমি সাহস করে পড়তে এলেনা আমার সঙ্গে। এই ত—বউঠান—চিন্তাহরণদা'র স্ত্রী, গিরীশের বউঠান, কেমন সাহস করে চলে এলেন আমাদের কাছে। শুনেছ ত? —মনোরমার কথা বলিতে গিয়া রাজীব এবার উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

বিভূতি জানাইল,—শুনিনি কেমন? এ নিয়ে বাড়িতে দেশেগাঁয়ে পর্যন্ত কত ঘোঁট। তার মাকে সকলে একঘরে করবে, মেয়েকে তিনিই খ্রীষ্টানের হাতে দিয়েছেন, খ্রীষ্টান জামাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেন কেন, প্রায়শ্চিত্ত করুন, ইত্যাদি।

রাজীব আবার হাসিয়া উঠিল।

গিরীশ এতক্ষণে অবসর পাইয়াছে। হাকিম, উকিল প্রভৃতির সঙ্গে তাহার ইংরেজিতে রিফর্ম ম্যুভমেণ্ট সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল। রাজীবের কাজ—একটা প্রতিশ্রুতিপত্রে তাহাদের সহি সংগ্রহ করা; কিন্তু রাজীব ওখানে একটা বালকের সঙ্গে কি কথায় মজিয়া গিয়াছে।

গিরীশ ডাকিল,—কি ব্যাপার, রাজীব, এদিকে আসবে না?

রাজীব লজ্জিত হইল। সত্যই, চিত্রিসার, চৌধুরীবাড়ি, প্রভৃতির কথা উঠিতে রাজীব সব ভুলিয়া গিয়াছিল! গিরীশকে বলিল' ছাখো গিরীশ, কে! ছোটখুড়া মহাশয়ের ছেলে বিভূতি।

গিরীশ সানন্দবিস্ময়ে বলিল: সত্যি!

বিভূতি প্রণাম করিতেছিল, তাহাকে সাদরে তুলিয়া করমর্দন করিয়া গিরীশ বলিল, তুমি বোধ হয় জানোও না—আমরা কে?

বিভূতি বলিতে চাহিল, জানি।

কিন্তু গিরীশ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বলিল,—আমরা যদি মানুষ হই সে তোমার বাবার গুণে, তাঁর শিক্ষায়। আজ যা বল্‌ছি তা-ও আসলে তাঁরই কথা। হাঁ, ইংরেজি তিনি ভালো করে শিক্ষার সুযোগ পাননি, অথচ ইংরেজি শিক্ষার মূল্য তিনিই আমাদের প্রথম থেকে বুঝিয়ে দেন। তাই ত আজ রিফর্ম ম্যুভমেণ্ট গ্রহণ করেছি। শুধু কি তাই? চৌধুরীকাকার কাছ থেকেই দাদা বাঙলা সাহিত্যের এমন নেশা পেলেন যে, এখনো তিনি মাইকেলের নামে পাগল—বাঙলা কবিতা লিখছেন! বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়কে দাদা এখনো মাথা থেকে নামাতে পারছেন না—সেও নাকি বাঙলায় অসাধারণ লেখক।—বলিয়া গিরীশ বক্রহাসি হাসিল। বলিল, রাজীবও বাঙলার দলের। কিন্তু তুমি কি বলো? শুনলে ত ইংরেজি বক্তৃতা? কেমন? এর সঙ্গে বাঙলার তুলনা হয়? কোনও মতেই না।

বিভূতি লজ্জিত ও সংকুচিত হইল—সে কি বলিবে? কিন্তু গিরীশও ছাড়িবার লোক নয়,—তুমিই ত বলবে। তোমরা ষ্টুডেণ্ট, ইংরেজি পড়ছ; তোমাদের কাছেই ত আমাদের বক্তৃতা।—তারপর ইংরেজিতে বলে, আমরা মশাল জ্বালছি, এ মশাল বহন করবে তোমরা। তোমরাই নবযুগের মশাল-বাহক।

বক্তৃতার মত উচ্চকণ্ঠ। তাহাদের চারদিকে অপরেরা আসিয়া জুটিতেছে। গিরীশ গাঙুলীর ইংরেজি শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছোটবড় সকলেই।

প্রায় ছোটখাটো আরেকটা সভা বসিয়া যায়। শহরের ছোট হাকিম বাবু আগাইয়া আসিলেন—গলাবন্ধ কোট, পাৎলুন পরা, মাথায়

পাগড়ীটুপী। গিরীশকে ইংরেজিতে বলিলেন, এ বালকদের জন্য কথা এখন জমা রাখুন, মিস্টার গাঙুলী। আপনার জন্য আমার গৃহে অপেক্ষা করছেন এখন রেভারেণ্ড কুমিং ; নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে দেরী করলে।

কখনো না !—গিরীশ থামিল। বলিল, সময়ানুবর্তিতা একটা ভার্চু। এদেশে আমাদেরই তা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। চলো, রাজীব।

কিন্তু রাজীব ইতিমধ্যে বিভূতির সঙ্গে তাহার বাসস্থলে যাইবে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। একা একা বিভূতি রাঁধিয়া বাড়িয়া খাইয়া ইস্কুল করে—তাহাকে দেখিয়া যাইবে না রাজীব ? গিরীশ বলিতে চাহিল, 'সে কি করে হয়। দেরী হবে, সাহেব কি ভাববেন আমাদের ?'—অবশ্য রাজীব ইংরেজি বাক্যালাপে দক্ষ নয়, তাই মিশনারীদের সঙ্গে সে তর্ক বাধাইয়া দেয়, সে না গেলেও চলে, এই যুক্তিও সত্য। কিন্তু গিরীশও নিজে বিভূতিকে এত শীঘ্র ছাড়িতে চাহে না—দেবপ্রসাদ চৌধুরীর পুত্র সে, সে কি তাহাদের পর ? তাহা হইলে বিভূতির বাস-ব্যবস্থাদি সব দেখা দরকার। না। অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ইজ অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট।

রাজীবকে লইয়া বিভূতি আপনার বাসস্থলে পৌছিতেই সেখানে একটা কোলাহল বাধিয়া গেল। মধু সেন সভায় যান নাই, ব্রাহ্মদের সভায় গিয়া কি করিবেন ? ওসবে যাইবে তাঁহার ছেলে যাদব, তাহার বন্ধু বিভূতি—উহারা ইংরেজি শুনিবে। তিনি বৈঠকখানায় ফরাস বিছাইয়া কাছারির পরে আসর জমাইয়া বসিয়াছিলেন—রাজীবকে পাইয়া আর কথা নাই, অন্তঃপুরে লইয়া চলিলেন। হাঁক-ডাক জুড়িয়া দিলেন—'যাদবের মা কোথায় ? এসো, দেখো কে এসেছে !'—আবার রাজীবকে বলেন, 'আরে বাপু, তুমি হলে শিবপ্রসাদ চৌধুরীর পুত্র। আমরাও মধ্যমগ্রামের গুপ্তদের ভাগিনেয়। আমাদের বাড়ি আসবে না তুমি ? গিয়ে উঠবে কিনা কোন্ সাতগেঁয়ে হাকিমবাবুর বাড়ি। ওঠো, তোমরা

নয় ব্রাহ্ম হয়েছ, জাতধর্মই মানবে না। না হয় ইংরেজিই শিখেছ, কিন্তু তাই বলে তুমি পর হবে কি করে আমাদের?

বলিয়া গল্প জমাইয়া তুলিলেন,—সেই তোমার বাবা, একবার এসেছিলেন আমার মেজ মামার বাড়ি—আমি তখন নূতন মোক্তার। বিশাল পুরুষ, আমাকে দেখছ কি? একটা পাঁঠাই খেয়ে বসলেন তিনি আর মেজমামা—নিজের চোখে দেখা আমার। আর দু'বোতল বিলিতী মদ। তা এসেছিল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের জন্য,—সাহেব সফরে বেরিয়েছিলেন। সে সব আর তোমাদের ব্রাহ্মদের শুনে কাজ নেই,—দু'জনে মিলে এক রাত্রিতেই দু'বোতল শেষ। রাত ভোর না হতে চৌধুরী মামা আবার শহরে ফিরে গেলেন ঘোড়া ছুটিয়ে, পঁয়ত্রিশে পঁয়ত্রিশে সত্তর মাইল! বিকালের মধ্যে সাহেব পেয়ে গেলেন সব। সাহেবরাও ছিল তেমনি। মামাকে বললেন, 'গুপ্তবাবু, তোমার চৌধুরী একটি ডেভিল'! হাঁ হে, হাঁ, তারা মানুষ ছিলেন—এক একটা পাঁঠা এক একজনে সাবাড়!—তোমরা একালে তাঁদের কি পেয়েছ? না তেমন দেহ, না তেমন প্রাণ। পূজা-আর্চা শুনলেই বলো—বাজে খরচ। একটা মানুষকে বাড়িতে খাওয়াতে পরাতে হলে এখন আমরা বলি—'লোকে স্বাবলম্বী হোক।—তার নাম সভ্যতা।"

খাওয়াইয়া পরাইয়া তিনি যখন রাজীবকে ছাড়িলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। রাজীবের মনে পড়িল বিভূতির ঘর কোথায়?

বাঁশের বেড়ার ছোট চালা ঘর। মেটে প্রদীপ জ্বালিয়া দিল বিভূতি। ভিতরে বাঁশের মাচার উপরে তাহার সাধারণ পাটি ও কাঁথা। বাঁশের সঙ্গে ঝুলিতে ঝুলানো পুঁথি-পত্র, জামা কাপড়। অন্যদিকে একটা ছোট উনুন; হাঁড়িকুড়ি বাসন। ব্রাহ্মণ বংশীয় বিভূতি নিজে রাঁধিয়া খায়, পরে, নিজেই সে ঘর দুয়ার পরিষ্কার করে, স্কুলে যায়,—তাহা এমন অসাধারণ কিছু নয়। রাজীবের নিজের জীবনের কথা মনে পড়িল। এমনি করিয়া

দেবপ্রসাদও তাহাকে স্কুলে পড়াইতেন, তাহারাও নিজেরা রাঁধিত বাড়িত। দেবপ্রসাদেরই যত্নে সে শহরে পড়িতে পাইয়াছে, কিন্তু দেবপ্রসাদের পুত্র বিভূতির জন্য রাজীব কি করিল? সে কি তাহাকে আপনার সঙ্গে লইতে পারে না?

মধু সেন অবশ্য উদার প্রকৃতির মানুষ, যাদবের মা-ও বিভূতিকে সন্তানবৎ স্নেহ করেন। কিন্তু ঢাকায়ও তাহাদের গৃহে এখন একজন গৃহ-কর্ত্রী আছেন; মনোরমা স্নেহবতী, বালক বিভূতি স্নেহে বঞ্চিত হইবে না। অথচ বড় শহরে শিক্ষারও বৃহত্তর সুযোগ লাভ করিবে! গ্রামে মহেশ্বরীকে সাহায্য করিতে না পারিলেও দেবপ্রসাদ চৌধুরীর ছেলের প্রতি এইটুকু রাজীবের কর্তব্য। মেজ খুড়া তাহাকে নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষাদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহা তিনি রাখেন নাই—কিন্তু রাজীবের ত কর্তব্য বুদ্ধি আছে?

রাজীব বলিল, বিভূতি, এভাবে নিজে রেঁধেবেড়ে পড়াশুনা করা মন্দ নয়। কিন্তু এখানে আপনার জন আর কেউ নেই—তুমি আমার সঙ্গে ঢাকা চলো। আমাদের কাছে থাকবে, ঢাকায় পড়বে।

বিভূতির মন উৎফুল্ল হয়, চক্ষু উজ্জ্বল হয়। সুযোগ বটে। কিন্তু তখনি সে অসম্মতি জানায়,—না।

রাজীব বুঝিতে পারে—তোমাকে ব্রাহ্ম হতে হবে না, বিভূতি।

বিভূতি বলিল, তা জানি।

তবে?

দেশে মাকে বিপদে পড়তে হবে। তাঁর নিজেরও ভয় আছে—আমি তাঁদের পর হয়ে যাব।

রাজীব নীরব হইয়া রহিল। রাজীবই চিত্রিসারের চৌধুরী বাড়িতে নিয়মিত সাংসারিক খরচ জোগায়। একান্নবর্তী সেই পরিবারে অন্যরা হয় উদাসীন, না হয় অলস; কেহই আসলে দায়িত্ব গ্রহণ করে না। অথচ

সেখানে রাজীবের কোনো অধিকার নাই। সে এখন শৈলীর ব্যাপারের পর চিত্রিসারেও সহসা যাইতে পারে না। পূর্বেও গেলে তাহাকে পরের মত বাহিরে অতিথিগৃহে থাকিতে হইত, সেখানেই আহারাদি করিতে হইত, সেই সুবিধাও দেবপ্রসাদ চৌধুরী ও মহেশ্বরীর চেষ্টায় তখন লাভ হইয়াছিল। তাহার আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাঘব দুষ্কৃতিপরায়ণ, সে রাজীবকে পৈতৃক বাসভূমি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্যই গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতেছে। অথচ, সেই রাজীবের অর্থে-ই চৌধুরী-গোষ্ঠী এখন প্রধানত প্রতিপালিত। অধিকার নাই, তবু রাজীবই দায়িত্ব পালন করে। রাজীব তাই শুনিয়া মর্মাহত হইল—যাঁহাদের মহেশ্বরীর মত তাহার প্রতি মমতা আছে, স্নেহ আছে, তাঁহারাও মনে করেন—রাজীব তাঁহাদের পর হইয়া গিয়াছে। কেন? শুধু ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া? কাহাকে তবে এই সমাজ আপনার মনে করে? রাঘবকে? অন্যায়কে, অধর্মকে, কুসংস্কারকে? কিন্তু রাজীবও ইহা মানিবে না—সে অধর্মকে, দুর্নীতিকে, কুসংস্কারকে সহ্য করিবে না। সত্যই তাহার পরম আপন, আর সেই সত্য গৃহে, সমাজে, রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই তাহাদের আয়োজন।

বিভূতিকে রাজীব বলিল, আমার কিন্তু তোমরা চিরদিন আপন। সময় এলে তুমিও দেখবে—এ সমাজও দেখবে—কে আপন, কে পর।

বিভূতি গিরীশকে বিস্মৃত হইতে পারিল না। আর রাজীব? বরাবরই ভালোবাসে এই উদার জ্যেষ্ঠ তাহাকে। হৃদয় কাড়িয়া লইল সে অল্পকালের মধ্যে আরও এক ঘটনায়।

দিন তিনেক পরে সেদিন শহরে হঠাৎ খবর আসিল রাজীব চৌধুরী গ্রেপ্তার হইয়া আসিয়াছে। হাতে দড়ি, কোমরে দড়ি, তাহাকে থানায় লইয়া যাইতে দেখিয়াছে শহরের মানুষ। মধু সেন শুনিয়াই থানায় ছুটিলেন —সরকারী ডাকের নৌকায় রাজীবের নামে অনধিকার প্রবেশের অভি-

যোগ। ব্যাপারটা আসলে এই :—গিরীশ আগের দিন চলিয়া গিয়াছে অন্য শহরে,—সেখান হইতেই কলিকাতা যাইবে। এই জিলার মহকুমা হইতে রাজীব যাইতেছিল অন্যদিকে—সে এবার ঢাকা ফিরিবে। ডাকের নৌকা ঢাকার দিকে যায়। সে নৌকায় দুই একজন সম্মানিত লোককেও ডাকের দারোগা এমনি লইয়া যায়—মাঝিরা কিছু বেশি ভাড়া পায়, ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে বলিতে দারোগা মহাশয়েরও পথে সময় কাটে। গহনার নৌকায় দেরী হইবে,তাই ডাকের নৌকাতেই যাইবে রাজীব, কথা স্থির হইয়াছে। ঠিক সময়ে আহারাদি করিয়া রাজীব নৌকায় উঠিয়া বসিয়াছে, বিশ্রাম করিতেছে। নৌকাও ছাড়িবে, এমন সময় হঠাৎ নিমকের সাহেব আসিয়া হাজির,—তাহার ফিরিঙ্গি সহকারীও সঙ্গে আসিয়াছে। সেও এই নৌকায় যাইবে। দারোগা শশব্যস্ত হইয়া জায়গা করিতে ছিলেন। কিন্তু সাহেবের সহকারী ফিরিঙ্গি বলিয়াই আপত্তি করিল, ওই নেটিভ কোন হ্যায়, ডারোগা ?—উহার সহিত সে নৌকায় এক সঙ্গে যাইবে না। নিমকের সাহেব দারোগাকে বলিলেন, উস্‌কো উতার দাও ডারোগা।

দারোগা সেলাম করিয়া বলিল : জী, সাহেব।

রাজীবের নিকট আসিয়া চাপা গলায় দারোগাবাবু বলিলেন, চৌধুরী মশায়! আপনাকে নামতে হল।

অকস্মাৎ যেন সিংহ গর্জন করিয়া উঠিল, কেন ?

দারোগা ভয় পাইয়া বলিলেন, শুনলেনই ত সব।

রাজীব গর্জিয়া উঠিল, শুনলাম বলেই ত নামব না।

দারোগা চাপা গলায় বুঝাইয়া বলিতে চাহিলেন, আস্তে! আস্তে!—তর্ক বাড়িল, কিন্তু ফল হইল না।

তিনি এবার বিরক্ত হইলেন, কি যে বলেন, কার সঙ্গে কি আচরণ করবেন ভুলে যাচ্ছেন। একি আপনার নৌকা, মশায় ?

রাজীব বলিল, তবে কি ওদের নৌকা ?

ওদের নয়ত কি আপনার ? মুলুকই ওদের।

এক মুহূর্তে আগুন জ্বলিয়া গেল রাজীব চৌধুরীর মাথায়। দশ বৎসরের বালক হিসাবে সে ওঝাজীকে দেখিয়াছিল। ঢাকায় সিপাহী বিদ্রোহের পলাতক নেতা দেবনন্দন ওঝার মুখে তখন শুনিয়াছিল হুঙ্কার —'লুট লিয়া হিন্দুস্থান'—কোম্পানি আমার মুলুক কাড়িয়া লইয়াছে; ওঝাজী প্রাণ থাকিতে তাহা দিবেন না। কোথায় গুলিতে প্রাণ হারান ওঝাজী! দেশে তাহার পরিবার পর্যন্ত নিঃশেষ করিয়াছে ইংরেজ। তবু 'বেইমানী করিলেন না ওঝাজী। স্বাধীনতাই ত ধর্ম— ইহাই সেদিন হইতে রাজীবের ধর্মের অঙ্গ।

নৌকাঘাটায় যাহা ঘটিল তাহার দাগ রাজীবেরও গায়ে আছে, সাহেবদেরও গায়ে আছে। দড়িতে বাঁধিয়া ডাকের দারোগা রাজীবকে শহরে চালান দিয়াছে, এখন সে হাজতে।

মধু সেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন—রাজাদের নায়েব চণ্ডীঘোষও তাহার বন্ধু। শিবপ্রসাদ চৌধুরীর পুত্রকে জেলে পাঠাইয়া বেইজ্জৎ করিবে কে? থানার দারোগার নিকট তিনি স্বয়ং গিয়া উপস্থিত হইলেন। শহরের দারোগা বলিলেন, করি কি সেন মহাশয়? বিপদ! এ তো সহজ ব্যাপার নয়। ডাকের নৌকার ব্যাপার। উহাতে বাহিরের লোক উঠিলেই দণ্ডনীয়।

মধু সেন বলিলেন, সে সব কথা রাখুন—আপনিও সব জানেন, আমিও সব জানি। ডাকের নৌকায় কে না যায়? চাপ দিন মাঝিদের —আপনারা সে বুদ্ধি দেখুন। আমি কিন্তু নইলে প্রমাণ করব—ডাকের দারোগাই টাকা নিয়ে লোক তুলে নেয় নৌকায়। বেগমপুরার রাজাদের নায়েব চণ্ডীবাবু আছেন আমার সঙ্গে। সাক্ষী প্রমাণ বরকন্দাজ লাঠিয়ালেরও অভাব হবে না তাঁর।

মধু সেন জামিন লইয়া রাজীবকে ছাড়াইয়া আনিলেন। ওদিকে সাহেবদের নিকট ডালি গেল। পুলিশ সাহেব শেষ পর্যন্ত মামলা তুলিয়া লইলেন। ইংরেজ হাকিম রাজীবকে বলিলেন, ইয়ং ম্যান, অতটা দুঃসাহস করো না। তোমরা শিক্ষা পাচ্ছ, তোমরাই হলে এ দেশের আশা—দেশকে রিফর্ম করো প্রথম।

ছোট হাকিম বাবু এবার আসিয়া রাজীবকে তিরস্কার করিতে বসিলেন, কি যে পাগলামো করো, তোমরা ইয়ংম্যান! আমিই ম্যাজিষ্ট্রেটকে বুঝিয়ে বললাম— আমরা রিফর্মের দলে সাহেব। জানো ত কি অত্যাচার হিন্দুরা করে আমাদের উপর।' সব খুলে বলতে হল— তাতেই তিনি ছেড়ে দিলেন। কার সঙ্গে ঝগড়া করো তোমরা বোঝ না।

রাজীব শুধু বলিল,—ঝগড়া আমি করিনি। ওরাই করেছে।

হাকিমবাবু আবার বলিলেন, কিন্তু তোমার কি রাইট্ ছিল তুমি ডাকের নৌকায় যাবে?

'রাইট্' কথাটা শুনিয়া রাজীব চমকিয়া উঠিল;—রাইট্স্ অব্ ম্যান তাহাদের মন্ত্র। সেও বলিল, ওদেরই কি সে রাইট্ আছে নাকি?

হাকিমবাবু বিরক্ত হইলেন।—তর্কই করবে তোমরা। কে শত্রু, কে মিত্র তাও চিনবে না। এদেশে ইংরেজ রাজত্ব না থাকলে এ তর্ক তোমাকে করতে হ'ত না, তা বোঝা?

রাজীব ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, খুব বুঝিছি!

হাকিম সাহেব বলিলেন. কি বুঝেছ?

ইংরেজ না থাকলে দেশের শিক্ষিত লোকেরা বেইমান হতে শিখত না।

বিস্ময়ে শুধু হাকিম বাবু বলিলেন, কি হতে শিখতো না?

বেইমান! যা আমরা হচ্ছি।

হাকিম সাহেব চটিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ডেভিল টেক্ ইউ!

কিন্তু সেইখানেই সে পালা শেষ।

মধুসেনের বাহিরের মহলে পাঁঠা কাটা হইয়াছিল, একটা ভোজ লাগিল। শিবপ্রসাদ চৌধুরীর ছেলে বাপের ব্যাটা; তাহাকে না খাওয়াইয়া তিনি ছাড়েন কি করিয়া? রাজীবের মহাসমাদর। কিন্তু চুপে চুপে মধু সেন পুত্র যাদব ও বিভূতিকে বলিতে ছাড়িলেন না:

লোকটা পাগল! সাবধান! ওর পাল্লায় পড়িস না।

বিভূতি ও যাদব কিন্তু ততক্ষণে 'দাদাভাই'কে একটা আদর্শ করিয়া ফেলিয়াছে।

রাজীব যখন ঢাকায় পৌছিল তখনো তাহার গায়ের দাগ মিলাইয়া যায় নাই। এক মুহূর্তে মনোরমা চমকিয়া উঠিল—কি ডাকাত আপনি, চৌধুরী ঠাকুরপো! সাহেবদের সঙ্গে লাগলেন! এত সাহস!

সাহসটা কি আপনারই কম, বউঠান! সমাজের সঙ্গে লাগ্‌লেন।

৫

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সেদিন সকালে চিন্তাহরণ মনোরমাকে পড়াইতে বসিয়াছিল। সে মুখে কিছু না বলিলেও ঘরের উত্তাপ তাহাকে স্পর্শ করিতেছিল বৈকি। মিস স্টর্ক আসিলেই মনোরমার মুখ গম্ভীর হইয়া যায়। নিতান্ত সে পড়িতে যায় খানিকটা গিরীশের ভয়ে আর চিন্তাহরণের মুখ চাহিয়া। কিন্তু তাহা হইলে তো পড়া অগ্রসর হইবার কথা নয়। দুই তিন মাস পড়াশুনা চলিতেছে, মনোরমার সুচারু গৃহব্যবস্থায় আহারাদি ব্যাপারে এখন তাহারা নিশ্চিন্ত; রাজীবের তো উৎসাহের অবধি নাই। মনোরমার সহিত তাহার একটা সহজ আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিয়াছে, এখন স্বচ্ছন্দ ভাবেই সদর অন্দরে সে অপ্রতিহত গতি। বাজার হইতে কি আসিল তাহা লইয়া মনোরমা ও রাজীবের কৌতুককর কথাবার্তা চিন্তাহরণ শুনিতে পায়। এক মনোরমা বাদে তাহাদের তিনজনারই স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়াছে। কিন্তু মাস কয় পূর্বে সকালবেলায় যে লাবণ্যময়ী তরুণী উজ্জল মুখ ও পরিপুষ্ট স্বাস্থ্য লইয়া চিন্তাহরণের পায়ের কাছে অবনত হইয়াছিল তাহার দেহের লাবণ্য ও মুখের ঔজ্জ্বল্য আর যেন ফুটিয়া উঠিতেছে না। মনোরমা কিছু না বলিলেও চিন্তাহরণ বুঝিতে পারে সে কিছু একটা ভাবিতেছে আর সে ভাবনা ক্লেশদায়ক। সংসারের কাজে সে অভ্যস্ত, তাহাতে তাহার আলস্য নাই। মিস স্টর্কের দেওয়া বাড়ির কাজগুলি অভ্যাস করিতে বসিয়া তাহার চোখ চলিয়া যায় খোলা জানালার দিকে। চিন্তাহরণ অতর্কিতে আসিয়া পড়ায় চমকিয়া সে কখনও মৃদু হাসিয়াছে, কখনও হাতের উল্টাপিঠে চোখের জল মুছিয়া বইয়ের পাতায় চোখ নামাইয়া লইয়াছে। সমস্ত শুদ্ধ চিন্তাহরণ ভাবিয়া পায়না কি ভাবে মনোরমাকে এবিষয়ে

খানিকটা অন্ততঃ সে সাহায্য করিতে পারে। ছাত্র পড়াইবার অভিজ্ঞতা চিন্তাহরণের আছে, কিন্তু ছাত্রী, বিশেষ সে ছাত্রী যদি স্ত্রী হয়, তাহাকে পড়াইবার অভিজ্ঞতা চিন্তাহরণের নাই। এমনই তাহাদের সমস্ত সম্পর্ক ও আবহাওয়াটাই একটু জটিল; দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বোধে উদ্বুদ্ধ চিন্তাহরণ মনোরমাকে যতখানি আশ্রয় দিতে চায় ততখানি আগ্রহ দেখাইতে পারে না। মনোরমাও তাহার স্বামীর গাম্ভীর্য্য ও দূরত্বের অন্তরালে নিজেকে খানিকটা অবগুণ্ঠিত চেতনার মধ্যেই রাখিয়া চলে। বরং রাজীবের সঙ্গেই সাধারণ কথাবার্তায় সে আপনাকে বেশী অসংকোচে প্রকাশ করে। সেই অসম্পূর্ণ কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণাই আজ চিন্তাহরণকে মনোরমার খাতাপত্রের পাশে টানিয়া আনিল। কাল রাত্রে সে মনোরমাকে এবিষয়ে আভাস দিতে গিয়া বিশেষ উৎসাহ পায় নাই। বরং মনোরমা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে জানাইয়াছিল যে, সে কিছু বুঝিতে পারে না কেন মিস ষ্টর্ক এই দেশের সকলকার সব কিছুর অত নিন্দা করেন। এই মর্ম্মের একটা সংশয় চিন্তাহরণেরও ছিল, রাজীবেরও যথেষ্ট ছিল।

সকালবেলা ছুটির দিন—রাজীব বেড়াইতে গিয়াছে। মনোরমা ভাত চাপাইয়া বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া মাইকেলের বীরাঙ্গনা কাব্য হাতে লইয়া পাতা উল্টাইতেছিল। এতদিনে মাইকেলের কোনো কোনো কাব্য সে পড়িয়াছে—সব কথা সে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু সে জানে মাইকেল হিন্দুধর্ম খারাপ বুঝিয়া খ্রীষ্টান হইয়াছেন। কিন্তু মেঘনাদ বধ তো রামায়ণের কাহিনী লইয়া লেখা, ব্রজাঙ্গনাও বৃন্দাবন লীলার কথা। অথচ মিস্ ষ্টর্ক কৃষ্ণকে একটা লম্পট বলিয়াই মনে করেন। মাইকেল এগুলি খারাপ মনে করেন নাই। কিন্তু মিস ষ্টর্ক কেন ··।

চিন্তাহরণ ধীরে সুস্থে পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করে, কি পড়ছিলে? বীরাঙ্গনা কাব্য?—চিন্তাহরণ আগ্রহান্বিত হয়।

মনোরমা ঈষৎ ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, মাইকেল খ্রীষ্টান

হয়েও তো এই সব রামায়ণ মহাভারতের কথা লিখেছেন। তবে মিস স্টর্ক কেন আমাদের সব কিছুর নিন্দা করেন ?

চিন্তাহরণ বিস্মিত নেত্রে মনোরমার মুখের দিকে তাকাইল। অত্যন্ত সরল জিজ্ঞাসু দুটি চোখ, কিন্তু বুদ্ধির দীপ্তিহীন নয়। শরতের প্রসন্ন প্রভাতের এক ঝলক রোদ বিধাতার আশীর্বাদের মত মনোরমার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। চিন্তাহরণ মনোরমাকে আজ একটি নূতন চোখে দেখিল ;—কিমেতদ কিমেতদ, এই জিজ্ঞাসাই মানুষকে পথ দেখায়, সম্পূর্ণ করে।

কেন, মিস স্টর্ক তোমায় কি তেমন কিছু কথা বলেছেন নাকি ?

অনেকখানি মনের দন্দ্ব পাশ কাটাইয়া মনোরমা অবশেষে বলে : আমার ভালো লাগে না—আমি ওঁর কাছে পড়ব না।

সে কি !—চিন্তাহরণ বলিতে থাকে,—গিরীশ কত ক'রে বলাতে তবে উনি তোমায় পড়াতে রাজী হয়েছেন।

মনোরমাব চোখের দ্রুত অবনমনের মধ্যেই সে মনোরমার অকথিত কথাটুকু উদ্ধার করিয়া লয়।—কিছুদিন পর দেখবে উনি সত্যই নানারকমে আমাদেব দেশের ভালমন্দ সবকিছু অনেকটাই দেখেছেন।

মুখে মনোরমাকে একথা বলিলেও প্রশ্ন কিন্তু চিন্তাহরণের মনেও আসিয়া গিয়াছে। রাজীবের সঙ্গে গিরীশের তর্কও তাহাকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। পরাধীনতার পাপ স্বাভাবিক ভাবেই অন্যায় বোধকে প্রশ্রয় দেয়; রাজার জাতি বিজিত জাতির লোককে ক্ষমতার উগ্রতায় উপেক্ষা করে। কিন্তু উপায় নাই ; মনোরমাকে পড়াশুনা করাইতেই হইবে—মিস স্টর্ক বহু ছাত্রীকে 'মানুষ' করিয়াছেন। মিস্ স্টর্কের খানিকটা উগ্রতা না সাহয়াও তাই উপায় নাই। এই সব ভাবনার মধ্যেই মনোরমার কণ্ঠস্বর তাহার কাণে আসে,—যীশুও ত একজন অবতার ?

বাধা দিয়া চিন্তাহরণ বলিয়া ওঠে,—না, না, অবতার নয়। উনিও একজন মানুষ, খুব বড় মানুষ বুদ্ধের মত, চৈতন্যের মত।

চৈতন্যদেবের মত?—মনোরমার মুখ পরিচয়ের আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মনে পড়িয়া যায় কীর্ত্তনের সুরধারা আর মহাপ্রভুর করুণার বাণী—মেরেছ কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দেব না—

যীশুও কি তবে মানুষকে ঘৃণাই করতেন না—খ্রীষ্টান মিস্ ষ্টর্কের মত? মহাপ্রভু বুদ্ধদেব কি ঠাকুর নন—?

না, না, মনোরমা,—চিন্তাহরণ বলে,—বুদ্ধদেব শ্রীচৈতন্য মানুষকে ভালোবেসে তাদের সমাজের নানা কুসংস্কার থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, সংস্কার করতে চেয়েছিলেন।—অত্যন্ত ধীর ভাবে ব্যক্তিত্ববান শিক্ষক চিন্তাহরণ আগ্রহশীল ছাত্রীর কথার জবাব দেয়। মনোরমার দিশাহারা চিন্তাধারাটাকে তাহার আয়ত্তের মধ্যে না আনিলে চলিবেনা, বিপর্য্যস্ত মনোরমা আশ্রয় পাইবেনা।

অকস্মাৎ মনোরমা রুদ্ধস্বরে বলিয়া ওঠে, তোমরা? তোমরা তো কেউ মানুষকে ভালবাস না—তোমরা শুধু শুধু মানুষকে কষ্ট দাও ..

চমকিত হয় চিন্তাহরণ। খাতা পত্র হস্ত হইতে স্খলিত: মনোরমা দুই হাঁটুর মধ্যে অশ্রুপ্লাবিত মুখ লুকাইয়া ফেলিল।

সত্যই কি তাই? স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে তাহারা কি ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করিতেছে? খর্ব করিতেছে মনোরমার ব্যক্তিত্ব—মিস ষ্টর্কের অধ্যাপনার আড়ম্বরে? দুর্বলকে প্রবলের শাসনে নিহিত রাখাই কি তাহাদের নবধর্মের এইরূপ উৎসাহের অন্তরাল হইতে উঁকি মারিতেছে? মানুষের অধিকার, পরিপূর্ণ সুষমার পথ তবে কই?

চিন্তাহরণ একটু জোর করিয়াই মনোরমার মুখ উঠাইবার চেষ্টা করিয়া তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া আনে।

সহসা মনে পড়িয়া যাওয়ায় মনোরমা চিন্তাহরণের হাত ছাড়াইয়া

রান্নাঘরের দিকে উঠিয়া যায়—ভাত নামাইবার সময় হইয়াছে, ধরিয়া যাইতে পারে।

চিন্তাহরণ খানিক পরে একটু অন্যমনস্ক ভাবে মনোরমার লেখার খাতা উল্‌টাইয়া চলে। না, অবাধ্য ছাত্রী নয় মনোরমা। চেষ্টার ত্রুটি সে করে নাই। ইংরেজি সে নূতন শিখিতেছে, ওয়ার্ড বুক ছাড়িয়া সহজ শব্দ শিখিতেছে। বাংলা লেখার ছাঁদ—খুব সুগঠিত না হইলেও—খারাপ নয়। একখানা ছোট খাতায় চিন্তাহরণের শিক্ষা মতই হিসাবও লেখা। গাঙ্গুলী বাড়িতে ইহা মনোরমার কার্য ছিল না; কিন্তু চিন্তাহরণ বলে—হিসাব রাখা একটা সুনিয়ম সুশৃঙ্খলা; তাই মনোরমা সংসারের হিসাব মোটামুটি লিখিয়া রাখিয়াছে—মনোরমা বিশৃঙ্খলার পক্ষপাতী নয়। সেই খাতারই এক পাতায় চিন্তাহরণ হিজিবিজি কিছু লেখার মধ্য হইতে আবিষ্কার করে—মনোরমার হাতে তাহার নিজের নাম—ইংরেজি হরফে দুই তিন স্থানে লেখা—'চিন্তাহরণ'—'চিন্তাহরণ'—! এক জায়গায় বাংলায় লেখা,—শ্বাশুড়ী বলিয়াছেন 'আপন সংসার আপনি করো।' তারপর 'ঠাকুর পো আমাকে কেন দেখিতে পারেননা? আমি তাঁর দাদার যোগ্য নই?' ···না, ডায়রী লেখে নাই মনোরমা! কিন্তু তবুও এই পৃষ্ঠা মনোরমারই অন্তরের একটি পৃষ্ঠা। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে চিন্তাহরণ তখনকার বিদেশী পুস্তকেরও উপন্যাসের রস কিছু কিছু গ্রহণ করিতেছে। শুধু স্কট বায়রন নয়, সে ডিকেন্স ও জর্জ এলিয়টেরও খোঁজ রাখে। ব্রাহ্মনীতির কঠোরতা সত্ত্বেও নরনারীর জীবনের গভীরতর অনুভূতির কথা সে জানিয়াছে—সেক্সপীয়রের সে ভক্ত; ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ এবং টেনিসনও সে পাঠ করিয়াছে। বঙ্কিমের বিষবৃক্ষের বিরুদ্ধে সমাজ-সংস্কারকরূপে আপত্তি করিতে গিয়া বুঝিয়াছে—মানুষের হৃদয়-বৃত্তি ভালো করিয়া না ফুটাইতে পারিলে সেই প্রতিবাদ ব্যর্থ হইবে।

মানুষের সেই হৃদয়-বৃত্তিকে শুধু সমাজ সংস্কারের দোহাই দিয়াও চিনা যায় না। কিন্তু সে-ই বা কী চিনিয়াছে উহার?—সকাল বেলায় অপরিজন গৃহে, মনোরমার হস্তলিখিত আঁকা বাঁকা অক্ষর কয়টির মধ্যে 'দুর্গেশনন্দিনী'-পড়া চিন্তাহরণ সহসা অনাস্বাদিত একটা আবেগ ঈষৎ সংকোচ ও আনন্দের সহিত আবিষ্কার করিল। সে ও মনোরমা —তাহাদের দুইজনার মধ্যে আর কোনো মানুষ নাই, থাকিতে পারে না—ইহাই হৃদয়ের বিধান। আর হৃদয়ের বিধানই ধর্ম। অথচ সকলেই যেন থাকিতে পাবে,—রাজীবের মত উদার বন্ধু মাত্র নয়, গিরীশের মত তেজস্বী পুরুষও থাকিবে;—তাহার জীবনকে উহারা সম্পূর্ণতা দিবে,— এমনি একটা কথাও তাহার বারবার মনে হইতে লাগিল। তাহার সংসারে ইহারা না থাকিলে জীবনে সুষমা কোথায়? অথচ অন্তরের মধ্যে সে গভীররূপে অনুভব করিতে পারিল উৎসর্গীতা মনোরমাকে, মনোরমার আত্মসমর্পণের পথটিকে।

না, গিরীশের পথ নয়—মিস ষ্টর্ক নয়। চিন্তাহরণ স্থির করিল— মনোরমাকে শিক্ষাদান সে নিজে করিবে; তাহা না হইলে মনোরমা থাকিবে অসচ্ছন্দ আর তাহার নিজের জীবন হইয়া উঠিবে অসম্পূর্ণ। জীবনের প্রয়োজনেই আজ মনোরমার চরিত্রের মধুর অনাস্বাদিত দিকটি তাহার কাছে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, চিন্তাহরণ এই নবীন পরিচয়েও বিধাতার শ্রেয়ঃ বিধান দেখিতে পাইল।

চিন্তা-বিমনা চিন্তাহরণের চোখের সামনে হাতের কাজ সারিয়া মনোরমা আসিয়া দাঁড়াইল। চিন্তাহরণের চোখে এমন কিছু সে একটা দেখিল যে সে প্রথম মুখ একবার ঈষৎ নত করিয়া লইল। তারপর ধীরে ধীরে বালল,—রাজীব ঠাকুরপো ডাকছেন, বাইরেকার দুয়ারটা খুলে দাও,—তুমি তার ডাক শুনতে পাওনি—

দ্বিপ্রহরে গৃহকর্ম-শেষে মনোরমা এক এক দিন কেমন শূন্য বোধ করে। চিন্তাহরণ স্কুলে, রাজীব স্কুলে, গৃহ নির্জন, মনোরমা একা। যেদিন মিস্ ষ্টর্ক পড়াইতে আসেন সেদিন আর সে একা থাকে না, কিন্তু সেদিনটা তাহার আরও ক্লান্তিকর হইয়া উঠে। চিন্তাহরণ তাহার শিক্ষাভার কতকাংশে গ্রহণ করাতে সে কতকটা বিদ্যালাভেও যত্নশীলা হইয়াছে; কিন্তু সে বিদ্যার গুণে নয়, চিন্তাহরণের আকর্ষণে। এখনো সে পড়াশুনায় তেমন রস পায় না, তাহার উপর আবার শিক্ষাদান করিতে আসেন শিক্ষয়িত্রী মিস্ ষ্টর্ক—সর্বদাই যেন দোষ-ত্রুটি, সকলের দুর্নীতি ও পাপ ধরিয়া দিবার জন্য ও শাসন করিবার জন্য মিস্ ষ্টর্ক উদ্যত। যীশু যেন তাহাকে এইভারই অর্পণ করিয়াছেন। মনোরমা কেবলই শোনে—'পাপের শাস্তি মৃত্যু; আর পাপ হইতে নিষ্কৃতি নাই। বিধাতার বিচারে কাহারও ক্ষমাও নাই।' আবাল্য মনোরমা অন্যরূপ কথাই শিখিয়াছে—দস্যু রত্নাকর রাম নাম জপ করিয়া বাল্মীকী হইয়াছেন; একবার হরি নামে যত পুণ্য হয়, মানুষ সমস্ত জীবনেও তত পাপ করিতে পারে না। মিস্ ষ্টর্কের কথায় মনোরমা প্রথমত তাই মনে মনে ভাবিত—সত্যই কি, মানুষের উপর বিধাতা এত বিমুখ? ক্রমে চিন্তাহরণকেও সে না বলিয়া পারিল না, তুমি ত বলো যীশু-ও দয়ার অবতার। কিন্তু ওরা ত রাতদিনই বলে—পাপের শাস্তি মৃত্যু, বিধাতার বিচারে কারো ক্ষমা নেই।

চিন্তাহরণ বুঝিতে পারিল। হাসিয়া বুঝাইয়া বলিল, যীশুকে ওঁরা ওঁদের মত কড়া মেজাজের সাহেব বলে মনে করেন। আসলে তিনি মোটেই সাহেব নন, আমাদের প্রাচ্য দেশের মানুষ। তাই তাঁর উপদেশ ক্ষমা, ত্যাগ, করুণা, ভগবদ্ বিশ্বাস। আমাদের মহাপুরুষেরাও ঐসব বারবার উপদেশ দিয়েছেন; তাই এসব আমরা যত সহজে বুঝতে পারি ওঁরা তা পারেন না।....যীশু সম্বন্ধে এ কথাই ব্রহ্মানন্দ চমৎকার করে বলেছেন, ভালো ভালো খ্রীষ্টানরাও তা মানেন। তবে ব্রহ্মানন্দ মনে

করেন—যীশু বিধাতার 'প্রেরিত পুরুষ', বিধাতার 'আদেশ' পেয়েছেন।
—চিন্তাহরণ বুঝাইতে চাহিল 'প্রেরিত পুরুষ' কাহাকে বলেন কেশবচন্দ্র, মনোরমা তাহা শোনে না।

একটু ক্ষুব্ধ হইয়াই মনোরমা আর একদিন চিন্তাহরণকে বলিল, একটা কথা বলব, আমরা সবাই কি পাপী? সবাই নরকে যাব?

চিন্তাহরণ অবাক হয়।—সবাই পাপী হব কেন?

মিস্ ষ্টর্ক তাই বলেন। আমি নয় পাপীই—যীশুর কথা বুঝি না, ওঁকে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলি না। কৃষ্ণ, রাম, চৈতন্য এঁদেরকে অবতার মনে করি—যীশুকেও বলি অবতার। কিন্তু তুমি ত যীশুর ভক্ত। আমি বললাম, তিনি যীশুর ভক্ত—তিনি ত আর পাপী নন। মেম সাহেব বলে উঠলেন: নো। কিছুতেই ওসব ফাঁকি খাটবে না—সদাপ্রভুর কাছে। 'প্রভু' 'প্রভু' বলে অথচ আমাদের সদাপ্রভু খ্রীষ্টকে যে ভজন করে না, তার পাপ আরও ভয়ানক। —আমিও তখন রাগ করে তাকে বললাম, পুণ্যে তবে আমার দরকার নেই—থাক। মেম সাহেব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বক্র হাসি হেসে বললেন,—ওঃ! হিন্দু রমণী। ভাবছ পতির পাদোদক খেয়ে স্বর্গে যাবে। নো, তাতে তোমার স্বামীও স্বর্গে যেতে পারবে না, তুমিও পারবে না।

চিন্তাহরণ হাসিল। বলিল: তাই বুঝি ক্ষেপে গিয়েছ।—স্বর্গে যেতে পারবে না!

মনোরমা রাগ করিয়া বলিল: আমি স্বর্গ চাই না; তোমার সংসারই আমার ভালো।

চিন্তাহরণের চোখ মুখে উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। একটু পরে হাসিয়াই সে বলে: কিন্তু মিস্ ষ্টর্ক ওকথাটা ঠিক বলেছেন—পাদোদক দিয়ে উদ্ধার পাওয়া যায় না।

মনোরমা বলে, না, ওসব কথায় আমাকে ভুলোতে পারবে না। সত্য

কথা বলো ত, আমরা কি সবাই পাপী? ভগবান আমাদের শাস্তি দেবেন?

চিন্তাহরণ হাসিয়া বলিল: ভগবান কি পাগল, না খুনে বা ডাকাত? —তারপর চিন্তাহরণ স্থিরভাবে বলিল, ভগবানকে আমরা বলি করুণাময়; তিনি আমাদের স্রষ্টা। তিনি তাঁর সৃষ্টির উপর রাগ করবেন, প্রতিশোধ নেবেন,—কখনো তা হয় না।

ওরা তবে বলে কেন—তুমি পাপী, তোমার স্বামীও পাপী।

ওসব কথায় কান দিও না। ওরা খ্রীষ্টের নামে ধমক দিয়ে মানুষকে বশ করতে চায়। অন্য যা পড়ায়, পড়াক।—

কিন্তু মিস্ ষ্টর্কের পড়ানো অর্থ-ই 'খ্রীষ্টীয় জীবন' সম্বন্ধে জ্ঞানদান, উপদেশ-দান। তাই মিস্ ষ্টর্কের নিকট পড়া মনোরমার নিকট আনন্দের ব্যাপার নয়, একটা পরীক্ষা। প্রথম দিকে সে তাহাতে শঙ্কিত বোধ করিত,—পাছে চিন্তাহরণ রুষ্ট হয়, কিন্তু এখন যখন চিন্তাহরণেরও মনোভাব সে বুঝিতে পারিয়াছে—তখন তাহাতে আর সে ততটা ভীত বোধ করে না, সে বিরক্ত হয়, আপনার বিরক্তিও জানায়।

বরং মিস্ ষ্টর্ক না আসিলেই সে খুশী হইত—পাড়া প্রতিবেশিনীদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে অন্তত সেদিন কিছু-কিছু গল্প করিতে পারিত —শুনিত তাহাদের বাড়ির কথা, মায়ের কথা, কে কি রাঁধেন, কি তাহারা খায়, কি পরে, কি শোনে, কুটুম্ববাড়ির সম্বন্ধে কি বলে। মনোরমা ইহাদের ছাড়া প্রতিবেশীদের আর কাহারও সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ পায় নাই—তাহারা এই পাড়ায় এখনো বিচ্ছিন্ন। প্রতিবেশিনী গৃহিণীরাও তাহাকে পরিচয়েরও বাক্যালাপের সুযোগ দেয় নাই।

কেন তাহাদের এই আচরণ, প্রথম প্রথম মনোরমা তাহা বুঝিতে পারে নাই। পরে বুঝিয়াছে, ব্রাহ্ম বলিয়া তাহারা পাড়ার সামাজিক

মেলামেশায় অপাংক্তেয়! পাশের বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও তাহার পরিচয় এই কারণেই প্রথমে সহজসাধ্য হয় নাই।

তাহাদের মেয়েটির নাম ছিল রাধু। মনোরমা প্রথম যখন এইগৃহে আসিয়াছে, তখন সে বহুবার দেখিয়াছে—নিজেদের বারান্দা হইতে, বাতায়ন হইতে, বৎসর সাতেকের মেয়েটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখে। মনোরমা বোঝে—তাহার চোখে কৌতূহল, নূতন মানুষ কে আসিল এই পুরুষ-অধিকৃত গৃহে? রাধুর সঙ্গে মনোরমা কথা বলিতে আগাইয়া গেলে মেয়েটি অমনি ছুটিয়া পালায়। প্রথম দুই তিন দিন বারবার এইরূপ ঘটিল। মনোরমার ইহাতে বেশ মজা পাইয়াছিল—ইহা যেন দুইজনের লুকোচুরি খেলা।

তারপর একটা উপলক্ষে মনোরমার কথা বলিবারও সুযোগ হইল। রাধু ছাদের শুষ্ক বস্ত্র তুলিতেছিল—একখানা হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া যায় মনোরমাদের উঠানে। মনোরমা তাহা ধরিয়া ফেলে, তুলিয়া আনিয়া সকৌতুকে ডাকিল: এইবাব কি করবে রাধু? এইবার ত আসতে হবে।—রাধু লজ্জা পাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

মনোরমা আরও কৌতুক বোধ করে:—মুখ ফিরিয়ে নিলে কি হবে? তোমার নাম পর্যন্ত জানি, রাধু। আর এদিকে না ফিরলে কাপড় পাবে কেন?

হাসিয়া রাধু ঘুরিয়া দাঁড়াইল। কথা বলিতে যাইবে, এমন সময় হঠাৎ সেই বাটীর প্রাঙ্গণ হইতে একটা তীব্র কণ্ঠ শোনা গেল—রাধি। তারপর,—ও কাপড় ছুঁসনে, খ্রীষ্টান বাড়ির ছোঁয়া কাপড়। রেখে আয় ছাদে, ধুয়ে নিতে হবে।

মনোরমা বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। 'খ্রীষ্টান বাড়ির ছোঁয়া কাপড়'। সে খ্রীষ্টান, তাহার স্পর্শও ইহাদের নিকট অপবিত্র। সত্যই ত, সে ত ইহাদের চক্ষে খ্রীষ্টানই। স্বামীর সংসার ত সে

ইহা জানিয়াই করিতে আসিয়াছে।—কখন যে রাধু চলিয়া গিয়াছে তাহাও সে টের পায় নাই। শুষ্ক কাপড় সেই ছাদে সন্তর্পনে ফেলিয়া নিচে নামিয়া আসিয়া মনোরমা একান্তে বসিয়া পড়িল। স্বামীকে সহজে পাইলেও সমাজের কতদিকে যে কত মূল্য তাহার এখনো দিতে হইবে, তাহা এতদিন সে ভাবিবার সময় পায় নাই। এই প্রথম তাহা বুঝিল।

তবু সেই রাধু তাহার সঙ্গে নিজে কথা কহিল। বাড়ির পিছনকার প্রাঙ্গণের ছোট বাগানে চিন্তাহরণ ফুলগাছ পুঁতিয়াছে, বেল ও মল্লিকা ফোটে, গোলাপেরও দর্শন পাওয়া গেল। তাহা কতদিন না তুলিয়া থাকা যায়? জামগাছটার জাম এখন কালো হইতেছে, রাধু বন্ধুদের সহিত মধ্যাহ্নে তাহাও খাইতে না আসিয়া পারিল না। মনোরমার নিকট ধরাও পড়িল। কিন্তু জাম যখন পাইল তখন তাহারা খুশী হইল। আত্মীয়তা জমাইয়া জাম আদায় করিবার সুযোগ লাভ করায় তাহার পরে আর মনোরমার সঙ্গে কথা বলিবার বাধাও রাধুর রহিল না। মনোরমার কথা বলিবার মত মানুষ জুটিল—'খ্রীষ্টান বাড়ির বউ' শুধুই খ্রীষ্টান নয়, 'মাসীও'।

কিন্তু মিস ষ্টর্কের দাপটেই আবার সেই সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। রাধু আর আসে না। এত বয়স হইয়াছে তবু মনোরমা আবার বই পড়ে, শিক্ষয়িত্রীর নিকট পাঠ গ্রহণ করে, ইহা রাধুর একটা বিস্ময়! উপরের ছাদ হইতে দাঁড়াইয়া মিস্ ষ্টর্ককে রাধু দেখে। প্রথম প্রথম ভয়ে ভয়ে দেখে, পরে তাহাকে পিছন হইতে জিব্ বাহির করিয়া ভেঙচি কাটে। মেমকে ভয় করিলেও বিদ্রূপ করিতেও সে ছাড়ে না। মনোরমা চোখে-মুখের ইঙ্গিতে বারণ করে, রাধু তাহাতে উল্টা উৎসাহ বোধ করে। রাধু একটা নূতন খেলা পাইয়াছে—'স্কুল মাসীকে' তাড়না করা যাইবে। মনোরমা মনে মনে রাধুর দুষ্টামিতে সায় দেয়—মিস্ ষ্টর্ককে কেহ পসন্দ না করিলে মনোরমা খুশীই হয়। তাহার আগমনে টের পাইলেই গাড়োয়ানদের মত জিহ্বায় শব্দ করিয়া রাধু বলে 'হেট্, হেট্।'

মেম সাহেবকে সে বলে ঘোটকী,—অশ্বখুরের মত টগাবগ শব্দ তুলিয়া সে আসে যায়। অথচ ইহারই প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা মনোরমার দেবর গিরীশ গাঙ্গুলীর, এবং তাই স্বামীও তাহাকে ভয় করেন।

সুন্দর কয়েকটা ছবির বই দিয়াছিলেন মিস্ ষ্টর্ক মনোরমাকে। পাড়ার বাচ্চা মেয়েদের ডাকাইয়া আনিয়া তিনি আরও ছবি বিতরণ করিতে চান, কিন্তু এ পাড়ার মেয়েরা তখনো তাহার কাছে ঘেঁসে না। রাধুকে আনাইয়া সেই ছবি তিনি দিলেন, রাধুর খুসীর আর সীমা নাই— একপাল মেয়ের মধ্যে লম্বা চেহারার একজন ফকির না দরবেশ। পরদিনই কিন্তু সব ছবি রাধু অনিচ্ছায় হইলেও ফিরাইয়া দিয়া গেল— খ্রীষ্টানের ছবি। বাবা দাদা দেখে ফেরৎ দিতে বলে দিয়েছেন।

মনোরমা দুঃখিত হইল না। মিস্ ষ্টর্ককে মনোরমা বরং জানাইয়া দিল—এ পাড়ার কেহ এই সব চিত্র গ্রহণ করিবে না।

কেন?

যীশুর ছবি ওরা ঘরে রাখবে না।

মিস্ ষ্টর্ক ক্ষিপ্ত হইলেন:—পৌত্তলিক পাপিষ্ঠরা! এইজন্য তাদের কঠোর শাস্তি পেতে হবে—ভবিষ্যতে।

মিস্ ষ্টর্কের এই মর্মের উক্তি মনোরমা অনেক শুনিয়াছে—যীশুকে যাহারা ঈশ্বরের একমাত্র জাতপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিবে না, তাহাদের মুক্তি নাই।

কিন্তু মিস্ ষ্টর্ক যখন বলিলেন রাধুকে কঠোর শাস্তি পাইতে হইবে। মনোরমা তখন আর বিরক্তি চাপিতে পারিল না।

ওর অপরাধ কি?

সে মহাপাপিষ্ঠা।

মহাপাপিষ্ঠা! সে তো এখনও বালিকা।

তাতে কি! শয়তান শান্ত মেষপালের মধ্যেও ঢুকে তাদের ধ্বংসের পথে ধাবিত করে।

মনোরমা সহ্য করিতে পারিল না। বলিল: কিন্তু পাপের কি জানে এই ছেলেমেয়েরা যে তারা পাপিষ্ঠা হবে?

মিস্ ষ্টর্ক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, পাপ মানুষের জন্মগত। একমাত্র যীশুতে যারা বিশ্বাস করে তিনি তাদের সেই পাপের বোঝা নিজে হরণ করেন।

খ্রীষ্টান মাত্রই মুক্তি পাইবে, অন্যেরা ভালো হইলেও মুক্তি পাইবে না, এই কথা আবার জানাইলেন মিস্ ষ্টর্ক। বারে বারে না জানাইলে এই অবাধ্য বক্রপ্রকৃতির মেয়েটা বশ মানিবে না।

মনোরমা প্রশ্ন করিল: সব খ্রীষ্টানই মুক্তি পাইবে?

নিশ্চয়ই।

যে স্পেনদেশীয় খ্রীষ্টানরা দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের আতিথ্য গ্রহণ করে শেষে সেই জাতির রাণী ও তার প্রজাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সেই সরল লোকদের ধ্বংস করেছিল, তারা স্বর্গলোকে প্রচুর পুরস্কার পাবে, আর বুঝি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করবে সেই সরল বিশ্বাসী আদিম অধিবাসীরা?

'আখ্যানমঞ্জরীতে' মনোরমা কাহিনীটি পড়িয়া চমকিত হয়। রাজীবের সঙ্গে এই বিষয়ে কথাও হইয়াছে—এমনি করিয়া আমেরিকার অধিবাসীদের এই শ্বেত জাতিরা নিশ্চিহ্ন করিয়াছে। পারিলে এই দেশেও করিত। ইহাই ইহাদের খ্রীষ্ট জীবনযাত্রা!

মিস্ ষ্টর্ক ক্ষিপ্ত হইলেন: স্পেনের মানুষেরা খ্রীষ্টান নয়, পেপিষ্ট। তাদের শাস্তি অনন্ত নরক।

একেবারে অনন্ত নরক?

হাঁ, অনন্ত নরক!

মনোরমা হাসিয়া ফেলিল: ও হরি! খ্রীষ্টে বিশ্বাস করলেও হবে

না। কাজ নেই আমাদের ওসবে। হিন্দু থাকলে বরং কর্মদোষ কেটে যাবে, একজন্মে না একজন্মে সবাই উদ্ধার পাব।

মিস্ ষ্টর্ক ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, তোমরা চিরদিন শাস্তি পাবে।

এবার মনোরমাও ছাড়িল না,—হাঁ, শাস্তি দেবার কর্তা আপনারা হলে তা'ই পেতাম—আমি কেন, ওই ছোট মেয়েটাও নিষ্কৃতি পেত না। কিন্তু বিচারের কর্তা স্রষ্টা। তিনি করুণাময়, শাস্তি দেবেন কাকে? তাঁর সৃষ্ট জীবকে! তিনি কি পাগল, না আপনাদের জেল-দারোগা?

উক্তি ও যুক্তি দুইই চিন্তাহরণের। কিন্তু উহার সঙ্গেকার ক্রুদ্ধ ব্যঙ্গ মনোরমার; তাহার বিরাগ ও বিরক্তি বহুদিনকার ও সুগভীর।

মিস্ ষ্টর্ক ক্ষেপিয়া গেলেন। ইংরেজিতে বলিলেন, জিহ্বা সংযত করো! তারপর বাঙলায় বলিলেন, চুপ করো।

মনোরমা মনের ক্ষোভ দমন করিয়া আত্মমর্যাদায় স্থির হইয়া বসিল।

মিস্ ষ্টর্ক যেন পারিলে তাহাকে অগ্নি দৃষ্টিতে দগ্ধ করেন। কি ইংরেজিতে নিজে নিজে বলিতেছিলেন। তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে, তিনি জিনিস পত্র গুছাইয়া লইলেন, খট্‌খট্ শব্দ করিয়া উঠিয়া চলিলেন। তারপর বাহিরের ঘর হইতে আবার খট্‌খট্ শব্দ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন: তোমার স্বামীকে একবার আমার কাছে পাঠিও। তিনি দেখা না করতে আর আমি আস্‌ছি না। বুঝলে?

মনোরমা ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, আচ্ছা।

চিন্তাহরণ বাড়ি ফিরিলে মনোরমা বলিল, আমি আর মিস্ ষ্টর্কের কাছে পড়ব না, তাঁকে বলে দিলাম।

চিন্তাহরণ একবার বলিল, বলে দিলে?—তিনি তাতে কি বল্‌লেন?

তোমাকে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

চিন্তাহরণ একটু নীরব থাকিয়া বলিল, ভালোই হয়েছে। আমিও ভাবছিলাম,—বলি 'তাকে দিয়ে কাজ নেই।' কিন্তু ভাবছি পড়াবে কে?

মনোরমা নিকটে আসিল, নতমস্তকে বলিল : তুমি।…তারপর অনুরোধের স্বরে বলিল, আমাকে অন্য কারও কাছে পড়তে বলো না।

চিন্তাহরণ সবিস্মিত ও সলজ্জ দৃষ্টিতে জানাইল, আমারও তা ইচ্ছা নয়।

মনোরমা এবার স্বামীর আরও নিকটে সরিয়া আসে, আপনার মুখখানি তাহার স্কন্ধের মধ্যে লুকাইতে লুকাইতে বলে : আমি তোমার কাছেই পড়ব।

চিন্তাহরণ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল : আমি আগেই তা স্থির করেছি।

৬

রাজীব হঠাৎ চিত্রিসায়ের পত্র পাইল—শৈলীর হস্তাক্ষর :

দাদা ভাই গো, আমাকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া নদীতে ফেলিয়া দাও! আমার বাঁচিবার পথ নাই। মেজদাদা আবার কথাবার্তা সব ঠিক করিয়াছেন। কুলকান্দির গঙ্গারাম বাঁড়ুজ্জেরা নাকি আমাদের পাল্টাঘর। মাও বলেন, তাঁহাদের ক্ষেতখোলা আছে, স্বচ্ছল অবস্থা। বাঁড়ুজ্জে মশায়ের বয়স নাকি পঞ্চাশের বেশী নয়। আগের পক্ষে আরও দুই স্ত্রী আছে, মেয়ের ঘরের দৌহিত্র আছে, কিন্তু কাহারও ছেলে নাই। মাও আমার সঙ্গে যাইবেন, সেখানেই বাস করিবেন, তাঁহারও আর ভাবনা থাকিবেনা। গোপনে গোপনে সব ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, আর তের দিন মাত্র বাকী। সব তাড়াতাড়ি চলিতেছে—পাছে আবার কোনো বাধা ঘটে। মা মত দিয়া বসিয়া আছেন। বাড়িতে আর কাহার সাধ্য আপত্তি করিবে?

আমি কি করিব, বুঝি না। তুমি সাহসের কথা বলো, কিন্তু তুমি নাই, ভুতি নাই, আমার একা সাহসে কি হইবে! মেয়ে মানুষ একা কি করিবে? একা শুধু সাহস করিয়া মরিতেই পারি। বিষ পাইলে বিষ খাইব, কিন্তু কে তাহা দিবে? একা নদীতে ঝাঁপ দিতে পারি—” শেষে, “দাদাভাই, তোমরা আমাকে হাতে-পায়ে বাঁধিয়া নদীতে ফেলিয়া দাও।”

কর্তব্য স্থির করিতে দেরী হইল না। শৈলীকে উদ্ধার করিতেই হইবে। চিন্তাহরণের এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। গিরীশও ছিল,—তাহার কলেজ সপ্তাহ দুই পরে খুলিবে,—সে তৎক্ষণাৎ বলিল : এই

তো আমাদের কাজ।—অবশ্য কি ভাবে উদ্ধার করিতে হইবে, কোন্ উম্যান্ হোম-এর এইখানে সহায়তা পাওয়া যাইবে সেই সব বিষয়ে পরামর্শ করা উচিত। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা উপায় বাৎলাইতে পারিবে।

মনোরমাকেও চিন্তাহরণ জিজ্ঞাসা করিতে গেল। রাজীব তাহাকে পত্র পড়িয়া শোনাইল। শুনিয়া মনোরমা বলিল, একবার নিয়ে আসতে পারলে তো আর কথা থাকে না—

রাজীব বলিল, তা বুঝি। কিন্তু নিয়ে আসব কোথায়, তাও তো ভাবতে হয়। গিরীশ অবশ্য পাদ্রী সাহেবদের মিশনে তুলবার কথা বলে, সেখানেই যাচ্ছে পরামর্শ করতে।

মনোরমা চমকিয়া উঠে, পাদ্রী সাহেবদের কাছে? ওই মেম সাহেব যেখানে কর্ত্রী!

রাজীব বলিল, না হলে কোথায় তুলব?

মনোরমা অবাক হইযা বলে, কেন? এ বাড়িতে কি হল?

রাজীব নিজের ইচ্ছা ও উৎসাহ চাপিয়া বলে, এখানে? সে কি সম্ভব? জায়গা কোথায়?

মনোরমা ক্ষুব্ধ স্বরে সতেজে বলিল, আমার জায়গা হতে পারল, আর তোমার বোনের জায়গা হতে পারবে না? সে ব্যবস্থা ত আমি করব, তোমাদের ভাবনা কেন?

রাজীব আবার বলিল, খোঁজ পেয়ে মেজদাদা এসে এখানে উৎপাত করবেন।

তোমরাই যদি সে ভয় কর, তবে ওই মেয়েটাকে সাহস দেখাবার কথা বলো তোমরা কোন মুখে?

রাজীব লজ্জিত হইলেও বলিল, ভয় নয়। মেজদাদার উৎপাতের কথা বলছি। মেজদাদা মানুষ নয়। তা ছাড়া, আইনের গোলমালও আছে ত; দেওয়ানী ফৌজদারীও হতে পারে।

হলেই বা ভয় কি? উকিল মোক্তারের পরামর্শ মত যা হয় করবে।

রাজীব উৎফুল্ল মুখে বলিল: বেশ, তবে তাই হবে।

চিন্তাহরণের মন গর্বে ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া যায়—এই ত সত্যধর্ম! মনোরমার তাহা স্বভাবগত!

গিরীশ আপত্তি করিতে পারিল না। সে মিশনে গিয়াছিল। কিন্তু মিস্ ষ্টর্কের ব্যাপারে চিন্তাহরণ ও রাজীব মিশনের লোকদের বিরাগ ভাজন হইয়াছে। সে ব্যাপারে গিরীশ তখন মনোরমার উপর চাটিয়াছিল, দাদারও অধোগতি হইতেছে, স্ত্রীর শিক্ষায় আগ্রহ নাই। এখন পাদ্রীদের সঙ্গে কথা বলিয়া বুঝিল সেই ব্যাপার না মিটিতে পাদ্রীরা গিরীশকেও এই বিষয়ে সাহায্য করিবে না। অবশ্য উদ্ধার করিয়া আনিলে মিশনের নিয়ম মত খ্রীষ্ট প্রথানুযায়ী যদি থাকিতে চায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মিশন তাহার দায়িত্বভাব গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাহার পূর্বে নিজেরা তাহারা তদন্ত করিয়া সুনিশ্চিত হইবেন। গিরীশ মনঃক্ষুণ্ণ হইল। ইহাও সে বুঝে, পাদ্রীদের আশ্রয়ে যাহারা যায় তাহাদের আর তাহারা হাত-ছাড়া করে না, বুঝাইয়া পড়াইয়া না পারিলে জোর করিয়াও খ্রীষ্টান করিবে। গিরীশ অবশ্য খ্রীষ্টের অনুরাগী; কারণ ইউরোপীয় সভ্যজীবনের প্রধান উৎস খ্রীষ্ট। কিন্তু খৃষ্টানরা সকলে একেশ্বরবাদী নয়। তাহাদের সঙ্গে গিরীশের মতবিরোধও আছে। তাই আনুষ্ঠানিক ভাবে খ্রীষ্টান হইবার প্রয়োজন গিরীশ কখনো মানে না। গিরীশ ব্রাহ্ম যুবক, রিফর্ম-প্রয়াসের এক যুবক অধিনায়ক। আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতির জলন্ত প্রেরণায় তাহারা উদ্বুদ্ধ। যতই খ্রীষ্টকে শ্রদ্ধা করুক, কেশবচন্দ্রের মত সে কোনোকালে বিশ্বাস করে না যীশু 'প্রেরিত পুরুষ'; যীশু আদর্শ পুরুষ, এই সে মানে। তাহা ছাড়া হিন্দু সমাজের নারীদের তাহারাই শিক্ষায় দীক্ষায়, আচরণে-ব্যবহারে মুক্ত, উন্নত করিবে। শৈলীর

সম্বন্ধেও দায়িত্ব গ্রহণ করিবে তাহারাই। অবশ্য মনোরমা যে এতদূর উদার হইবে, ইহা গিরীশ ভাবে নাই। সে যখন সম্মত, তখন শৈলীকে তাহারা এই গৃহেই আনিয়া তুলিবে। আইনের বাধা কিছু আছে কিনা, তাহা বরং এখন তাহারা উকিল, মুন্সেফও হাকিমবাবুদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া জানিবে। তাহাদের বন্ধু মহেশ দত্তের পিতা হরকান্ত দত্ত এখন সিনিয়ার ডেপুটি। সত্যইত প্রয়োজন হইলে ত হরকান্ত দত্তের গৃহেও তাহারা শৈলীর ব্যবস্থা করিতে পারে। তিনি সবল চিত্ত বিচক্ষণ লোক, ব্যক্তিত্ববান্ পুরুষ; তাঁহাকে পুলিশেও ভয় করে।

কিন্তু হরকান্ত দত্ত তেজীয়ান হইলেও সত্যই বিচক্ষণ রাজকর্মচারী। ব্রাহ্ম যুবকদের রিফর্মে উদ্যোগ দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন; সুপরামর্শ দিলেন—আইনের তর্ক উঠিবে—সেই মেয়ে সাবালিকা কিনা, ইহাই হইবে আইনের প্রশ্ন। বয়স আঠারর বেশি প্রমাণিত হওয়া চাই। আচ্ছা, সে বিষয়ে তিনি যাহা করিবার করিবেন। আইনের ক্ষেত্রে তাহাদের পরাজয় ঘটিবে না—তিনি হরকান্ত দত্ত আছেন, দেখিবেন। তবে সরকারী চাকুরে হিসাবে প্রকাশ্যে তিনি এই ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িতে পারেন না। চিন্তাহরণ যখন সপরিবার এখানে বাস করে মহিলাটিকে সেখানেই তুলিতে বাধা নাই? কিন্তু ইহাও পরের কথা। প্রথমত তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। এদিকে যে সময় যায়—অত পরামর্শ করিয়া কি হইবে? বরং সেই চৌধুরী বাড়ি হইতে কি করিয়া মহিলাটিকে উদ্ধার করিবে তাহাই প্রথম তাহারা স্থির করুক্। চাই সাহস, বিশ্বাস, এবং এই অবস্থায় কৌশলও। কি করিয়া রাজীব উদ্ধার করিবে তাহার ভগ্নীকে ভাবিয়াছে কিছু? কালক্ষেপ করিতেছে কি জন্য?

কাগজের টুকরাটা উনুনে জ্বলিয়া উঠিল।

মহেশ্বরী কুমড়ার ডগা বাছিয়া লইতেছিলেন, ছোট ছেলে জ্ঞানু বারান্দার অন্যপ্রান্তে কৈ মাছগুলি দেখিতেছে। সে হাততালি দিয়া বলিল : বাঃ বাঃ, চিঠি পুড়ে গেল ! চোখ তুলিয়া মহেশ্বরী বলিলেন, ও শৈলী, কি কাগজ পুড়ছে, দেখছিস না ?—কি চিঠি ?

শৈলী মুখ না ফিরাইয়াই বলিল, চিঠি নয়, মামী মা। ভুতিদের পুরানো লেখার কাগজ—মশলা রেখেছিলাম তাতে।

চিঠি নয় ?—সন্দেহ দূর না হইলেও মহেশ্বরী আর প্রশ্ন করিলেন না। শৈলীও তাড়াতাড়ি মাছ কুটিতে রন্ধনশালার পিছনকার বারান্দায় চলিয়া গেল। কৈ মাছ কয়টা বারান্দায় রহিয়াছে, দাসেদের কালাচাঁদ তাহা সেখানে রাখিয়া গিয়াছে :—বাবুরা ত আর কালাচাঁদদের খোঁজ করে না। সেদিন গিয়াছে ছোটকর্তার সহিত,—তারপর রাজু ছিল, সেও এখন শহরের মানুষ। তবু কালাচাঁদ শুনিয়াছে—জ্ঞানুর নাকি অসুখ; তাই মাছ কয়টা ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে।

লন্ গো, শৈলী দিদি।

ন্যাকড়ায় জড়ানো মাছের পুঁটলিটা কালাচাঁদ মাঝি বারান্দায় রাখিল। শৈলী হাতে লইয়া খুলিয়া দেখিল তাজা কৈ মাছ লাফাইতেছে।

মহেশ্বরী সানন্দে বলিলেন : বস্, কালাচাঁদ। কোথায় ধরলি ?

কালাচাঁদ উত্তর দিতে দিতে বলিল : কেমন গো দিদি, পাইলেন ত ?

শৈলী উত্তর করিল, হুঁ।

কালাচাঁদ আর বসিবার সময় করিতে চাহিল না। বাবুদের তামাক প্রসাদ লইতে বহির্বাটিতে চলিয়া গেল।

বেলা গড়াইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। ছেলেদের আহার চুকিয়া গেল। বয়স্কদের আহার শেষ হইল। গৃহিণীরাও আহার করিলেন। উচ্ছিষ্ট বাসন-পত্র তাহারা গুছাইয়া রাখিলেন, গোবর জলের ন্যাতা দিয়া ঘর দুয়ার মুছিয়া ফেলিয়া শৈলী নিত্যকারের

মত গৃহকর্ম হইতে মুক্তি লাভ করিল। মাটিতে মায়ের কাঁথার উপরে তাহার শয্যা-পার্শ্বে শুইয়া পড়িল। একটু একটু করিয়া মায়ের কোল ঘেঁষিয়া আসিল। অর্ধ-জাগ্রত স্বরে মা কহিলেন : কি লো?

শৈলী জানাইল, শীত শীত করছে।

শীত? শীত কোথায়?

শীত নয়। বর্ষাকাল, ভেজা মাটি, কাঁথাও তাই ভিজিয়া উঠিতে চায়। শৈলী আরও কাছে আগাইয়া আসে। মা গায়ে হাত দিয়া বলেন : না, গা' ত গরম নয়।—ভালোয় ভালোয় থাক্ এই ছয়টা দিন। ঘুমিয়ে পড়।

হুঁ।—শৈলী দূরে সরিয়া যায়।

মা আবার নিদ্রামগ্ন হইলেন। মাত্র আর ছয় দিন—শৈলী ঘুমাইতে পারিল না। প্রথম প্রহরের শেষে কোড়াল পাখী কখন ডাকিবে? সে কি ডাকিয়া গিয়াছে? না, রাত্রি তত হয় নাই। সবে সবাই শয্যাগ্রহণ করিয়াছে। শঙ্কর দীঘির ওপারের কামার বাড়ির হাতুড়ীর শব্দ শোনা যায়। দূরে দাস কাপালিদের পাড়ার কীর্তনের ক্ষীণ ধ্বনিও কানে আসিতেছে। শুধু টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছিল বলিয়া, না হইলে অনন্ত চৌধুরী হয়ত এখনো এই কীর্তনেই থাকিতেন, এতক্ষণে এই বাড়ির খাওয়া-দাওয়াও নিঃশেষ হইত না। সন্ধ্যায় এখন অবশ্য বৃষ্টি থামিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষ, অন্ধকার, জলকাদাও সর্বত্র।

'ভালোয় ভালোয় থাক্ এই ছয়টা দিন,'—ইহাই মায়ের কামনা শৈলীর জন্য। শৈলীর হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়। মুখ চোখে জ্বালা ফুটিতে থাকে, শয্যায়ও যেন সেই জ্বালা। শৈলী পাশ ফিরিয়া মায়ের নিকট হইতে দূরে সরিয়া আসে। অন্ধকারে তাকাইয়া থাকে।

উদ্ধার তাহাকে পাইতেই হইবে, যে করিয়াই হউক সে আত্মরক্ষা করিবে। জীবন-ব্যাপী যন্ত্রণার এই নির্মম চক্রান্ত হইতে আত্মরক্ষা

করিবার অন্য পথ না থাকিলে শৈলী আত্মহত্যাই করিবে, তথাপি সে এই অন্যায় ও এই লাঞ্ছনার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিবে না। 'সাহস চাই, সাহস চাই'—রাজীব বলিয়াছিল বিভূতিকে। শৈলীর কি সাহস নাই? নিশ্চয়ই আছে। সাহস করিয়া হয় সে বাঁচিবে, না হয় মরিবে। কোন সুখ পাইয়াছে সে জীবনে যে সে মরিতে ভয় পাইবে? কি সান্ত্বনা পাইয়াছে নিজের জীবনে তাহার মা—যিনি মিথ্যা আশা ও অসহায়তার বশে আজ শৈলীকেও এমন ভাবে ভাসাইয়া দিতে চান? এই চৌধুরী গৃহে কোন আদর পাইয়াছেন মা, পাইয়াছে শৈলী একদিনের জন্য?—গৃহকর্মে শৈলী অসাধ্য সাধন করে। এই বাড়ির সমস্ত ঘর দুয়ার ধোয়া, বাসন-মাজা, ঘাট হইতে বড বড কলসী জল ভরিয়া পাড বাহিয়া ওঠা,—সমস্ত পরিশ্রম ও কঠিন কাজ তাহার ও তাহার মায়ের উপর। এই কঠিন শক্তি-সাধ্য কাজ পুরুষও করিতে পারিত না, কিন্তু পারিতে হয় শৈলীর—সে যে গলগ্রহ চৌধুরীদের। দাসদাসীও ইহার অপেক্ষা বেশি কাজ করে না। তাহাদেরও এত অপমান, এত লাঞ্ছনা সহিতে হয় না? শুনিতে হয় না—তাহারা গলগ্রহ। কুলীন কন্যা বলিয়া মামাদের সে দায়। দাসদাসী তিরস্কৃত হয়, হয়ত প্রহৃত হয়—শৈলীই কি তাহা হয় না? সেদিনও তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া আনিয়া মেজকর্ত্রী ঘরের থামের সঙ্গে তাহার কপাল ঠুকিয়া ঠুকিয়া কপাল ফুলাইয়া দিল। এই বাড়িতে টু শব্দটি করিবার মত সাহস হইল না কাহারও—ছোট মামী মহেশ্বরীও নয়, মেজ কর্ত্রীর ভয়ে তিনিও এখন কথা বলেন না। অথচ, শুধু পরিশ্রমে নয়, কর্মনৈপুণ্যে কে আছে পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে শৈলীর সমকক্ষ? কাহারও বাড়িতে সামান্য আয়োজনটি হইতে শৈলীকে চাই—মহেশ্বরীর সঙ্গে—শৈলী রাঁধে ভালো, শৈলী কোটে ভালো, শৈলীর পসন্দ ভালো। সে কাঁথা সেলাই করিতে জানে ভালো, সে চিঁড়া কাটিতে পারে

সরু করিয়া, সে চুল বাঁধিয়া দিতে পারে চমৎকার; কুটিতে পারে চমৎকার, বাটিতে পারে চমৎকার। এমন কি, চিঠি লিখিতে হইলেও তাহার ডাক পড়ে—রাজীবেরা তাহাকে লিখিতে-পড়িতে শিখাইয়াছে। অথচ রাজীব বই পাঠাইলে সে বই পোড়াইয়া ফেলিত রাঘব চৌধুরী। অবশ্য 'অবলা বান্ধব', 'নারীশক্তি' তাহার নিকট আর পৌঁছায় নাই। রাঘব চৌধুরীর অপেক্ষা লেখাপড়া শৈলী বেশি জানে—তাই শৈলীর পড়াশুনায় তাহার এত ক্রোধ। 'লেখাপড়া শিখিলে মেয়েমানুষ বেশ্যা হয়। বাঙ্গাবেব মেয়ে মানুষ হইতে চায় শৈলী—তাই বই খুঁজিয়া আনে, বই পড়ে।' ··

শৈলীর সমস্ত আত্মা জ্বলিয়া উঠে—না, কিছুতেই না, তোমাদের এই গঞ্জনা, এই অপমান শৈলী সহ্য করিবে না। তোমাদের অপেক্ষা শৈলীর বুদ্ধি বেশি, তোমাদের অপেক্ষা তাহার কর্মদক্ষতা বেশি। তোমাদের অপেক্ষা তাহার বিদ্যা বেশি, তোমাদের অপেক্ষা তাহার রূপ বেশি;—তাই ত তোমাদের এত অত্যাচার তাহার উপর। শৈলী মরিবে তবু তোমাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে না; শৈলী যে করিয়া হউক তোমাদের কবল হইতে বাঁচিবে। 'সাহস চাই', 'সাহস চাই',—শৈলীর সাহস আছে,—আছে, আছে. আছে,···

হঠাৎ চমকিয়া উঠিল শৈলী। কান পাতিয়া শোনে—কোড়াল পাখী ডাকিল না? হাঁ, ডাকিল। কোড়ালে ডাকিল। আরও কান পাতিয়া শুনিল—দাসপাড়ায় কীর্তনের খোলও আর শোনা যায় না। গভীর রাত্রিতে কামারদের হাতুড়ির শব্দ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহা কি থামিবে না? কখন থামিবে? কখন?

রাত্রি দেড় প্রহরও নয়। পিছনকার ঝোপ-ঝাড় পার হইয়া আম-বাগানের পথে পড়িতেই কে আগাইয়া আসিল। শৈলী থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—কে? কে?

এসেছিস্!—ফিস ফিস করিয়া বলিল রাজীবই। সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর, আগ্রহে উত্তেজনায় তাহাও কাঁপিতেছে। খালি গা, খালি পা, কাপড় কোমরে জড়াইয়া বাঁধা। হাতে মোটা একগাছা লাঠি।

কিন্তু শৈলী উত্তর দিতে পারে না, অগ্রসর হইতেও আর পারে না। অন্ধকারে রাজীবকে দেখিয়াই সে ভয়ে ত্রাসে বিবশ হইয়া যায়। অন্য কেহ নয়—রাজীব, দাদাভাই,—তথাপি কোথায় সাহস? তাহার সাহস কোথায়? শৈলী যে পারে না, আর পারে না।

চল্। —রাজীব নিম্নস্বরে বলে।

শৈলী তেমনি দাঁড়াইয়া থাকে। পা উঠিতেছে না। উঠাইতে সে পারে না।

চল—দাঁড়িয়ে রইলি যে এখনো?

না। শৈলী পা তুলিতে পারিবে না, সে পা তুলিবে না। যাইবার সাধ্য তাহার নাই।

না!—ভগ্নকণ্ঠে শৈলী প্রথম কথা বলিতে পারিল,—না।

রাজীব চৌধুরী সবিস্ময়ে আবৃত্তি করিল 'না!' না কি?

আমি পারব না, দাদাভাই, পারব না।—ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল শৈলী।

রাজীব একবারের মত বিভ্রান্ত, বিমূঢ় হইয়া যায়। বলে: সে কি! সব ঠিক করলাম তোর কথায়। এখন তুই বলিস 'পারব না।'

আমাকে মাপ করো।—আমাকে নদীর জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলো তোমরা—

এক মুহূর্তে রাজীবের সহজ দৃঢ়তা ও স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা জাগ্রত হইয়া উঠিল।

না। সাহস কর,—তোকে বাঁচতে হবে; তোর সাহস কোথায় গেল?—দৃঢ় মুষ্টিতে রাজীব শৈলীর হাত ধরিয়া ঝাঁকুনি দিল।

নেই। আমার সাহস নেই। কেউ নেই, কিছু নেই।—থর থর করিয়া মুষ্টির মধ্যে শৈলীর হাত কাঁপিতেছে। কাঁপিতেছে সর্বদেহ, এখনি সে ভাঙিয়া পড়িবে।

না, সাহস আছে, থাকতেই হবে। আর, কেউ না থাক, আমি আছি। চল্—দৃঢ়াকর্ষণে রাজীব হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল শৈলীকে।

ভাঙিয়া পড়িতে পড়িতে শৈলী আপনাকে সামলাইতে লাগিল। চলিবার সাধ্য নাই, রাজীবের আকর্ষণে তাহার পায়ের পিছনে পা ফেলিতেছে মাত্র;—নিজের ইচ্ছায় নহে, চলিতেছে হস্তাকর্ষণে। মুখে অস্ফুট ক্রন্দন, বুকে সঞ্চিত অনির্দেশ্য ভয় আশঙ্কা, এবং সেই সঙ্গেই 'আর ছয় দিন' পরেকার কঠোর সুনিশ্চিত বিভীষিকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের গভীর চেতনা। একই কালে পা যেন কিসে বাঁধিতেছে, শৈলী তাহা ছাড়াইতে পারিবে না;—কিন্তু পা ফেলিতেছেও শৈলী—হয়ত রাজীবের দ্বিধাহীন প্রবল আকর্ষণেই ফেলিতেছে;—কিন্তু তবু ফেলিতেছে, ফেলিতেই হইবে, সে বাঁচিতে চায়।

বাগানের শেষে ছোট খাল। বর্ষায় অথৈ জল। রাজীব হাতের লাঠি এবার ছুঁড়িয়া ওপারের দিকে ফেলিয়া দিল। নিম্নস্বরে, কিন্তু সহজ স্বাভাবিক মানুষের সবল কণ্ঠে, বলিল: শাড়ী ভাল করে কোমরে জড়িয়ে নে। সাঁতরে পার হতে হবে—খালে নামবি; আমার পিছনে পিছনে আয়,—নইলে বেত কাঁটায় পড়বি।

শৈলী কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতেই মন্ত্রচালিতের মত শৈলী কাপড় কোমরে জড়াইয়া পরিল। আর পরিতে পরিতে সাঁতার কাটিবার মত আপনার বুদ্ধি ও তৎপরতাও সঞ্চয় করিল।

রাজীবের পিছনে পিছনে শৈলী খালে নামিল। সাবধান হইতে হয়, এদিকে-সেদিকে বেত কাঁটা। শীতকালীন পথের একটা রেখা তবু

আছে। শৈলী নামিয়া যায়। পা জলস্পর্শ করিল, জলে হাঁটু ডুবিয়া গেল, কোমর ছুঁইল। চোখে এবার জল নাই—সাঁতার না কাটিলে ডুবিয়া যাইবে। শৈলী সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিল—রাজীবের পার্শ্বে, রাজীবের মত, সাবধানে, সন্তর্পণে, জলে কিছুমাত্র সাড়া না জাগাইয়া—সর্ব চৈতন্য তাহার সেই বিষয়ে সতর্ক।

ভাবিবার অবসর কাহারও নাই—শৈলী অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী, আর রাজীব দ্বাবিংশ বা ত্রয়োবিংশ বৎসরের যুবক। সংসারের আর কিছু এখন নাই। যৌবন নাই, নর-নারীর প্রচ্ছন্ন ভেদবোধও তাহাদের চৈতন্যে নাই। আছে উপস্থিত বিপদ, আছে দুর্জয় প্রতিজ্ঞা।

খাল পার হইয়া সিক্ত-বসনে রাজীবের হাত ধরিয়া পাড়ে উঠিল শৈলী—মনে হইল বাঁচিল, যেন এইবার মুক্তি। একবার বিশ্রাম করিতে চায় শৈলী—রাজীবের স্কন্ধে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আন্দোলিত দেহভার রাখিয়া।

রাজীব বলিল: শীঘ্র ছুটে আয় পিছনে পিছনে, নদীর ঘাটে নৌকো, এখুনি ছাড়তে হবে।

প্রায় দৌড়িয়া চলিল রাজীব, পিছনে ছুটিতে লাগিল শৈলী।—পারে না, উত্তেজনায়, পরিশ্রমে সে হাঁপাইতেছে, কিন্তু তবু ছুটিতেছে।

নৌকা দেখা যায় মাঠের ঘাটে।

গোরাই ঢালী সহর্ষে বলিল: এই যে! আইলা চৌধুরী?

কালাচাঁদ সহাস্যে বলিল: অই তো শৈলী দিদি আইসা গেছেন। কইছি না ছোট চৌধরীরে,—মাছ দিতে গিয়া চিঠি আমি তানার হাতেই দিছি। চৌধুরীর তবু ভয়—বুঝি তান চিঠি পাইলান না।

ভয়টা যেন নিতান্তই অমূলক—সে কালাচাঁদ যখন ভার লইয়াছে।

নৌকায় ছই-এর ভিতর হইতে কে বাহির হইয়া আসিল। দেখিয়া শৈলী ভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইল।

রাজীব বলিল, গিরীশ—

এই দুঃসাধ্য কাজের ভার একা রাজীবের উপর দিয়া গিরীশ নিশ্চিন্ত থাকে নাই। সে নিজেও আসিয়াছে রাজীবের সঙ্গে। কারণ আছে; নিজেকে কেমন ভীরু মনে হইত না হইলে। আর, রাজীব একটু উগ্র-স্বভাব, অর্থাৎ গোঁয়ার'; সেবার সেই ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে একা মারামারি বাধাইয়া দিল। এইসব কঠিন কাজে মাথা ঠাণ্ডা রাখা চাই। রাজীবকে তাই একা ছাড়িয়া দেওয়া যায় না।

গিরীশ বলিল: সব ঠিক মত হ্যেছে ত, রাজীব?

এখন পর্যন্ত।—রাজীব জানায়।

শৈলী নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছে। অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে পড়িয়া আবার যেন সে নিশ্চল, ভয়ে আশঙ্কায় আবার দ্বিধা গ্রস্ত। শৈলীর দিকে তাকাইয়া রাজীব বলে:

চিনলি না,—গিরীশ গাঙ্গুলী? মনে পড়ে না?

গিরীশ গাঙ্গুলী! সেই গিরীশদাদাও চিন্তাহরণদাদা দশ বার বৎসর পূর্বে যাহারা এই নদীতেই শৈলীকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইত। দেখিতে না পাইলেও শৈলী বুঝিতেছে যে, সম্মুখেই সবল সমুন্নত দেহ সেই যুবক—যাহার বিদ্যা, নাম ও নিন্দা শুনিয়াছে তাহারা এই বাড়িতে কত উপলক্ষে—সেই গিরীশ।

মাথা নাড়িয়া শৈলী জানায়, পড়ে—পড়ে।

সেই গিরীশ—পীতাম্বর গাঙ্গুলীর পুত্র। দেশ-জোড়া যাহার নাম, এই প্রায় অন্ধকার রাত্রিতেও বুঝা যায় সে তেজীয়ান্ পুরুষ।

দৌড়িতে গিয়া সিক্তবস্ত্র শৈলীর দেহে জড়াইয়া গিয়াছে। হউক রাত্রি, মেঘ-ম্লান জোৎস্না—কিন্তু শৈলী যেন এইবার বুঝিল সিক্ত-বসনে সে দাঁড়াইয়া অপরের সম্মুখে—আর, সে নিজেও নব যৌবনা, বালিকা নয়।

ভেতরে যা—এখুনি নৌকা ছাড়বে—কাপড় ভেতরে ছেড়ে নিবি।—রাজীব ঠেলিয়া দিল শৈলীকে নৌকার মধ্যে। গিরীশ রাজীব

গলুইতে গিয়া বসে। সিক্ত-বসনা এই প্রস্ফুটিত যৌবনা মহিলা নিঃসঙ্কোচ হউক।

নির্দেশমত শৈলী পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিতে যায়। চমকিয়া উঠে—সে কি! ধুতি, জামা, চাদর! পুরুষের বেশ যে!

রাজীব বাহির হইতে বলে: না হলে ধরা পড়বি।

চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে শৈলী। না, না, সে হয় না। কি নির্লজ্জতার কথা। আবার ভাবে—রাজীব জানাইল,—এমন বয়সের মেয়ে লইয়া দুইজন যুবককে যাইতে দেখিলে লোকে সন্দেহ করিবে, তাহাদিগের পথেই ধরিয়া ফেলিবে। অনেক দ্বিধায় শৈল ধুতি জামা তুলিযা লয়। লম্বা ঢোলা জামা পরিয়া বসে, হাতের রূপার চুড়ি, নাকের ও কানের সোনা খুলিয়া ফেলে। রাজীব আসিয়া চুল পাগড়িতে জড়াইয়া বাঁধিয়া দেয়। এইবার কিশোর বালক সে—দাদাদের সঙ্গে কুটুম্ব গৃহে চলিয়াছে। চোখে জল আসিলে চলিবে না।

গোরা হালে বসিয়াছে, রাজীব ও কালাচাঁদ দাঁড তুলিয়া লইয়াছে। ইলশামারির হাটে গিয়া, নৌকা ধরিতে হইবে। সেখানে ভিন্ন ব্যবস্থা আছে,—রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে ঢাকাই মাঝিদের নৌকা খুলিবে পদ্মায়। এই পথখানি—চিত্রিসারের এই মাঠের ঘাট হইতে ইলশামারির ঘাট—ইহা আর কাহারও সহিত বন্দোবস্ত করা চলিত না; গোরার নৌকা, গোরা ও কালাচাঁদ ভিন্ন অন্য কাহাকেও রাজীব বিশ্বাস করিতে পারে না। তাহারা আবাল্য রাজীবের খেলার সাকরেদ, লাঠি খেলায় বাইচ খেলায় সহযোগী। আর গোরা ছাড়া, কালাচাঁদ ছাড়া এই গ্রামে রাঘবের বিরুদ্ধে এত বড় দুঃসাহস আর কে করিবে—রাজীবের কথায়? —চৌধুরী বাড়ি হইতে মেয়ে চুরি করিতে সাহস করিবে? রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই গোরা আবার নিজ নৌকা লইয়া গুণ টানিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিবে,—মরিয়া গেলেও বলিবেনা কিছু। কেহ জানিবে না,

কোথায় গেল শৈলী, কিম্বা রাজীব আসিয়াছিল গাঁয়ে,—এই গ্রামেই এই চালী পাড়ায় গোরাদের গৃহে রাজীব ও তাহার বন্ধু আজ সমস্ত দিন ছিল আত্মগোপন করিয়া।

শেষ রাত্রিতে যখন রাঘব চৌধুরী নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া গর্জন করিতেছে তখন নৌকা পদ্মায় পাল তুলিয়া দিয়াছে—ক্লান্ত অবসন্ন শৈলী নৌকায় পাটাতনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—উষার প্রথম রেখা তাহার মুখখানিকে ছুঁইবার অপেক্ষায় গলুই এর দিকে বসা গিরীশের রাজীবের পিছনে পূর্বাকাশে অপেক্ষা করিতেছে।

অবশেষে রাজীবের সানন্দ ডাক শোনা গেল, 'চিন্তাদা'।

'রাজীব'! উদ্বিগ্ন অপেক্ষমাণ চিন্তাহরণ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। মনোরমাও পশ্চাতে পশ্চাতে আগাইয়া আসিল। গাড়ী হইতে সঙ্কুচিত পদে নামিতেছে একটি সুশ্রী যুবক। রাজীব বলিতেছে, প্রণাম করলি না? চিনতে পারলে চিন্তাহরণদাদা? —শৈলী!

মাগো! সত্যসত্যই পুরুষের পোষাক পরিয়া আসিয়াছে শৈলী। লজ্জা হইল না! এই শৈলী তাহার শ্বাশুড়ী হইবার কথা ছিল; মনোরমা এই মুহূর্তে তাহা ভাবিতেও যেন পারে না,—পুরুষ-বেশে নিতান্তই বালক দেখায় ইহাকে। সংকুচিতা শৈলী প্রণাম করিতেছিল। শৈলী যে এই গৃহে বিশেষ জড়সড় হইয়া পড়িবে তাহা মনোরমা বুঝিতে পারিয়াছে।

শত জন্মের কুণ্ঠা যেন শৈলীকে চাপিয়া ধরিতেছে।

মনোরমা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে—সহজ আলাপে আদরে শৈলীর দ্বিধা, আড়ষ্টতা দূর করিতে হইবে। সরসকণ্ঠে বলিল— চিন্‌বার আর পথ কোথায়। আমি ত কে না-কে ভেবেই ভিতরে পালাচ্ছিলাম।

শৈলী আরও লজ্জা পায়, চোখ আর তুলিতে পারে না—আপনার গায়ের চাদরখানি অবগুণ্ঠনাকারে টানিয়া সে মাথা আবৃত করিল। মনোরমা বুঝিয়া হাসিয়া বলিল, সে কি! যত লজ্জা আমাকে—আমি মেয়েমানুষ বলে বুঝি? এতক্ষণ যে সুভদ্রার মত নিজেই আসছিলে রথ হাঁকিয়ে! যত ঘোমটা ঘরে এসে বুঝি।

উপমাটা মনোরমার মুখে সহজ ভাবে জোগাইল। চিন্তাহরণ মনোরমাকে উল্লেখ করিয়াই অর্জ্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার যদুকুল-ত্যাগের

কথা বলিত—এইরূপই ছিল একদিন আর্যনারীর সাহস, তাহাদের স্বাধীনতাবোধ। আবার সেই দিন আসিতেছে।

গিরীশ সরস কণ্ঠে বলিল, উপমাটা কিন্তু খাটল না, বউঠান। ইনি ত ভয়ে জড়সড়, সুভদ্রার মত রথ হাঁকাবেন কি?

মনোরমা একটু বিস্মিত হইল। রামায়ণ মহাভারতের উপমা লইয়া রসিকতা সে গিরীশের নিকট প্রত্যাশা করে নাই। আর গিরীশের কণ্ঠে ইতিপূর্বে এইরূপে সরসতারও সে বিশেষ সন্ধান পায় নাই। সে তাই একটু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল—কি হইল গিরীশ ঠাকুরপোর? মানুষটা রাজীবের সঙ্গে কাজে জুটিয়া বদলাইতে আরম্ভ করিল নাকি? মনোরমার প্রতিও সে প্রসন্ন হইতেছে মনে হয়।

মনোরমা গিরীশকে বলিল, খাটছে না আজ। কালই খাটবে, দেখবেন। বলিয়া মনোরমা আবৃত্তি করিল:

"এই বঙ্গভূমে করেছিল লীলা
আত্রেয়ী জানকী দ্রৌপদী সুশীলা
খনা লীলাবতী, প্রাচীন মহিলা,
সাবিত্রী, ভারত পবিত্র করে।"

দেরীই বা কই?—ভাইদের সঙ্গে বোনরাও গিয়ে পর্দার বাইরে উপাসনায় বসবে।

এসো ঠাকুরঝি। মনোরমা শৈলকে টানিয়া লইয়া গৃহ মধ্যে চলিল—এবার ছাড়ো ওসব—আমার শাড়ী আছে।

শৈল বাঁচিল।

চিন্তাহরণ আশ্বস্ত হইল—শৈলকে পাইয়া মনোরমাও বাঁচিবে। এই গৃহে সে একা একটিমাত্র নারী। শহরের এই কোটরে কিছু না বলিলেও তাহার পল্লীশ্রীতে পুষ্টদেহমন ক্লান্ত হইতেছিল। নন্দীগ্রামে বহু

পরিজনাবৃত বাড়িতে সে অভ্যস্তা। সেই ক্ষুধার্ত মন রাধুর মত বালক বালিকাদেরও তাই পাইলে আনন্দিত হয়।

চিন্তাহরণ জানে—মনোরমার সহিত প্রতিবেশিনীদের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে নাই। সে পক্ষে বাধা অনেক। প্রতিবেশীরা ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক, পুরুষানুক্রমে এই শহরে বাস করে, এবং আবহমানকালের জীর্ণ সংস্কার ও ধ্যান-ধারণা লইয়াই সন্তুষ্ট। 'খ্রীষ্টান বাড়ির বউএর' সঙ্গে কথা বলিতে তাহাদের মেয়েদেরও কুণ্ঠা ও ভয়।

মনোরমা কাহাকেও তাই বান্ধবীরূপে পায় নাই। চিন্তাহরণের ও রাজীবের সঙ্গ ও সর্বসময়ে তাহার পাইবার উপায় নাই। তাহাদের স্কুল আছে, সমাজের বহু কাজ আছে, সংবাদ পত্র আছে; ছাত্ররা আসে, যুবকেরা আসে, সাহিত্যেরও উৎসাহ তাহারই দিতে হয়। মনোরমা তাই গৃহে অনেক সময়েই নিঃসঙ্গ।

চিন্তাহরণ দেখিল—প্রথম দৃষ্টিতেই মনোরমা শৈলীকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে।—হেমচন্দ্রের কবিতা পর্যন্ত অবৃত্তি করিয়া ফেলিল।

কিন্তু রাজীবেরা নিশ্চিন্ত হইবার অবকাশ পাইল না। বিজয়-গর্বে গিরীশ ও রাজীব হরকান্তবাবুর নিকটে গিয়াছিল,—তাহারা ব্রাহ্মোপসনার আয়োজন করিতেছে, তিনি যেন সন্ধ্যায় আসেন। হরকান্ত দত্ত মর্যাদা-সচেতন পুরুষ; এই যুবকদের তিনি মুরুব্বিও। কিন্তু নিজগৃহে না হইলে সমাজে বা অন্য গৃহে তিনি উপাসনায় যান না—পুত্র মহেশ সেখানে যাইবে। দায়িত্বশীল রাজপুরুষরূপে সকলের নিকট হইতে একটা দূরত্ব রক্ষা করাও তাঁহার নিয়ম। গিরীশ তাহা স্বীকার করিল; কিন্তু তাহাদের এত বড় কৃতিত্বটা কি হরকান্তদত্তের মত ব্রাহ্মনেতার পক্ষে ব্যতিক্রম করিবার মত একটা বিশেষ উপলক্ষ নয়?

হরকান্ত দত্ত বলিলেন, কৃতিত্ব এখনো কোথায়? আগে সামলিয়ে নাও। এখনো অনেক বাকী। 'হিন্দু হিতৈষীরা' চুপ করে থাকবে না কি মনে করেছ?

পুত্র মহেশ নিকটে বসিয়াছিল, বিজ্ঞ-ভাবে বলিল, তারা খবর পেয়েছে, আমি জানি।

কি করছে তারা?—রাজীব সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে।

হরকান্ত দত্ত বলেন, আমি জানি, কিন্তু বলব না। আমি সরকারী কর্মচারী। কি করছে, সে সংবাদ তোমাদেরই রাখা উচিত। —তারপর অভিভাবকের মত বুঝাইয়া বলেন, হাঁ, ব্রাহ্ম-সংস্কারক রূপে আমার যা কর্তব্য তা করতেই হবে। সে আমি দেখব। কিন্তু এখন আমার এখানে তোমাদের এখানে বেশি যাওয়া আসা বিধেয় নয়। একটা নারী-হরণের মামলা হতে পারে।

রাজীব ও গিরীশ চমকিত হইয়া বলিল, নারী-হরণ! হরণ কি করে? শৈলীকে ত আমরা জোর করে নিয়ে আনিনি।

ঠিক, কিন্তু আইনের চক্ষে তবু তা হরণ। তাই বলেছি—সাবধানে চলা ফেরা করো। তোমাদের শত্রুপক্ষ কি করে, সে বিষয়ে চোখ রেখো। আমাকে যা খবর দিতে চাও মহেশ রয়েছে, তাকে দিয়ে জানিও। সে তোমাদের সহযোগী, প্রয়োজন মত সাহায্য করবে।

সন্ধ্যার উপাসনায় মহেশ দত্ত একটু আগেই আসিল, এবং উপাসনার পূর্বেই সে সংবাদ দিল—ওদের লোকজন শহরে এসেছে। বাবা সংবাদ পেয়েছেন। তোমরা সাবধান থেকো।

রাজীব বলিল, কে এসেছে?

তোমাদের গ্রামের লোকজন। তারা খোঁজ-খবর করছে—এ বাড়ির উপরও সন্দেহ করেছে।

একটা চাপা উত্তেজনার মধ্যে উপাসনা আরম্ভ হইল। বাতাসে যেন

আশঙ্কার আভাস। সঙ্গে সঙ্গে চাপা কথায়, সতর্ক দৃষ্টিতে, উদ্দীপ্ত মুখে-চোখে সংগ্রামের সূচনাও দেখা গেল—ব্রাহ্মসমাজ আর একটি বীরত্বের কর্মে আগুয়ান হইয়াছে। উপাসনাও তেমনি ভাবে চলিল—অতি গম্ভীর, রুদ্ধ উত্তেজনায় স্বস্তিহীন, অনিশ্চিতের আগ্রহে আবিষ্ট। হাঁ, একটা পরীক্ষার সম্মুখে আজ তাহারা। ইহাই ত তাহাদেরও কামনা, বিধাতা তাহাদের বাজাইয়া লউন! —রামজীবনও বিধাতাকেই যেন চ্যালেঞ্জ করিতেছেন।

উপাসনা শেষে মহেশ দত্ত চিন্তাহরণকে বলিল, আমি থাকব নাকি?

গিরীশ নিকটে ছিল, বলিল, কেন?

রাত্রিতে এ বাড়ি পাহারা দেওয়া উচিত।

পাহারা!—চিন্তাহরণ চমকিত হয়।

হ্যাঁ, বাবা বললেন, তোমাদের একটু সাবধান থাকা উচিত—জিরতলীর অত পাইক-বরকন্দাজ, ওরা হঠাৎ আক্রমণ করে মহিলাটিকে আবার ধরে নিয়ে যেতে পারে।

এখান থেকে, আমরা বেঁচে থাকতে?—রাজীব গর্জন করিয়া উঠিল। এতক্ষণ সে কোনো কথা বহে নাই। গিরীশের বন্ধু হইলেও রাজীবকে মহেশও গোঁয়ার বলিয়া এড়াইয়া চলিত। রাজীবও তাহাকে কোনো দিন পসন্দ করিত না। অবশ্য এখন সেই কথা ভাবা চলে না।

মহেশ আবার বলিল, বুঝে ত্যাখো। বরং—জিজ্ঞাসা করো না মিস্ শৈলকে।

রাজীব না বুঝিতে পারিয়া প্রশ্ন করে, 'মিস্ শৈল?'—ও শৈলী! শৈলী কি করিবে?

মানে, আমার থাকা তিনি প্রয়োজন মনে করেন কিনা—

গিরীশ বিরক্ত হইল, তিনি কি বলবেন এ বিষয়ে? তোমাকেই বা কি জানেন, আমাকেই বা কি জানেন?—বরং আমাদের যদি

বা জানেন তাঁর অধিকার-রক্ষায় উদ্যোগী বলে, তোমাকে জানবেন কোথা থেকে ?

রাজীবও বিরক্ত হয়। মহেশ দত্ত পিতার পদমর্যাদায় ও নিজের বিদ্যার গর্বে গর্বিত। সর্বদাই জানাইতে ব্যস্ত—সে ইংরেজিতে অনার্স পড়ে,—তাহার পিতা বডবড সাহেবদের দ্বারা সমাদৃত। তাই যেন ব্রাহ্ম সমাজেব তাহারাই প্রভু, শৈলীও তাহার নাম না জানিয়া পারে না।

মহেশ ক্ষুব্ধ হইল, বলিল, আগে না জানলেও এখন জানতে হবে ত ? অধিকার-রক্ষাব কি করেছ তোমরা ? যদি হঠাৎ একটা হাঙ্গামা বাধে —তখন ত আমাকেই ধরবে তোমরা—হরকান্ত দত্তকে ছাড়া ত তখন কারো চলবে না। কিন্তু বিপদ সেই মহিলার, কাজেই তাঁর স্বাধীন মতামত জানা প্রয়োজন।

রাজীব কি বলিতে যাইতেছিল। চিন্তাহরণ তাহাকে থামাইয়া মহেশকে শান্ত করিবার জন্য কহিল, সে ত ঠিকই, মহেশ বাবু। কিন্তু দত্ত মহাশয় যদি তেমন বোঝেন, তা হলে তিনিই ব্যবস্থা করবেন। আপাতত রাত্রিতে আমরা তিনজনেই পালা করে জাগব—বোধ হয় তাতেই হবে। আপনি বরং বাড়ি গিয়ে দেখুন—নূতন কিছু সংবাদ আছে কিনা। তাহলে খবব দেবেন।

রাজীব আর 'দুইকথা' শুনাইতে পারিল না,—মহেশ যুক্তিটা গ্রহণ করিল। আসলে মহেশ পিতার নাম করিয়া আশঙ্কাটা বাড়াইয়া বলিয়াছিল। সে মহেশ দত্ত, ইংরেজিতে অনার্স পড়িতেছে,—গিরীশের অপেক্ষা ইংরেজি সে কম জানে না। সমাজের যুবকদের তাই সেও নেতা। এই ব্যাপারেও সে পশ্চাতে পাড়িয়া থাকিবার মত লোক নয়, আপনাকে যুবক সমাজে বীররূপে প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে সেই স্বল্পদৃষ্টা মহিলার চক্ষে আজ তাহার মর্যাদাই রক্ষা হয় না। গিরীশ ভাবিয়াছে, সে খুব একটা শিবালরির কাজ করিয়াছে। দেখা যাইবে শেষ পর্যন্ত ! মহেশও

ছাড়িবে না। কিন্তু আপাততঃ ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া রাত্রি জাগিবার ও ঢাকার মশার কামড় খাইবার মত ইচ্ছা মহেশের নাই। হরকান্ত দত্ত-ও তাঁহার পুত্রের সেইরূপ আচরণ অনুমোদন করিতেন না—কোথায় যাইবে সে রাত্রি জাগিতে? তাঁহার পুত্রের মর্যাদাবোধ থাকা উচিত—সে হরকান্ত দত্তের পুত্র।

বাহিরের ঘরে দুই জন করিয়া তিন বন্ধুতে রাত্রি জাগিয়া কাটাইল। ভিতরের ঘরেও মনোরমা বা শৈলী কেহই শয়ন করিতে পারিল না; এই দুইটি প্রায়-সমবয়স্কা নারী পাশাপাশি বসিয়া রহিল। অজ্ঞাত অদৃষ্টের বিরুদ্ধে দুইজনেই সংগ্রামে নামিয়াছে; একজনার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অন্যজনাকেও অস্থির করিয়া তুলিতেছে। নারী ভাগ্যের অনিশ্চয়তার অনুভূতি ও নারীসত্তার অর্ধোন্মেষিত মুক্তি-বাসনা তাহাদের দুইজনাকে আজ একাত্ম করিয়া তুলিয়াছে। সামান্য মাত্র শব্দে দুইজন আশঙ্কায়, চমকিত হয় দুইজনই আশ্বাস খোঁজে দুইজনার নিকটে।

বউঠান্! —শৈলী কম্পিত হস্ত, কম্পিত দেহ; মনোরমাকে সে জড়াইয়া ধরে। মনোরমাও ভীত, উৎকর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু নিজের ভয় গোপন করিয়া তাহাকেই ভরসা দিতে হয় যথাসম্ভব শান্ত স্বরে, কই? কিছু না। ঘুমোও, ঘুমোও, ঠাকুরঝি।

আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তাহারা দুইজনা দুইজনার নিকট 'তুমি'। অপরিচিতা, নির্বান্ধবা শৈলী মনোরমার চক্ষে জন্ম-সহোদরা।

সত্যই কিছু না। কিন্তু মনোরমাকে এত কাছে না পাইলে শৈলীর আজ চলিত না। কাহাকে সে পাইত আর? মা?—হায়! তাহার মাও ভাগ্যচক্রে তাহার শত্রু পক্ষীয়া। মা শুধু অসহায়া নয়, শৈলীকে দিয়াই আপনার একটা ভাগ্য-পরিবর্তনের দুরাশাও তাহার মনে

জাগিয়াছে। পৃথিবীতে শৈলীর আপনার বলিতে তাহা হইলে আজ আর কে রহিল ?—ইহারা ছাড়া, এই রাজীব, গিরীশদা', চিন্তাদা' আর অপরিচিতা এই আশ্রয়দাত্রী বউঠান মনোরমা। আজিকার রাত্রি যদি শৈলী বাঁচিয়া থাকে—যদি এই বিপদ সে সমুত্তীর্ণ হয়—তাহা হইলে শৈলী জানিবে—ইহারাই তাঁহার আত্মীয়, মনোরমাই তাহার জীবন-দাত্রী,—মা, বাপ, ভ্রাতা,—আরও যাহা কিছু মানুষ মানুষের হইতে পারে, সবই।

রাত্রি শেষে এক সময়ে শ্রান্ত অবসন্ন দেহে শৈলী মনোরমার কোলেই ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রত্যূষে নিত্যকার মত গৃহকর্মের জন্য মনোরমা উঠিয়া পড়িল।

বাহিরের ঘরে রাজীব এবার ঘুমাইতেছে, জাগিয়া আছে গিরীশও চিন্তাহরণ দুই ভাই। হাত মুখ ধুইয়া প্রার্থনার উদ্দেশ্যে চিন্তাহরণ প্রস্তুত হইবে—হৃদয় তাহার ভক্তিতে শ্রদ্ধায় সংহত।

গিরীশও উঠিয়া পড়িল। গৃহান্তরে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিল—একা ঘরে ক্লান্ত শয্যায় শৈলী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চিন্তা-ও-উদ্বেগক্লিষ্ট, জাগরণ-শ্রান্ত সেই মুখে উষার প্রথম আলোক-আভাস আসিয়া পড়িয়াছে—শিশিরার্দ্র গোলাপের মত সেই সুন্দর মুখ, পরিস্ফুট সেই দেহ-সুষমা যেন এই মুহূর্তে ক্লান্তিতে সকরুণ, আরও সুন্দর, মমতায় কমনীয়। দীর্ঘাঙ্গী এই সুশ্রী তরুণীকে নৌকায় বালক-বেশে দেখিয়াও গিরীশ বিস্মিত হইয়াছিল। সেই সাত আট বৎসরের শৈলী কী হইয়াছে, কী হইতে পারে, তৎপূর্বে গিরীশের মনে সেই চিন্তা স্থান লাভও করে নাই। তখন শুধু আপনাদের মহৎ সংস্কার প্রচেষ্টার কথাই বড় করিয়া ভাবিয়া গিরীশ গর্ববোধ করিয়াছে। সে রাত্রিতে প্রথম মুহূর্তে বিস্ময়ই জাগিয়াছে—দীর্ঘদেহের

গড়ন ও সুসম সৌন্দর্যাভাস সেই সময়েই চোখে পড়িয়াছে। অবশ্য সিক্তবসনা শৈলীর দিকে সে তাকায় নাই। চৌধুরী বাড়ির শত অবজ্ঞা নিপীড়নেও যাহা ম্লান হয় নাই, বিশুষ্ক হয় নাই, সে রূপ স্বাস্থ্য, তেজোদীপ্তি সেদিনের নিশান্তেও নৌকা-মধ্যে তাহাকে চমকিত করিয়াছিল। শত দুর্বিপাকের মধ্যে, প্রতিকূলতার মধ্যে যে মহিলা আপনার বুদ্ধি ও সাহস বলে আপনাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম, শিক্ষিত যুবক গিরীশ স্বভাবতই তাহাকে মনে-মনে শ্রদ্ধা না করিয়া পারে না। সেদিন সে নূতন করিয়া শ্লাঘাবোধ করিয়াছে—এই বুদ্ধিমতী নারীর মুক্তি-প্রয়াসে সেও সহায়তা করিতে পারিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, গিরীশ আরও কিছু সত্যও যেন তখনি বুঝিতে পারিয়াছে,—শুধু মনে-মনে প্রশংসা করিলেই তাহার কর্তব্য শেষ হয় না। হিন্দুসমাজের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া শৈলীকে স্বাধীন ও সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত করাও তাহাদের দায়িত্ব। সত্যই, সৌন্দর্যে বুদ্ধিতে শৈলী সুযোগ্যা মহিলা। এইত—নবোদ্ভিন্ন গোলাপ কলিকার মতই, কমনীয়, প্রস্ফুটিত তাহার দেহলাবণ্য, তিলফুলের মত নাসা; নিদ্রিত মুখের অধররেখায়ও বুদ্ধির আভা ঢাকা পড়ে নাই।

গিরীশ চমকিয়া উঠে। নির্জন গৃহে এক নিদ্রাচ্ছন্না সেই তরুণী—সে এখানে দাঁড়াইয়া আছে কেন?

গিরীশ বাহিরের গৃহে ফিরিয়া আসিল—প্রাঙ্গণে গিয়া দাঁড়াইল।

ব্যায়াম না করিয়াই গিরীশ প্রাতর্ভ্রমণের জন্য বাহির হইয়া গেল—নদী তীরে দ্রুতপদে পদচারণা করিতে লাগিল। এই একটা মহৎ কর্মের দায়িত্বভার তাহারা গ্রহণ করিতেছে। ব্রাহ্ম-যুবক হিসাবে তাহারা শৈলীর উদ্ধারে অগ্রপর হইয়াছে; উপস্থিত কর্তব্যবোধের বশে হয়ত সকল কথা ভাবিয়া দেখিবারও তাহারা অবসর পায় নাই। কি হইবে অতঃপর এই মহিলার তাহাদেরই আশ্রয়ে যে খুঁজিয়াছে? ব্রাহ্মসমাজ তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইবে? কে দাঁড়াইবে? হরকান্ত দত্ত? ওই

মহেশটা? রাজীব বা চিন্তাহরণ না বুঝুক গিরীশ বুঝিতেছে শৈলীর উদ্ধার, শৈলীর স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা—ইহা বিশেষ করিয়া তাহার শক্তির সম্মুখে এ যুগের আহ্বান, তাহার আপন পৌরুষের পরীক্ষা।

দিনের বেলার সূর্য'লোকে সকলেরই মনে হইল—কাল রাত্রিত্রে তাহারা অকারণ আশঙ্কায়, অস্বাভাবিক উত্তেজনায়, উদ্বেগে মিছামিছি নিজেদের পীড়িত করিয়াছে। কই, কোথাও কিছু নাই ত। প্রতিবেশীদের জীবনযাত্রা যথানিয়মে আরম্ভ হইয়াছে, শহরের কর্মচক্রও নিয়মিত চলিল। মনোরমার মনে পড়িল—বাজার করিতে হইবে, চিন্তাহরণ রাজীবের স্কুলে আছে। যথারীতি দৈনন্দিন গৃহকর্ম শেষ করিয়া উনুন ধরাইতে লাগিল মনোরমা! আজ এই কর্মভার শৈলী নিজে গ্রহণ করিবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু সারারাত্রির উত্তেজনায় যে এখন সুপ্তি-সমাচ্ছন্ন। ঘুমাক্ সে। কিন্তু রাজীবকে এইবার তুলিয়া দেওয়া প্রয়োজন—তাহার কাজ আছে, সে-ই বাজারে যাইবে।

চিন্তাহরণ শান্ত মনে দৈনন্দিন কাজ লইয়া বসিল—বইপত্র খুলিল। কাল সন্ধ্যায় কাজ হয় নাই, মনোরমারও পাঠ প্রস্তুত করিবার অবসর ছিল না। নূতন পড়া সে কি আজ এমন গ্রহণ করিবে? এখন একটু অনিয়ম এবেলা সম্ভব হয়ত হইবে না; দ্বিপ্রহরেই বরং আজ সময় করিয়া পড়িবে—গিরীশ প্রয়োজন মত তাহাকে সাহায্য করিবে।

ঠাকুরপো!—কেমন শঙ্কিত বিস্ময়ে মনোরমা বলে।

হাঁ। আপত্তি আছে?—চিন্তাহরণ জানিয়াও প্রশ্ন করে।

না, না, আপত্তি নয়। ওঁদের যে অনেক কাজ।

এই দুইদিনে গিরীশও মনোরমার যে নিকটতর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা চিন্তাহরণ অনুভব করিতে পারে। এইবার শেষ দূরত্বটুকুও

নিঃশেষ করিয়া ফেলিলে তাহাদের সংসারে একটি স্বচ্ছন্দ সুষমার সূচনা হইবে। মনোরমাও তাহা বুঝিল।

চিন্তাহরণ বলিল, এটাও ত একটা কাজ।

গিরীশেরও সময় হইল। তাহার দায়িত্ব বোধ আছে—মহিলাদের শিক্ষায় সে সাহায্য করিবে বৈকি। পূর্বেই তাহারা আলোচনা করিয়াছে —শৈলীকে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকিতে দিলে হইবে না, তাহাতে নানা দুর্ভাবনায় সে পীড়িত হইবে মাত্র।

পড়াইতে বসিয়া গিরীশ বিস্মিত হইল—শৈলী ত মোটেই শিক্ষালাভে বঞ্চিতা নয়। ইংরেজি সে একেবারেই জানে না,—মনোরমাও তাহা সামান্যই শিখিয়াছে। গিরীশ জানে, বউঠানের সেই দিকে উৎসাহ নাই, কিন্তু শৈলীর অফুরন্ত আগ্রহ। গিরীশের সন্দেহ রহিল না—আসলে শৈলী মনোরমার তুলনায় অধিকতর শিক্ষিতা। অন্তত তাহার বুদ্ধির প্রাখর্য ও শিক্ষার আগ্রহ গিরীশকে আধঘণ্টার মধ্যেই চমৎকৃত করিল।

মনোরমা ইতিহাস পড়িতে চায় না, চিন্তাহরণের মুখে তাহা সে শোনে—আর্য অনার্য, বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি নূতন কথা ও বিষয় সে জানিত না। কিন্তু গিরীশ চমৎকৃত হয়—শৈলী ইতিহাসের এই সব কথা বলিতে পারে। গিরীশ সকুতূহলে প্রশ্ন করে, তুমি এসব জান্‌লে কি করে?

পড়েছি।

বিদ্যাসাগর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচিত ইতিহাসের পুরাতন বই তাহাদের গৃহে দেবপ্রসাদের সংগ্রহে ছিল। সেই সঙ্গে কি করিয়া মার্সম্যান সাহেবের 'ইংলণ্ডীয় রাজবিবরণও' আছে, তাহাও শৈলী পড়িয়াছে।

শৈলী নিজেই জানাইল,-ছুটিতে চিত্রিপারে আসে বিভূতি, তার

বইও পড়েছি, সে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে দিত। ভূগোল পড়েছি তারই কাছ থেকে নিয়ে।

গিরীশ বিস্মিত হয়, বলে, পড়েছ, কিন্তু তা মনেও আছে যে দেখছি।

শৈলী স্বচ্ছন্দভাবে বলে, পড়েছি যে।

একটু পরিহাস করিয়াই গিরীশ বলে, পড়লেই মনে থাকে বুঝি?

শৈলী সপ্রতিভভাবে উত্তর দেয়, পড়লে আবার মনে থাকবে না কেন?

শুনলেন বউঠান?—

মনোরমা হাসিতে চেষ্টা করিল, বলিল, মাথা থাকা চাই।

গিরীশও তাহাই মনে করে,—চমৎকার মাথা শৈলীর। এই নূতন আবিষ্কারে তাহার কৌতুক ও কৌতূহল জাগ্রত হইল। সে আবও শৈলীকে বলিল: বেশ, পড়ো দেখি এখান থেকে।—গিরীশ তাকের একখানা বই টানিয়া লইয়া একটা স্থল বাহির করিয়া দিল। বলিল, পড়ো ত?

শৈলী ভীতা নয়, সংকুচিতা নয়, বরং উৎফুল্লাই হয়। সে জানে—অদৃষ্ট যত তাহার সঙ্গে বাদ সাধুক তাহার গুণ যথেষ্ট। আপনার কৃতিত্ব দেখাইবার সুযোগ পাইলে, সে আর কিছু চায় না—সকলেই বুঝিবে সে কত শ্রেষ্ঠ! তাই বেশ তাড়াতাড়িই শৈলী পড়িয়া চলিল: "কেহ কেহ কহেন ব্রহ্মপ্রাপ্তি যেমন রাজপ্রাপ্তি হয়। সেই রাজপ্রাপ্তি তাহার দ্বারীর উপাসনা ব্যতিরেকে হইতে পারে না, সেইজন্য রূপগুণ বিশিষ্টের উপাসনা ব্যতীত ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবেক না। যদ্যপিও এ বাক্য উত্তরযোগ্য নহে তথাপি লোকের সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত কহিতেছি।...."

গিরীশ বলিল, থাক্‌। এবার বলো কি পড়িলে।...

শৈলী চমকিত হইল, বলিল, আর একবার পড়ে নিই তা হলে।—আবার সে পড়িল। তারপর সত্য সত্যই শৈলী আবৃত্তি করিয়া চলিল : "কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মপ্রাপ্তি যেমন রাজপ্রাপ্তি হয়।..."

গিরীশ চমৎকৃত হয়।—মুখস্ত হয়ে গেল! —চোখে মুখে তাহার প্রশংসা ফুটিয়া উঠে। সে জিজ্ঞাসা করে, অর্থ বলতে পারবে?

অর্থ?—এবার শৈলী ভীত হয়। তথাপি সে দমিল না,—বলে দিন একবার, তার পরে পারব।

আচ্ছা বল্‌ছি—গিরীশ উৎসাহ-ভরে অর্থ করিতে বসে।....কেহ কেহ বলেন, 'ব্রহ্মপ্রাপ্তি',—ব্রহ্মপ্রাপ্তি বোঝ?—ব্রহ্ম জানো ত?... যেমন, আমরা ব্রাহ্ম ..এই বইও রাজা রামমোহন রায়েব লেখা—

গিরীশ আপনাদের ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের আদর্শ বিবৃত করিতে আরম্ভ করে। মনোরমা কখন যে নীরবে সরিয়া গিয়াছে—গৃহকর্ম আছে বলিয়া,—গিরীশ তাহা লক্ষ্যও করে নাই। শৈলী ক্ষুধার্ত মনে শুনিতে থাকে।

বাঙলা দেশের হিন্দু ঘরের গ্রাম্য মেয়ের এত বুদ্ধি, এত তীক্ষ্ণতা, বিদ্যার্জনে এত আকাঙ্ক্ষা—ইহা গিরীশের এক নূতন আবিষ্কার! সে আবিষ্কারের উৎসাহে সে সত্যই মাতিয়া উঠিল। দাদাকে, রাজীবকে না বলিয়া পারে না—'শী ইজ এ জুয়েল্।'

গর্বে রাজীবের বুক ভরিয়া উঠে।

চিন্তাহরণও উৎসাহিত হয়। এবার মনোরমার একজন যোগ্য সহপাঠিনীও তবে জুটিল। দুইজনার পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহাদের লেখাপড়া আরও দ্রুত অগ্রসর হইবে। সাদরে মনোরমাকে সে বলে, কি বলো?

মনোরমা ম্লান হাস্যে বলে, আমি পারব না।

কেন?

আমার মাথা নেই।

চিন্তাহরণ হাসিয়া বলিল: বলো কি? এইটা তবে কি?—বলিয়া মনোরমার মাথাটি আপনার দুই হস্তে কাছে টানিয়া আনিল। তাহার দুই চক্ষুতে মনোরমাব উন্মীলিত ঈষৎ ব্যথিত নেত্রদ্বয়ের উপর সে আপনার অজস্র প্রীতি উৎসারিত করিয়া দিল। মনোরমার চোখ বুজিয়া আসিতেছিল। অমনি মনে পড়িল—আপনাকে বিস্মৃত হইবার সময় এ গৃহে তাহাদের এখন নাই। কোথায় যেন একটা বাধা বলিয়া ঠেকিতেছে এই সংসারেব এই অবস্থাটা। চিন্তাহরণও জানে, অনেক মানুষ; নানা কর্তব্য সম্মুখে। মনোরমা আপনাকে মুক্ত করিয়া লইল। তারপর জোর করিয়া হাসিয়া বলিল: মাথার খুলিটা আছে' কিন্তু মাথার মধ্যে কিছু নেই।

চিন্তাহরণ না বলিয়া পারিল না, যা আছে তার তুলনা নেই।

তাই নাকি?—হাসিয়া মনোরমা কার্যান্তরে চলিল।

চিন্তাহরণ একবার বলিল, আজ সকালে একটা কবিতা লিখেছি।

পরে শুনব।—বলিয়া মনোরমা অন্তর্হিতা হইল।

বহির্জগতে কি ঘটিতেছে তাহা জানিবার মত অবকাশ শৈলীর বিশেষ হইল না। দুই দিনের মধ্যেই মনে হইল—সব বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, সে নির্বিঘ্ন, নিরাপদ। এমন একটা নিশ্চয়তা সে জীবনে অনুভব করিতে পারিবে তাহা কল্পনাও করে নাই। 'দাদাভাই' ও চিন্তাহরণ আছেন, আর গিরীশের তো কথাই নাই। শৈলীকে ইংরেজি শিখাইবার জন্যও সে পাগল হইয়া উঠিয়াছে।—বলে, ইংরেজি শিখতেই হবে, নাহলে শিক্ষাই হয় না।

শৈলী উল্লসিত হয়, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই বলে, সে আমি পারব কি?

কেন পারবে না? তোমার মত যার মাথা সে পৃথিবীতে কি না করতে পারে?

শৈলীর মনের মধ্যে আনন্দের শিহরণ জাগিয়া উঠে। ঠিক এমনি কথাই সে শুনিতে চায়, শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিয়াছে। কিন্তু চিত্রিসারে কোথাও তাহা কাহারও মুখে শুনিতে পায় নাই—শুনিয়াছে একমাত্র রাজীব চৌধুরীর মুখে। গিরীশ গাঙ্গুলী ত রাজীব চৌধুরী নন, সাহসী সরল তাহার একান্ত আশ্রয় 'দাদাভাই' নন। ইনি যে তেজস্বী স্পষ্টভাষী গিরীশ গাঙ্গুলী—স্পষ্ট কথা যে বাপ মা মাসী কাহাকেও বলিতে দ্বিধা করে না। এই আগ্রহ, এই উদ্যম, এই অকুণ্ঠ উৎসাহ বিদ্যাগর্বিত গিরীশ গাঙ্গুলীর কাছ হইতে কোনো মেয়ে কি ইতিপূর্বে পাইয়াছে? শৈলীর মন নাচিয়া উঠে। সবই সে নাকি করিতে পারে! তাহার চক্ষুর সম্মুখে একটা নূতন দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কত কি যেন সেখানে ঝিকিমিকি করিতেছে! শৈলী কি তাহা জানিবেনা, পাইবে না, চিনিবে না,—চিরদিন বঞ্চিত হইয়া রহিবে? শুধু রাজীব নয়, গিরীশের মত লোকও তাহাকে মেধাবী বলিয়া মানে। আর গিরীশও নয়, শুধু, চিন্তাহরণও তাহাকে বলেন বুদ্ধিমতী।

চমৎকার মানুষ এই চিন্তাহরণ গাঙ্গুলী। স্নেহ-উদার দৃষ্টিতে 'বড়দাদা' শৈলীকে সব সময়েই কাছে ডাকিয়া বসান; কথা বলেন; গল্প শোনেন। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের কবিতা পড়েন; নিজেও নূতন পদ্য লিখিয়া তাহা পড়িয়া শোনান,—আমার পদ্যটা শুনবে? 'সুভদ্রা-সারথি' —তোমাদের কথাই।

তোমারে স্মরণ করি, ভারত ললনা,
পতিত ভারত বক্ষে চির গরীয়সী,
তোমারে ছলিতে নারে যতেক ছলনা
জীবনে মিশায়ে দেছে কলঙ্কের মসী।

আমারা জীবন লয়ে করিয়াছি খেলা।
তুমি সেই ছলা-ভরা জীবনের মাঝে
রচিয়াছ আমাদের পূণ্যস্নান মেলা,
ত্যাগে কর্মে প্রেমে ধর্মে শুচিতায় লাজে

তুমি ছিলে স্বয়ম্বরা স্বাধীনা সাবিত্রী,
তুমি ছিলে ধর্মবতী গান্ধারী মহিষী,
তুমি ছিলে বীর্যবতী সুভদ্রা-সারথি,—
জীবনের রথ তাই চলিত নির্ঘোষি।

আমরা দাসের জাতি, পুরুষ ত নই—
তাই তোমা করিয়াছি আমাদের দাসী,
শক্তিরে করিয়া দাসী শক্তিহীন রই—
প্রভুরে তোষণ করি আত্মারে বিনাশি।

আজ এই ভারতের শ্মশান-মাঝারে
তোমারেই স্মরি তাই ভারত ললনা,
জননী, ভগিনী জায়া,—ডাকিছি তোমারে
ক্ষমা কর এ জাতির পুরুষ-ছলনা।

গিরীশ কিন্তু সন্তুষ্ট হয় না। এইসব বাঙলা কবিতা শুনিয়া শৈলীর লাভ হইবে না। দাদাও পদ্য লিখিতে গিয়া ভুলিয়া যান তিনি ব্রাহ্ম। তাহা অপেক্ষা প্রবন্ধ রচনা করা তাঁহার কর্তব্য, ইতিহাস ও দর্শনের নানা কথা লেখাও চলিতে পারে। রেভারেণ্ড কে এম ব্যানার্জির

মত ঐরূপ কাজ করাই বরং ফলপ্রদ। কিন্তু সেইসব বিষয়েও ইংরেজি না জানিলে কেহ যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। বাঙলায় চলিতে পারে একমাত্র প্রচারমূলক প্রবন্ধ, বক্তৃতা, সংবাদপত্রের সন্দর্ভ-রচনা। গিরীশ চিন্তাহরণকে বলে—'সমদর্শী'তে' বাঙলা প্রবন্ধ লেখো, 'অবলা-বান্ধবে' লেখো—তা বুঝি। কিন্তু বাঙলা কবিতা লেখো কেন?—ও ভাষা লিখ্‌লে তুমি ঠাকুর দেবতার উপমা, ইঙ্গিত ছাড়তে পারবে না।

চিন্তাহরণ হাসে, চুপ করিয়া যায়। শৈলীর কিন্তু পদ্য শুনিতেও ভালো লাগে। চিন্তাহরণও তাহাকে পড়াইতে উৎসাহ পায়। এক সঙ্গে সে তাহাকে ও মনোরমাকে লইয়া বসে। মনোরমা কিন্তু তখন পড়ায় পারিয়া উঠে না। দুইদণ্ড পরেই সে উঠিয়া যায়—উনুন ধরাইতে হইবে। শৈলী জানে, তাহা সত্য নয়। একটু আগে সে উনুন ধরাইতেছিল, মনোরমা নিষেধ করিয়াছে, 'এখন ধরালে মিছামিছি চুলা জ্বলবে, কাঠ পুড়বে।' কেমন অনুযোগ ছিল সেই কথাটাতে, শৈলী তাই তখন উনুন ধরাইতে পারে নাই। শৈলী বেশ বুঝিতেছে—মনোরমা কোনো গৃহকর্মই শৈলীর হস্তে দিতে চাহিতেছে না। শুধু রূপে নয়, গৃহকর্মে শৈলীর কুশলতা, নিপুণতা, রন্ধনে তাহার কৃতিত্ব এতই সুস্পষ্ট যে, নন্দীগ্রামের গাঙ্গুলীদের 'কর্ত্রীবউও' তাহাতে ম্লান হইয়া যায়! অথচ, মনোরমারও উহাই প্রধান গর্ব—সে সংসার করিতে জানে। সে কর্ত্রীত্বাভিমানিনী না হউক, কর্ত্রীত্ব অভ্যস্তা। এখন শৈলীর তুলনায় নিজেকে খর্বিবোধ করিয়া মনোরমা শৈলীর প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু শৈলীরও ক্রমে রাগ হয়। সে কর্ত্রী হইয়া জন্মে নাই, কিন্তু সংসারে কর্ত্রীত্ব করিতে হইলে সে যে কত নিপুণতার সঙ্গে তাহা করিতে পারিত তাহা তাহার সামান্য কাজ কর্মেও অনুভব না করাইয়া সে ছাড়িবে না। মনোরমা চাহে না—শৈলী গৃহকর্মে হস্তার্পণ করে। মনোরমা শৈলীর পোষাক-পরিপাট্যে, চুলের সযত্ন বিন্যাসেও খুশী হয় না,

শৈলী তাহাও বুঝিতে পারে। কিন্তু এইসব বিষয়ে কেন শৈলীইবা খর্ব হইয়া থাকিবে? তাহা ছাড়া লোভ সামলাইতেও শৈলী পারে নাই। সামান্য বস্ত্র ছাড়া সে পূর্বে পায় নাই, এখানে শাড়ী জামা পাইতেই কেমন যেন মনে সাজিবার ইচ্ছা জাগিল। শৈলী তাই তাহা এমন যত্নে পরিল যে, দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হয়। সত্য কথা, বড ভালো লাগে শৈলীরও একটু সুন্দর করিয়া সাজিতে। কিছুই তাহার নাই—অবসর নাই, পরিচ্ছদ নাই,—তবু ভালো লাগে সাজিতে—রূপ ত তাহার আছে। পড়াশুনায়ও মনোরমা পূর্বে আপনার পরাভব মানিয়া লইতে আপত্তি করে নাই। অভিমান করিয়া বলিত, তাহার মাথা নাই, সে পণ্ডিত হইতে চায় না। কিন্তু শৈলীর সম্মুখে পরাজয়ের সম্ভাবনায় সম্প্রতি মনোরমা ক্ষুণ্ণ হয়, শৈলী তাহাও বুঝিয়া ফেলিয়াছে। চিন্তাহরণ যখনই শৈলীর প্রশংসা করিয়া বলে, 'দেখেছ শৈলীর মাথা?' মনোরমা তখনি গম্ভীর হয়। শৈলীর বুঝিতে বাকী নাই, মনোরমা তাহার বুদ্ধির প্রশংসায় ক্ষুন্ন। এসব শৈলীও তাই ক্ষোভ পোষণ করিতেছে।

সেদিন তাই ইচ্ছা করিয়াই শৈলী বলিল, আমাকে যে এই একটু আগে উনুন ধরাতে নিষেধ করলে, বউঠান। বললে—'মিছি মিছি কাঠ পুড়বে।'

মনোরমা ফিরিয়া দাঁড়াইল। নিমেষ মাত্র নীরব থাকিয়া দৃপ্তভাবে বলিল,—বলেছি; তাতে কি হয়েছে?

শৈলী অপ্রস্তুত হইয়া গেল। চিন্তাহরণও কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইল। এমনভাবে মনোরমাকে ত সেও বড় দেখে নাই। বেশ যেন তীক্ষ্ণ, সচেতন; গ্রীবা উন্নত, স্ব-মর্যাদায় সে দৃপ্ত, কর্ত্রী-সুলভ আধিপত্য তাহার দৃষ্টিতে।

শৈলী এই দৃষ্টির সম্মুখে কেমন সংকুচিত হইয়া পড়িল; নিজের মধ্যেও কেমন ভীত বোধ করিল। বলিল, না, তা নয়। তুমি পড়ো

বউঠান, আমি উনুন ধরিয়ে আসছি।—বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িতে চাহিল।

না। পড়তে আমার ভালো লাগে না।

মনোরমা তাচ্ছিল্য ভরে বলিয়া চলিয়া গেল। প্রথম কিছুক্ষণ চিন্তাহরণেরও কেমন দ্বিধা রহিল। তারপর তাহা কাটিয়া গেল। মিশ্র পূরণ শেষ হইলে অন্যদিন সে মুখে মুখে মনোরমাকে ইতিহাসের গল্প বলে —মনোরমাকে এই ভাবেই সে ইতিহাস শিক্ষা দেয়। তাই এইবার সে বলিল, শৈলী বোন, যাও ত, তোমার বউঠানকে ডেকে নিয়ে এসো এবার। ইতিহাসের পড়া হবে।

শৈলী ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিল। মনোরমা আসিল না;—উনুনে রান্না পুড়িয়া যাইবে। শৈলীকেও রান্নায় সে হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না,—তুমি ক'দিন বা থাকবে বলো? তোমার উপর এ ভার চাপানো ঠিক নয়।

শৈলীর বুঝিতে দেরী হয় না—এই গৃহে সে আগন্তুক, এখন অবাঞ্ছিতও।

এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইতে না হইতেই তাহাদের দুই জনার সেই প্রথম দিনের প্রীতি স্নেহ-সিক্ত সখীত্বের সম্পর্ক এইভাবে যেন নিঃশেষ হইয়া যাইতে বসিল।

হরকান্ত দত্ত চিন্তাহরণকে সংবাদ দিলেন—বিশেষ গোপন সংবাদ আছে। বলিলেন, আর এখানে তাকে রেখো না। ওরা আজ মহকুমা হাকিমের কাছে দরখাস্ত করেছিল। তিনি তদন্ত সাবকাশে হুকুম মুলতুবি রেখেছেন তিনদিন। তখন খানাতল্লাসী হবে, তবে মেয়েটি তোমাদের বাড়ীতে থাকা আর ঠিক নয়। বলিয়া ইংরেজিতে বলিলেন, যত কথাই বলি, তিনি তিনটা যুবক আর দুইটি

যুবতী এক বাড়ীতে বসবাস করছে, এটা নীতি সঙ্গত নয়। সাহেব হয়ত পাদ্রীদের অভিভাবকতায় মেয়েটিকে সমর্পণ করবার হুকুম দিবে।

গিরীশ প্রতিবাদ করিল, অসম্ভব। তাদের হাতে কোনো মেয়ে পড়লে—

হরনাথ দত্ত তাহাকে থামাইয়া দিলেন।—থামো! সে সব তোমার অপেক্ষা আমার কম জানা নেই। তার জন্যই বল্‌ছি—এবার তাকে অন্যত্র সরাও।

রাজীব বলে, কোথায় সরাব বলুন?

তা আমি ভেবে রেখেছি। কলকাতায় আমাদের বন্ধু শরৎ গুপ্তকে খবর দিয়েছি, মহেশ কাল গিয়েছে, তার সঙ্গে আমার চিঠি দিয়েছি। যা করবার শরৎ গুপ্ত করবেন, সে ত জানোই।

সেখানেও ত এরূপ হতে পারে।

নিশ্চয়ই। কিন্তু সেখানে আছেন আমাদের বন্ধুরা, নেতারা,—মনোমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বোস্, দুর্গামোহন দাশ,—আইন আদালতে ব্রিটিশরা থাকতে আমাদের ভয় নেই।

কথাটায় রাজীব চমকিত হয়। কিন্তু, সত্য কথা।

প্রশমিত উত্তেজনা আবার বাড়িয়া গেল। বাহিরে কোনো আয়োজন নাই। কিন্তু শৈলীকে আজই এই গৃহত্যাগ করিতে হইবে—অবশ্য দাদাভাই ও গিরীশ। তাহার সঙ্গে থাকিবেন। কিন্তু কোথায় আবার সে যাইবে কে জানে? শরৎগুপ্তের গৃহ কেমন তাহা সে জানে না। এইখানে ত মনোরমা তাহাকে আশ্রয়চ্যুত করিতে পারিত না। চিন্তাহরণ, গিরীশ ও রাজীব চৌধুরী পরস্পর কুটুম্ব, তাহারা আবাল্য তাহাকে দেখিয়াছে। সেও দেখিয়াছে সেই বালক চিন্তাহরণ ও গিরীশকে সেই পরিচয়ে এই জীবনও সে তাহাদের

আপনার হইয়া উঠিতেছিল। মনোরমারও তাহা মানিতে বাধ্য হইত। কিন্তু যাইতে হইবে, কেহ বেশি না বলিলেও শৈলী বুঝিল—এখানে সে আর নিরাপদ নয়।

চিন্তাহরণ সস্নেহে বলিয়াছিল, বিপদ কাটলেই তোমাকে নিয়ে আসব, তুমি ত সাহসী মেয়ে, বীর-বনিতা; কিছুতেই ভয় পাবে না।

'সাহসী মেয়ে!' শৈলীর মনে পড়িল, 'সাহস চাই, সাহস চাই'। হাঁ, সে আজ বোঝে তাহার সাহস আছে। শৈলীর মনে পড়িল, বলিল, আপনার সেই 'বীর-বনিতা' কাব্য ছাপা হলে আমাকে দেবেন?

শৈলী বুদ্ধিমতী, জানে কি বলিতে হইবে। মনোরমা তাহা বুঝিতে পারে—এত মায়াও জানে এই মায়াবিনী মেয়েটা!

চিন্তাহরণ পুলকিত হইয়া বলে—তোমার ভালো লেগেছিল নাকি সেই কবিতাটি, শৈলী?

লাগ্‌বে না? এখনো পর্যন্ত মনে আছে।

'তোমারে স্মরণ করি ভারত-ললনা'—

এক স্তবক সে আবৃত্তি করিল। বলিল—তারপর? আরও দুএকবার শোনা চাই।

মনোরমা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, কঠিন হইয়া উঠিল তাহার মুখমণ্ডল। তাহাকেই না উৎসর্গ করিয়াছিল চিন্তাহরণ এই কবিতা—সেই প্রথম দিনে? শৈলী তাহা মুখস্ত করিল কিরূপে।

চিন্তাহরণ নিজের উৎসাহে পত্নীর মুখভাব দেখিবার অবসর পায় নাই, মনোরমাকে সে বলিল, তোমার কাছে ত কবিতাটা আছে। একটু দিয়ো ত, আমি তা নকল করে একে একটা কপি দোব।

মনোরমা বিরক্তিভরে বলিল: কোথায় রেখেছি আমার মনে নেই। আমি পারব না এখন খুঁজতে—

চিন্তাহরণ সচকিত হইল। কথা ও কণ্ঠস্বর দুইই প্রায় অজ্ঞাত-পূর্ব। এমনভাবে মনোরমা উত্তর দিতে পারে তাহাকে? ধীরে ধীরে সে বলিল, থাক্, খুঁজে না পেলে আমিই লিখব আবার—মনে আছে। 'অবলা বান্ধবে' ত দোব, তখনি তোমার জন্যও একটা নকল পাঠাব।

মনোরমার কেমন ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল—আপনাকে সে প্রাণপণে স্থস্থির করিতে চাহিল। প্রাণপণ চেষ্টায় সে শৈলীকে বলিল, এ সবের অনেক অনেক সময় হবে। কিন্তু প্রথম তুমি সত্যই বিপদমুক্ত হও। আমি মূর্খ মানুষ, এর বেশি আর তোমাকে এখন বল্‌তে পারব না—সৎপথে তোমার মতি অচলা থাক্।

কিন্তু কথাটা তত স্বচ্ছন্দ শোনাইল না। 'আমি মূর্খ মানুষ' কথাটা কানে বিঁধিবার মত; মনেও বিঁধিবার জন্যই তাহা নিক্ষিপ্ত।

শেষ রাত্রে তিনজনকে বিদায় দিয়া চিন্তাহরণ ও মনোরমা আবার গৃহাভ্যন্তরে আসিয়া বসিল। এইবার তাহারা মাত্র দুইজনে—এই নির্জন গৃহে। এখন আর কেহ নাই, আজ রাজীবও নাই। দুইজনে তাহারা পরস্পরকে এমন সান্নিধ্যে আজ এই কয়দিনের মধ্যে একবারও পায় নাই। ক্ষুদ্র এই বাসস্থলে স্বতন্ত্র গৃহে তাহারা এই কয়দিন রাত্রি যাপন করিয়াছে,—মেয়েরা রহিয়াছে অভ্যন্তরস্থ প্রকোষ্ঠে, আর পুরুষেরা বাহিরের বসিবার ঘরে। এই কয়টি দিনে তাহাদের দুই জনার মধ্যে যে সত্যই কোনো দূরত্ব ঘটিতে পারিত ইহা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই। দূরত্ব সম্ভবত ঘটেও নাই; কিন্তু তাহারা ক্রমেই অনুভব করিয়াছে এই উত্তেজনা, বাসগৃহে এই বাহিরের মানুষ, নানা ঘটনার সংঘাত,—সব শুদ্ধ যেন একটা অন্ধকার তাহাদের মাঝখানে নামিয়া আসিতেছে, তাহাদের দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। ভীত

শঙ্কিত মনোরমা উহার অঙ্গুলি পীড়নে আজ কয়দিন যে ছটফট করিতেছে, চিন্তাহরণ তাহা দেখিয়াও কি দেখিতে পায় নাই। কিন্তু না দেখিয়া তার কি উপায়ই থাকিবার চিন্তাহরণেরও শেষ পর্যন্ত রহিয়াছে? তাহাও নাই। এই মুহূর্তে যখন তাহারা দুইটি প্রাণী এবার একান্তে নিজ গৃহে প্রবেশ করিল তখন আর ত কিছুই সঙ্গোপন করিবার অবকাশ নাই। মনোরমা একবার চিন্তাহরণের দিকে তাকাইয়াই ছুটিয়া গিয়া আপনার শয্যায় মুখ গুজিয়া পড়িল। অবরুদ্ধ ক্রন্দনে তাহার দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

চিন্তাহরণ বিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে বালক নয়, যুবকই; কিন্তু এই অভাবনীয় অবস্থার জন্য সে প্রস্তুত হয় নাই। বুঝিয়া উঠিতে পারে না—কেন, কি হইয়াছে, কি সে বলিবে, কি সে করিবে।

কিছু না বুঝিয়াই সে ধীরে ধীরে গিয়া মনোরমার পার্শ্বে বসিল। ধীরে তাহার মাথায় হাতখানি রাখিল, সেই ক্রন্দন-তাড়িত দেহ অমনি আরও ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে তাহা শান্তও হইল।

চিন্তাহরণ আপনা হইতেই মনোরমার কেশভার সমাকীর্ণ শিরে মমতামাখা হস্ত বুলাইতে লাগিল। কতক্ষণ ঠিক নাই, হঠাৎ মনোরমা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া অশ্রু-বিধৌত মুখ তুলিয়া চিন্তাহরণকে বলিল: আমাকে ক্ষমা করো! বলো, ক্ষমা করবে।

ক্ষমা!—চিন্তাহরণ আবার বিভ্রান্ত হয়, ক্ষমা কেন? কি হইয়াছে?

মনোরমা বলিল, না, না, তুমি জানো, বলো, বলো আগে ক্ষমা করলে। বলো।

চিন্তাহরণ বলিল, বেশ করলাম। এখন বলো কি হয়েছে?

মনোরমা বলিল, তুমি জানো আমি মূর্খ।

চিন্তাহরণ এবার একটু নিশ্চিন্ত হইল বলিল: না, তা আমি জানি না।

আমি লেখাপড়া জানি না।

না। তাও জানো। এবং চেষ্টা করলে আরও শিখতে পারবে।

মনোরমা উচ্চকিত হইয়া বলিল: পারব? যদি না পারি—?

চিন্তাহরণ নীরব। মনোরমা সোৎকণ্ঠে দৃষ্টিতে বলিল: বলো, বলো কি হবে—যদি না পারি? —বলিতে বলিতে সে উঠিয়া বসিল।

চিন্তাহরণ অনাবিল স্নিগ্ধ হাস্যে বলিল: তুমি 'বীর-বনিতাই' থাকবে।

মনোরমা তথাপি নিশ্চিন্ত হইতে পারে না—আর তুমি? তুমি আমাকে ত্যাগ করবে না?

চিন্তাহরণ সবিস্ময়ে বলিল: ত্যাগ করব! তোমাকে কি পাগলামিতে পেয়েছে বলো ত?

মনোরমা হঠাৎ তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া আবার ফোঁপাইয়া উঠিল; তুমি কেন ওর অমন প্রশংসা করলে?

কার?

ওই মেয়েটার?—মনোরমা নাম উচ্চারণ করিতে পারিল না।

ওঃ! —চিন্তাহরণ চমকিত হইল—এই তোমার মর্মপীড়ার কারণ! ছিঃ, ছিঃ, তুমি যাকে নিজে আশ্রয় দিয়েছ তোমার গৃহে—

কিন্তু আর নয়, আর নয়। শোনো—আমাদের এ গৃহে আমি আর কাউকে সহ্য করিতে পারব না—তুমিই আমার সংসার।

চিন্তাহরণ তাহা বোঝে। তথাপি মনোরমার ব্যাকুলতা সত্ত্বেও সে না বলিয়া পারিল না,—অত ছোটই বা কেন হবে তোমার সংসার?—সে ব্রাহ্ম ও সুষমাবাদী, বৃহৎ পৃথিবীর সকলের মধ্যে তাহার সংসার

পরিব্যাপ্ত না হইলে তাহার সার্থকতা কোথায়? মনোরমাকেও তাহা বুঝানো উচিত।

মনোরমাও বলিল, আমি ছোট বলেই বলছি। বড় হবার সাধ আমার নেই। তোমার মা আমাকে এই কথাটাই বুবিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তিনিও ত তাঁর সংসার বড় করে গড়তে গিয়েছিলেন—সে জানো। কিন্তু তাতে তাঁব সংসারে সবই ফাঁকি হয়ে গেল।

চিন্তাহরণ মুখ অবনত করিল। তাহার বিধবা মাসীমা ভগ্নীর সংসারে আসিয়াছিলেন বলিয়াই কি শেষ পর্যন্ত ভগ্নীপতির প্রণয়জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন? না, বিধবা, হৃদয়বতী সে নারীব ব্যাহত হৃদয়ধর্মই তাহার নিজের জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়াছে, তাহার স্নেহপালিতা সহোদরার সংসারকেও বিপর্যস্ত করিয়াছে? চিন্তাহরণ এই প্রশ্নের উত্তর জানে না। কিন্তু ইহা বুঝিতেছে—মনোরমা তাহাকে লইয়াই সংসার পাতিয়াছে। আরও ইহাও সত্য, স্বামী ও পত্নীকে লইয়াই সংসার—অন্যরা সেখানে হয় অলঙ্কার, নয় বিঘ্ন, অবান্তর। তাহাদের দুইজনার সেই যুগ্ম-জীবনকে এক আদর্শে গড়িবার জন্য একান্ত অবকাশও তাই প্রয়োজন—ইহা তাহার নিজের জীবনেরও দাবী। এই সহজ সত্যকে অস্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

চিন্তাহরণ বলিল, দ্যাখো, মা-মাসীমার দুর্ভাগ্যের রহস্য বোঝা অসম্ভব। জীবন বড় দুজ্ঞেয়, পৃথিবীও বড় বিচিত্র। কিন্তু তোমার আমার মাঝখানে এক বিধাতার সত্য ছাড়া আর কোনো জিনিসই আসতে পারবে না—সেই সত্যই আমাদের সংসার। অন্যদের দিয়ে কি হবে।

মনোরমা কি বুঝিল ঠিক নাই, হয়ত বুঝিল—তাহার অনেক প্রয়াসে পাওয়া এই সংসারে তাহারা আর তৃতীয় কোনো মানুষের অস্তিত্ব সহ্য

করিবে না, হউক সে গিরীশ, যে স্বামীব সহোদর, হউক সে শৈলী, —যাহাকে মনোরমা নিজের সহোদরার মত গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে।

চোখের জলেব ফাঁকে হাসিয়া সে বলিল: তুমি অন্য কোনো মেয়ের প্রশংসা করলে যে আমি সহ্য করতে পারব না।

চিন্তাহরণও হাসিল, বলিল, মানুষকে প্রশংসা করতে না পারলে যে নিন্দা করতে আবম্ভ করব ক্রমে। —তারপর বলিল সকল প্রশংসাই যে তোমাকে লক্ষ্য করিয়া, তুমিই সুভদ্রা সারথি। ধীরভাবে শেষে আবার বলিল: তুমি ছাড়া আর কোনো মেয়ের দিকে আমি চোখ তুলে চাই না। বিধাতা সহায় হলে তা চাইবও না—তুমিই প্রথম, তুমিই শেষ!

মনোরমা চিন্তাহরণের বুকে মুখ লুকাইল।

৯

মধু সেন গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন, মেঘাচ্ছন্ন মুখ, হাতে একখানা পত্র। তাঁহার এই রূপ মূর্ত্তি রাজীব কখনো দেখে নাই।

মধু সেন জিজ্ঞাসা করিলেন, চিত্রিসারের চিঠি পেয়েছিস্‌?

ভয়ে ভয়ে রাজীব জানাইল, হাঁ; মহেশ্বরীর চিঠি সে পাইয়াছে।

কি লিখেছেন তিনি? কেমন আছেন তাঁরা?

ভালো আছেন।

মধু সেন পত্রখানা সম্মুখের ডেক্‌সের উপর রাখিলেন। তারপব কি ভাবিয়া লইলেন, বলিলেন, শৈলীর বিয়ের কথা কিছু লেখেন নি?

রাজীব হয়ত বুঝিতে পারিল। বলিল, না। বোধ হয় তাঁর বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

একটু নীরব থাকিয়া মধু সেন বলিলেন, হয়নি। —তারপরে আবার নীরব। শেষে গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, কাউকে এখনো কিছু বলিস না—শৈলীকে পাওয়া যাচ্ছে না।

রাজীব এইমাত্র যাহা আশঙ্কা করিতেছিল তাহাই তবে হইয়াছে—শৈলী বিবাহের পূর্বেই জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহাকেও শৈলীদিদি এই সংকল্পই জানাইয়াছিলেন—বিভূতি যেন দাদাভাইকে সংবাদ দেয়; শৈলী কিছুতেই বাঁচিয়া থাকিতে এই বিবাহ করিবে না! বিভূতি সেই সংবাদ দিয়াছে, কিন্তু দেরীতে। হয়ত রাজীব সেই সংবাদ যথাসময়ে পায় নাই, তাই এইবার আর বাধাও দিতে পারে নাই। অভাগিনী শৈলীদিদি তাঁহার শপথ রক্ষা করিয়াছেন।

বিভূতি রুদ্ধস্বরে বলিল, তিনি আত্মহত্যা করলেন?

আত্মহত্যা? হাঁ, এক রকম তা'ই। কিম্বা তা হলেও ভালো ছিল! তা শুনবে পরে। এখন তোমার মেজখুড়া কি লিখেছেন, শোনো—'বিভূতির নাম কাটিয়া তাহাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিন। পড়াশুনায় আর তাহার প্রয়োজন নাই।'

সেকি!—বিভূতি স্তব্ধ হইয়া তাকাইয়া রহিল। কি হইল? কেন, এইরূপ তাহাদের সিদ্ধান্ত? সত্যই কি তাহার পড়াশুনা শেষ হইতেছে—তাহা হইলে?

বিভূতি বিমূঢ়ের মত কহিল,—নাম কেটে আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন?

দিতাম—তোমার মা লিখলে। কিন্তু আমি মধু সেন, আমিও তোমার খুড়ামশায়কে হাড়েহাড়ে চিনি। বজ্জাত! ভাইপোকে দু'মুঠো ভাত দিয়ে পড়াতে পারলেন না। এখন বড় হিতাকাঙ্ক্ষী হয়েছেন—পড়ে শুনে সেও ধর্মত্যাগ করবে, কুলে কলঙ্ক দেবে! —আবার মধু সেনের কি মনে পড়িল, বলিলেন, কিন্তু ওই রাজীবটা চৌধুরীবংশের রত্ন নক্ষ,—শত্রু। শৈলীর মাথাও সেই খেয়েছে, না? তোদের মাথা খেতে এসেছিল এখানে। পাজি! তখন ওকে ফাটকে দিলেই ঠিক হত। পারলাম না,—শিবপ্রসাদ চৌধুরীর ছেলে, চিত্রসারের চৌধুরী। কিন্তু ওর সেই বোধ নেই।

বিভূতি কিছুই বুঝিতে পারিল না, তাকাইয়া রহিল।

কি কথা বলছিস্ না যে? ওই ব্রহ্মজ্ঞানীদের দলে তোরাও আছিস্ নাকি? হাঁ, যাদব কোথায়? ওরে কে আছিস্, ডাক ত যাদবকে। —আবার শুরু করেন মধু সেন, —তোরা ত একদলের; কে তোদের এখানে মাতবর?—নিজেই বলিয়া চলিলেন,—ওই তোদের সেকেণ্ড মাস্টার মহিম দেবটা বুঝি? ওর বাড়িতেই চক্ষু বোজার সমাজ, নয়?

তাড়াতে হবে। ওসব বেহ্মজ্ঞানী টেম্মজ্ঞানী আমাদের ইস্কুলে থাকতে দেব না। তোরা পড়া ছাড়বি কেন, ওকে স্কুল ছাড়াব।

মধু সেন আপনা হইতেই বলিয়া যান,—মহিমটা মুখ্যু। ওর শ্বশুর নৃসিংহ দাস মানী মানুষ। বলেন, মোক্তার মশায়! জামাই ইংরেজি কি শিখেছে? বলে, 'মদ খাই না।' কেঁদেই আকুল নৃসিংহ—'এ কেমন ইংরেজি-জানা জামাই আনলাম ' —মধু সেন হাসিয়া খুন!

বিভূতি আর তখন শুনিতে পাইল না—চিত্রিসারে শৈলীদিদির কি হইয়াছে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত অবশ্য ব্যাপারটা বিভূতি জানিয়া ফেলিল। খুড়ীমা—যাদবের মাতা—জানাইলেন, শৈলী কুলে কালি দিয়াছে। তখন মধু সেনও দুই-এক পাত্র টানিয়া পাশা লইয়া আবার খোশ মেজাজে আড্ডা জমাইয়া বসিয়াছেন। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করিতেছেন একটু উচ্চকণ্ঠে: তখন ধরতে না পেরে থাকে, এখন করছে কি? পাইক নেই, লাঠিয়াল নেই?—বাড়ির মেয়ে চুরি করে নিয়ে গেল কে, কি করে, কিছু ঠিক নেই, তার কিছু করতে পারে না, এখানে ছেলেটার পড়া বন্ধ করতে হবে! কেন, কি হয়েছে? ওই সেকেণ্ড মাষ্টার মহিম দেব ব্রাহ্ম। একটা ব্রাহ্মের ভয়ে ছেলেদের পড়াশুনা বন্ধ করতে হবে। একটা ব্রাহ্ম মাষ্টার সমস্ত ছেলেদের মাথা খাবে? কেন আমরা আছি কেন? একা একটা মানুষ সে—এক ছটাক মদ খাবার মুরদ নেই যার—তার ভয়ে ইস্কুল তুলে দিই তা'হলে।—বলিয়া হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। —চণ্ডী ঘোষ, দেবী ভট্টাচার্য আছে কেন তবে?

বিভূতি আপন ঘরে বসিয়াও শুনিতে পায় সব কথা। তাহার আশঙ্কা লজ্জায় ও গ্লানিতে পরিণত হইয়াছে। সত্যই তাহা হইলে শৈলী দিদি ডুবিয়া মরে নাই; সাহস করিয়া বলে নাই—'এই বিবাহ আমি করিব না।' বরং গোপনে সে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে। উহার অর্থ

আরও ভয়ঙ্কর—শুধু ভয়ঙ্কর নয়, কলঙ্কর। খুড়ীমা শুধু বলিলেন 'কুলে কালি দিয়াছে।' কিন্তু একটা চাপা হাসিতে কথাটা আলোচনা করিতেছে চারিদিকে সকলে। রাজীবকে দেখিলেই যেন কথাটা তাহাদের মনে পড়িয়া যায়। কেমন একটা বক্র হাস্যে ও বক্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকায়—সেই চিত্রিসারের চৌধুরী বাড়ির বিভূতি শঙ্কর চৌধুরী সে,—যাহাদের ভাগিনেয়ী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে ;—আর অমনি কেমন তাহারা মুখ টিপিয়া হাসে।

বিভূতি আর গৃহের বাহির হইতে চায় না। কেন, কেন, শৈলীদি এমন করিল ? রাজীবের কথা বিভূতির মনে আছে। শৈলীকে বিভূতি তাহার কথা জানাইয়াছে—'সাহস চাই, সাহস চাই।' সেই সাহস ত শৈলীর হইল না। সাবিত্রীর মত, দময়ন্তীর মত, কৈ পারিল না ত শৈলী বলিতে—'আমি তোমাদের কথা মত কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিব না।' রাজপুতানার বীর কন্যার মত কই পারিল না ত—'পদ্মিনী উপাখ্যানের' পদ্মিনীর মত—জহরব্রত করিতে ? 'কৃষ্ণকুমারী নাটকের' কৃষ্ণ কুমারীর মত বিষপান করিতে ? তাহাই ত আর্য নারীর আদর্শ। আপনার সংকল্পানুযায়ী নদীতে ঝাঁপ দিতেও পারে নাই শৈলী। কি পারিল সে ? পারিল শুধু চিত্রিসারের সকল আত্মীয়ের মুখে কালি দিতে—'কুলে কালি দিতে'। এই কি আর্যকন্যা ?

আরও কয়দিন গেল। বিভূতি আরও মুষড়াইয়া পড়িল। চারিদিকের গোপন আলোচনা এখন খোশ গল্পে পরিণত। জানা গিয়াছে—শৈলীকে রাজীবই 'বাহির করিয়া' লইয়া গিয়াছে। কিন্তু তারপর ? আর জানিবার প্রয়োজন কি ? ইহাই ত যথেষ্ট।—কিন্তু দাদাভাই এমন কলঙ্কর কার্যে অগ্রসর হইল ? বিভূতি কুৎসিৎ কথা তাহার সম্বন্ধে বিশ্বাস করিবে না ; শৈলীর সম্বন্ধেও না। কিন্তু ইহা যদি সত্য হয় যে রাজীবই শৈলীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে আর

বিভূতির দুঃখের, গ্লানির ও যন্ত্রণার সীমা নাই। রাজীব চৌধুরী বীর,—তাহাদের আদর্শ বীর, শৈলীকে উদ্ধার করিবার আর কোনো পথ সে আবিষ্কার করিতে পারিল না?

যাদব সান্ত্বনা দিবার জন্য বলে বিভূতিকে, পথ আর কি ছিল?

কিছুই পথ ছিল না? —বিভূতি ক্ষেপিয়া যায়। বিভূতি অন্তত মনে করে এই কাপুরুষতার পথ রাজীবের জন্য নয়। গোপনে সে শৈলীকে রাত্রিতে আসিয়া চুরি করিয়া লইয়া গেল?—কেন, যে ফিরিঙ্গি সাহেবের সঙ্গে মারামারি করিতে পারিল, সে কি সাহস করিয়া ডাকাতি করিয়াও শৈলীকে উদ্ধার করিতে পারিত না? বীরের মত পারিত না সকলের সম্মুখে তাহাকে উদ্ধার করিতে? তাহাতে নিশ্চয়ই দাঙ্গা হইত, মারামারি হইত, সম্ভবত রক্তপাত হইত; কিন্তু পৃথিবীর কাছে মাথা উঁচু করিয়া বিভূতি বলিতে পারিত—রাজীব চৌধুরী একটা পুরুষ, সে চিত্রিসারের চৌধুরী,—দেবপ্রসাদ চৌধুরীর যথার্থ শিষ্য; শঙ্কর চৌধুরীর, সনাতন চৌধুরীর বীর বংশধর। —কিন্তু তাহা হয় নাই, সমাজ ও বংশের মুখে কলঙ্ক লেপন করিল রাজীব চৌধুরী।

যত দিন যায়, কথাটা মুখে মুখে তত বিশ্রী হইয়া উঠে। তত লোকের চাহনি ও কথার ইঙ্গিত বিভূতির নবাঙ্কুরিত কিশোর মনকে সহস্রভাবে বিদ্ধ করিল। তত তাহার বীরত্ব বিমুগ্ধ 'আর্য'-নামে নব গর্বিত মন, রাজস্থানের দুঃসাহসিক নর নারীর কাহিনীতে সদ্য-প্রবুদ্ধ তরুণ চিত্ত—রাজীব চৌধুরী ও তাহার আদর্শকে যাহা এতদিন আপনার সমস্ত পূজা নিবেদন করিয়াছে,—আজ হতাশ, বিক্ষুব্ধ দগ্ধবিদগ্ধ হইতে লাগিল। চৌধুরীদের ধর্ম, নীতি, সংস্কার-স্পৃহা, সাহস,—চিত্রিসারের চৌধুরী বাড়ির কত কত পুরুষের উচ্চ শির,—রাজীব একেবারে চূর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছে।

বিভূতির বীরত্বের আদর্শকেও রাজীব ধূলায় টানিয়া ফেলিয়া দিয়া গেল!

ক্রোধে ও অপমানে রাঘব চৌধুরী প্রথম দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়াছিল। শৈলী যে তাহার কবল হইতে পলায়ন করিতে পারিল,—এই চিত্রিসারের চৌধুরী বাড়ীতে সে রাঘব চৌধুরীর স্বয়ং বাড়ি থাকিতে এমন কাণ্ড ঘটিল,—ইহাই সর্বাপেক্ষা তাহার পক্ষে অপমানের কথা। কিন্তু যে করিয়াই হউক সে শৈলীকে ধরিবে, কুলকান্দির বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে বিবাহও দিবে। জেলে পাড়ার জেলেদের রাঘব ডাকাইল, মাঝিদের সংবাদ দিল, চারিদিকে লোক পাঠাইল। কিন্তু সংবাদ সে সংগ্রহ করিতে পারিল না—কি করিয়া কি ঘটিল। রাঘব চৌধুরী যত চীৎকার করুক, যাহারই মুণ্ডপাত করিবার সংকল্প করুক, কি করিয়া শৈলী চিত্রিসার হইতে পলায়ন করিল, কাহার নৌকায়, কাহার সহায়তায়, কি উপায়ে, কে এই ব্যবস্থা করিয়াছে,—কিছুই জানিতে সে সক্ষম হইল না। দিন গেল, রাত্রি আসিল; একে একে লোকজন ফিরিয়া আসে। কেহই শৈলী বা রাজীবকে পথে গ্রেফ্‌তার করিতে পারিল না। কোন্‌দিকে, কোন্ পথে যে শৈলী পালাইল, জানাই গেল না। রাঘব এবার থানায় খবর দিল। শহরেও লোক পাঠাইল—গাঙ্গুলীদের গৃহে খোঁজ করা দরকার। দিন তিন পরে সংবাদ আসিল—সত্যই, ঢাকায় সেই চিন্তাহরণ গাঙ্গুলীর গৃহেই সম্ভবত শৈলী অবস্থান করিতেছে। তারপর রাঘব শহরে ছুটিল, জিরতলীর দেওয়ান বসন্ত সরকারকে এখনি ধরিয়া পড়িতে হইবে। মামলা-মোকদ্দমার একটা সূত্র আবিষ্কার করিয়া রাঘব কতকটা উল্লসিতও হইল। মামলায় তাহার মাথা খেলে; এইবার সে দেখিবে কি করিয়া পালায় শৈলী এবং রাজীব।

কিন্তু ততক্ষণে চিত্রিসার কালচিতার গ্রাম্য সমাজের তলাকার যে পঙ্ক রাঘব চৌধুরী নিজে ঘোলাইয়া তোলে, তাহাও ঘোলাইয়া উঠিল।

শৈলী শুধু পলায়ন করে নাই, সে কুলত্যাগিনী, আর কুলত্যাগ করিয়াছে তাহার মাতুলপুত্র 'দাদা ভাই' রাজীব চৌধুরীরই সঙ্গে। এই সহজ কথাটা যে কোন্ অতি সহজ এবং কলঙ্ককর ঘটনারই প্রমাণ তাহা গ্রাম্য সমাজে কাহারও বুঝিতে এক মুহূর্তও দেরী হয় নাই। এবং সেই সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিবার মত লোকেরও তাই অভাব হইল না। কালচিতার সেনেরা এখন কার্য্যত এই সমাজের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছে—সে বাড়ির সেজ কর্তা কিছুদিন পূর্বে দারোগা হইয়াছে, ফলে তাহাদের প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। অপরদিকে বহু পুরুষের নাম ভাঙাইয়া রাঘব চৌধুরী যতই হাটে-ঘাটে আস্ফালন করুক, বিষয়-বিত্তের অভাবে চিত্রিসারে চৌধুরীরা ক্রমশই প্রতিপত্তি হারা'ইয়াছিল। চিত্রিসারের চৌধুরীদের সৌভাগ্য শিবপ্রসাদ-দেবপ্রসাদ স্বল্পকালের চাকরি দ্বারা উদ্ধার করিতে পারে নাই। এখনত তাহা বিলুপ্তির পথে;—নীলমাধবের পূজাই শুধু চলে। রাজীবের সাহায্যই প্রধান অবলম্বন। —আছে দুষ্কৃতিপরায়ণ রাঘব চৌধুরীর দৌরাত্ম্য, মুর্খ অনন্ত চৌধুরীর গায়ের বল; না হইলে কিছুই এই বাড়ির সম্বল নাই। তথাপি ব্রাহ্মণ ও এককালের ভৌমিক বলিয়া সেনেরা চৌধুরীদের একেবারে সমাজের নেতৃ-স্থান হইতে বাতিল করিতে পারে নাই। কিন্তু এইবার? সেন পক্ষীয় শিরোমণি মহাশয়েরা কালচিতায় 'নতুন ভুঞাদের' জানাইলেন—হাঁ, এইবার। চৌধুরী-পক্ষীয় শিরোমণি মহাশয়েরা অনন্ত চৌধুরীকে বলিল—ভাবনা কি? আমরা আছি।

সেন-পক্ষীয় শিরোমণিরাই আক্রমণ পরিচালনা করিলেন। যথা, কুলত্যাগিনী কন্যা যে গৃহের বা বংশের, তাহারাও অশুচি। অন্য প্রমাণ—দোষখণ্ডঃ।

চৌধুরী-পক্ষীয় শিরোমণিরা তৎক্ষণাৎ উত্তর জুড়িলেন, শৈলী শাস্ত্রত চৌধুরী কুলের কেহ নয়, সে তাহাদের আশ্রিতা ভাগিনেয়ী মাত্র,—

গোত্রান্তরিতা কন্যার তনয়া। দোষ ঘটিয়া থাকিলে ঘটিয়াছে শৈলীর পিতৃকুলের, সপিণ্ডদের। তস্য প্রমাণ—সপিণ্ড তত্ত্বং।

সেন-পক্ষীয় শিরোমণিরা বলেন, কুলটা কন্যা যে গৃহে অবস্থান করে তাহাতেও দোষ বর্তে। অতএব, চৌধুরীরাও উক্ত দোষদুষ্ট। অপিচ, রাজীব চৌধুরীও চৌধুরী বংশেরই সন্তান। শৈলীর সহিত অশাস্ত্রী গর্হিত সম্পর্কে সে দুষ্ট বিধায়—চৌধুরীরাও দুষ্ট বটে।

চৌধুরী পক্ষীয়রা উত্তর দেন, প্রথমত, রাজীব চৌধুরী বংশের কেহ নয়, সে ধর্মত্যাগী, সমাজ-দ্রোহী। অতএব, তাহার অপরাধ চৌধুরীদের স্পর্শে না। দ্বিতীয়ত, তাহার সহিত শৈলীর এবম্বিধ সম্পর্ক থাকার সাক্ষ্যাদিরও প্রমাণ নাই।

কি প্রমাণ আছে, কি নাই, এবং তাহা প্রমাণিত হইল কিম্বা হইল না, কি শাস্ত্র আর কি শাস্ত্র নয়, শাস্ত্র বচনেও তাহা স্থিরীকৃত হয় না। তবে স্বীকার করিতেই হইল—শৈলী যখন কুলত্যাগিনী শৈলীর মাতার পক্ষে তখন প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। উভয় পক্ষীয় শিরোমণিরাই একমত—ব্রাহ্মণকে গোদান, স্বর্ণদান, প্রভৃতি প্রয়োজন। কিন্তু উভয় পক্ষই বুঝিলেন, বিশেষ কড়াকড়িতেও তাহা সম্ভবপর হইবে না। চৌধুরীদের এখন সেই অবস্থা নাই; আর থাকিলেও রাঘব চৌধুরী এই ক্ষতি স্বীকার করিত না। শৈলীর মা এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন কিরূপে? অনেক বিচারের পর স্থির হইল,—ব্রাহ্মণবংশীয়া নিঃসম্বলা মাতার পক্ষে কন্যার পাপে গোময় ভক্ষণ যথেষ্ট। এবং প্রায়শ্চিত্ত বিধিতে শিরোমুণ্ডনের ব্যবস্থা থাকিলেও তৎপরিবর্তে তিন জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও চলিবে।

রাঘব চৌধুরীর ইহাতে আপত্তি নাই। শৈলীর দায় শৈলীর মায়ের, চৌধুরীদের তাহারা কে? পাপ!

কালচিতার সেনেরা অবশ্য সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইলেন না—রাঘবটাকে বাগে

পাওয়া গিয়াছিল; একঘরে করিবার মত একটা সুযোগ ছিল। দেবপ্রসাদ চৌধুরীর সময় হইতেই চৌধুরীরা সমাজে নানা বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলার সূচনা করিতেছিল। কিন্তু যাক, সমাজের চক্ষে তাহাদের মর্যাদা যে এইবার বিনষ্ট হইয়া গেল, তাহাও মন্দ নয়।

শৈলীর মা অন্ন-জল স্পর্শ করেন নাই, কাহাকেও মুখ দেখান নাই। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আসিয়া আবার তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন। মহেশ্বরী তাহাকে অন্নজল গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, প্রায়শ্চিত্তান্তে মুখে কিছু দিতে হয়, তাহা নিয়মও। কিন্তু শৈলীর মা আর উঠিতে চাহেন না।

মহেশ্বরী বলেন, কিন্তু বাঁচতে ত হবে, দিদি।

শৈলীর মা বলিলেন, আরও বাঁচতে হবে?—না, না, বাঁচিতে তাহার বড় ভয়।

মহেশ্বরী বলেন, কর্ম শেষ না হতে কে মরতে পারে?

বাহিরে রাঘবের কী চীৎকার শোনা যাইতেছিল। শৈলীর মা ভয়াত মুখে উৎকর্ণ হইলেন। রাঘবের কণ্ঠস্বর শুনিলেই তিনি আতঙ্কিত হন—বুঝি আবার কোনো দুঃসংবাদ আসিবে, নূতন গঞ্জনা তাহায় অদৃষ্টে জুটিবে। ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিযা তিনি মহেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার কি হল, বউ?

মহেশ্বরী বলিলেন, শহরের বড় দারোগা তার নালিশ নেয় নি, তাই ওদের ধরা গেল না।

শৈলীর মা চোখ বুজিলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। অস্ফুট শব্দ—ভগবান্!—চোখের পার্শ্বে দুই বিন্দু জল দেখা দিল। অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, কেন ওর মরণ হল না!

মহেশ্বরী তাহার হস্তধারণ করিয়া বলিল, ছিঃ, মা হয়ে তুমি এমন কথা মুখে আনলে ?

বুক ফুলিয়া উঠিতেছে ক্রন্দনে। শৈলীর মা পারেন না, আর সহিতে পারেন না। হঠাৎ ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, মুখেই আনছি, মনে আনতে পারি কই ?

মহেশ্বরী সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, মুখেও এনো না, মনেও এনো না।

কিন্তু মুখ যে দেখাতে পারিনা আমি ?

স্থির নিম্নস্বরে মহেশ্বরী বলিলেন, কেন ? বুড়ো বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে রাঘব তার বিয়ে দিতে পারল না বলে ? রাঘবের বদলে রাজীব তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছে বলে ?

শৈলীর মা মাথা তুলিয়া মহেশ্বরীর চোখের দিকে তাকাইলেন। কিছুই যেন বুঝিতে পারেন না, বুঝিবার মত সাহসও নাই। অবিশ্বাসের স্বরে বলিলেন, রাজীব তার ভার নিয়েছে ? তুমি ঠিক জানো ছোট বউ —আর কিছু নয় ?

মহেশ্বরী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিলেন, আমি কেন, তুমিই কি জানো না— রাজীব কেমন ছেলে ?—প্রাণ গেলেও সে অন্যায় করবে না।

শৈলীর মা আবার চোখ বুজিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন।— এ বাড়ির যে নাম মান সব গেল, ছোট বউ ! —কিন্তু এইবার তাঁহার কণ্ঠে আর খেদ নাই।

মহেশ্বরী বলেন, তোমার ভাই বলতেন, ছেলেমেয়েরা মানুষ হলে কিছু যাবে না। তাঁরা বেঁচে থাক, ছেলেরা মানুষ হোক।

শৈলীর মা চোখ বুজিলেন। নিজের মনে মনে বলিতে লাগিলেন, যাবে না। ওরা 'বেঁচে থাক, মানুষ হোক', 'বেঁচে থাক্, মানুষ হোক্'।

মহেশ্বরী বলিলেন, কি বলছ দিদি। ওঠো, খাও।

শৈলীর মা মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—না। অস্ফুট শুভ কামনায় তাঁহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল—'বেঁচে থাক, মানুষ হোক্।'

কিছু খাইতে চাহেন না আর শৈলীর মা। এবার তিনি মরিতে চাহেন। বাঁচিতে তাঁহার ভয়। কিন্তু বাঁচিয়া থাক অন্য সকলে—শৈলীও, রাজীবও।

খাইতে না চাহিলেও কিছু খাইতে হয়। মরিতে মরিতেও মানুষের অনেক দিন লাগে—শৈলীর মায়েরও অনেক দিন লাগিবে।

মোকদ্দমার নামে রাজীব উৎসাহিত হইয়া উঠিল—শহরেও জিরতলীর দেওয়ান সাহেব আছেন, উকিল মোক্তারের অভাব হইল না। কিন্তু ইংরেজ হাকিম প্রথমেই তাহার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিল। রাঘব চৌধুরী শৈলীর অভিভাবক, না, রাজীব চৌধুরী অভিভাবক তাহা অমীমাংসিত রহিল। রাজীব এবার শৈলীর বাপের সন্ধানে বাহির হইল। উজীরপুরের গ্রামে তখন চাটুজ্জে মহাশয় তাঁহার এক শ্যালক ভবনে আসীন হইয়াছেন—এখন চলাফেরায় বিশেষ উৎসাহ নাই। তবে রাঘব চৌধুরী টাকা দিতেছে, সে-ই মামলা করিবে, চাটুজ্জে মহাশয়েরই বা নালিশ করিতে আপত্তি কি? অতএব, তিনি শৈলীর বাপ, সদরে গিয়া এজাহার, দরখাস্ত যাহা কিছু প্রয়োজন তাহাতে সই দিয়া প্রার্থনা করিলেন, তাঁহার নাবালিকা কন্যা শ্রীমতী শৈলবালা দেবীকে অবিলম্বে তাঁহার নিকট ফেরৎ দেওয়া হউক, এবং নাবালিকা হরণের দায়ে রাজীব চৌধুরী, ও অসদুদ্দেশ্যে নাবালিকা হরণ করিবার দায়ে চিন্তাহরণ গাঙুলী তস্যস্ত্রী মনোরমা দেবী, গিরীশ গাঙুলী প্রভৃতি বিবাদী দিগকে অভিযুক্ত করিয়া দণ্ডদান করা যায়। —ইংরেজ হাকিম পুলিশের প্রতি যথা নিয়মে রিপোর্ট করিবার আদেশ দিলেন।

এই দ্বিতীয় দফা যুদ্ধায়োজন করিয়া রাঘব চৌধুরী গ্রামে ফিরিল, আস্ফালন করিতে লাগিল, এইবার সমস্ত কুলাঙ্গারদের ফাটকের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

পুলিশ কিন্তু যথাসময়ে রিপোর্ট দিল—মাষ্টার চিন্তাহরণ গাঙ্গুলীর গৃহে তাঁহার স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো রমণী নাই। তাহারা বলে, রাজীব চৌধুরীর সঙ্গে তাহার প্রাপ্ত-বয়স্কা ভাগিনেয়ী কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে।

রাজীবদের বিরুদ্ধে মামলা উঠিবার পূর্বেই কলিকাতায় শ্রীমতী শৈলবালা দেবী সশরীরে উপস্থিত হইল,উকিল এটর্নির মারফৎ জানাইল—সে সাবালিকা, বৃদ্ধ কুলীনের সঙ্গে জোর করিয়া তাহার মাতুল পুত্র রাঘব চৌধুরী তাহাকে বিবাহ দিতেছিল, সে উহাতে সম্মত নয়, মামাত ভাই এর বে আইনী জুলুম জবরদস্তি অন্যায়, ও বৃদ্ধ বহুবিবাহিত কুলীনের সহিত বিবাহ দিবার চেষ্টার বিরুদ্ধে, আত্মরক্ষা করিবার ইচ্ছাতেই, সে স্বেচ্ছায় চিত্রিমায়ের চৌধুরী গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়া সমাজ সংস্কারকদের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অবসরপ্রাপ্ত সদরওয়ালা, স্বনামখ্যাত ব্রাহ্ম বাবু শরৎ গুপ্তের পরিবার তাঁহাকে মায়ের মত স্নেহে রক্ষা করিতেছেন। শৈলীর দরখাস্ত যাহারা উপস্থিত করিল তাঁহারাও প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষিত, গুণী, সম্মানিত মানুষ। প্রথমে দাঁড়াইল তাহার স্বপক্ষে দুর্ধর্ষ ব্রাহ্ম উকিল, পরে ব্যারিষ্টাররাও যোগদান করিবে, তাহারাও প্রস্তুত আছে।

হরকান্ত দত্ত ঢাকায় চুপ করিয়া ছিলেন না—ইংরেজ হাকিমও তাই ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। হুকুম দিলেন—কলিকাতাতেই মামলা হইবে। কলিকাতা শহরে মামলা, রাঘবের কে আছে? জিরতলীর উকিলেরা দেওয়ান সাহেবের লেখা মত মামলায় দাঁড়াইবে।

চ্যাটুজ্জে মহাশয় কলিকাতা পৌঁছিয়া শহর দেখিয়াই একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। আর আদালতে উপস্থিত হইতেও তাহার সাহস নাই।

না, টাকা দিলেও তিনি রাজী নন। কালীঘাটে পূজা দিয়াছেন, গঙ্গাস্নান করিয়াছেন—বস, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কোথায় কে শৈল, তাহার না কাহার মেয়ে, উহার জন্য এই শহরে হাঁটাহাঁটি করিবার তাহার কোনো গরজ নাই। আর ইহাত শহর নয়, রাক্ষসপুরী। উকিলেরা ভয় দেখাইল—না গেলে মিথ্যা মামলা দায়ের করিবার জন্য তাঁহারই শাস্তি হইবে। অগত্যা সেই ভয়ে তিনি প্রস্তুত হইলেন। আরও কিছু টাকা লইয়া, মা কালীর নাম এক হাজার আটবার জপ করিয়া, চ্যাটুজ্জে মহাশয় ছাতা বগলে করিয়া, কাঁধে চাদর ফেলিয়া কোর্টে উপস্থিত হইলেন;—পায়ে নূতন চটি, রাঘব কিনিয়া দিয়াছে, না হইলে তিনি কুলীন ব্রাহ্মণ, কি করিয়া আদালতে যান? হাকিমেরাই বা বলিবে কি?

কিন্তু হাকিমও জবরদস্ত। উইলিয়মসন খাঁটি ইংরেজ, অর্থাৎ বাঙলা জানেন, বাঙালী সমাজকে জানেন, এবং আরও জানেন—ইংরেজি শিক্ষা অবশেষে বাঙলা দেশে মানুষ তৈয়ারী করিতেছে। কেশবচন্দ্র সেন বিলাতেও সম্মান অর্জন করিয়াছেন, 'ক্রিশ্চিয়ান নন' গ্রেট্ রিফর্মার;—'পাঞ্চ' পর্যন্ত তাঁহাকে লইয়া ছড়া কাটে। তাঁহার চেষ্টায় রিফর্ম শুরু হইয়াছে; নূতন চর্চ গঠিত হইয়াছে। অর্থোডোক্স নেটিবরা যে এই এনলাইটেন্ড নেটিবদের উপর কিরূপ নির্যাতন করে তাহাও উইলিয়ামসন্ বিলক্ষণ জানেন;—তাঁহাদের একঘরে করে, সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করে; ইভন্ ওয়াইভ্সদের পর্য্যন্ত হাসব্যাণ্ডদের নিকট হইতে সেপারেট করিয়া রাখে—ব্রিটিশ ল থাকিতেও! ইহাও তিনি জানেন—এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষেরাই সিপাহী বিদ্রোহ বাধায়; প্রেসে ডিস্-এ্যাফেক্‌শান প্রচার করে, তাই ভার্ণ্যাকুলার প্রেস এ্যাক্ট পাশ করিতে হয়। অপরদিকে কেশব চন্দ্রের চর্চের ক্রিড লয়াল্‌টি টু দি কুইন; ব্রিটিশ শাসন 'গডস ডিস্‌পেনশান্'—তিনি তাহা প্রাণে মনে প্রচার করেন। হার মেজিষ্টিস্ গবর্ণমেণ্ট ইন্ ইণ্ডিয়া কি তাঁহার

বিশ্বস্ত প্রজাদিগকে চিনিবে না? ময়্যালিটি, রিফর্ম ও এন্‌লাইট্‌ন্‌মেণ্টের পক্ষ আইন সমর্থন করিবে, না, সমর্থন করিবে সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ডিস্‌লয়েল নেটিবদের জঘন্য কুপ্রথা, অত্যাচার, হীন চক্রান্ত?

অনেষ্ট ও এ্যাডভান্‌স্‌ড ভিয়্যুব একজন খ্রীষ্টিয়ান জেণ্ট্‌লম্যান নিযুক্ত করিয়া শৈলবালার মতামত নির্ধারিত করিবার হুকুম হইল। ততদিন সে থাকিবে নিশ্চয়ই বাবু শরৎ গুপ্তর বাড়িতে,—'ইয়ং লেডির' পক্ষে এমন হেল্‌থি হোম্‌ আর কি হইতে পারে? না হইলে অবশ্য মিশনারিদের রেস্ক্যু হোম্‌-এও তিনি তাহাকে পাঠাইতে পারেন—যদি 'গার্ল' অন্য রকমের অর্থাৎ দুশ্চরিত্রা বলিয়া প্রমাণিত হয়।

কমিশনারের রিপোর্ট যাহা আসিল তাহা প্রত্যাশিত। তবু জাষ্টিস্‌ করিবার জন্য ফরিয়াদীদের তলব হইল।

চ্যাটুজ্জে মহাশয় কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই কাঁপিতেছিলেন।

হাকিম যখন কঠোর মুখে নিজেই প্রশ্ন শুরু করিলেন—কয় বিবাহ বলিলে তোমার? তের?—চৌদ্দ নয়, ঠিক মনে আছে? —তারপর, নাম বলিতে পার স্ত্রীদের? না! ইয়েস্‌ ইয়েস্‌,—বাদীর উকিল পক্ষকে সাহেব বলেন--ওঃ। তোমাদের সমাজে স্বামীরা স্ত্রীদের নাম ধরিয়া ডাকেন না। কিন্তু কার মেয়ে, কে সেই স্ত্রীরা, তা বলতে পারে? ওঃ, তাদেরও বাপ কুলীন, হয়ত জীবনে কন্যাদের দেখেন নাই—সত্য কথা। কাজেই নিজ স্ত্রীদের পিতার নামও সাক্ষী জানেন না। কিন্তু সেই কুলীন কন্যার পিতাই তবু তাহার অভিভাবক, না? যেমন, সাক্ষী তাহার কন্যার অভিভাবক। আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি দেখিয়াছ তোমার মেয়েকে, ওল্‌ড চ্যাটুজ্জে? দেখিয়াছ? সনাক্ত করিতে পারিবে? পারিবে না। ওঃ! গত দশবারো বৎসরের মধ্যে আর তাহাকে দেখো নাই? তখন তাহার বয়স কত ছিল? পাঁচসাত বৎসর? বেশী? সে মামাদের বাড়িতেই বরাবর থাকিতেছে? তাহা হইলে মামারাই তাহার

ভরণ-পোষণ করিত? তাহারাই দেখিত শুনিত, না? তাহারাই অভিভাবক,—কেমন?—তুমি এখানে তবে কি যুক্তিতে আসিয়াছ?

চ্যাটুজ্জে এবার কাঁদিয়া ফেলিল, ওঃ রাঘব! আমাকে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে! হুজুর, ধর্মাবতার, আমাকে ছেড়ে দিন্—আমি কিছু জানি না, চাই না।

হাকিম বলিলেন, বেশ, তোমার মেয়ের কি হবে?

হুজুর, আমি তাকে চাই না, সে আমার মেয়ে নয়।

কি বললে, তোমার মেযে নয়?—ইংরেজ হাকিম অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করিলেন।

জিরতলীর উকিল বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন—গ্রামের বৃদ্ধ লোক, ভয়ে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, হুজুর। —হুজুরও অবুঝ নহেন! না হইলে মিথ্যাবাদিতার জন্য উহাকে অভিযুক্ত করিতে হইত। যাহাই হউক, চাটুজ্জে ওই লেডির অভিভাবক নয়, অভিভাবক বরং মামারা। এবং মামাদের একজন বাদীর সাক্ষী আর একজন আসামী! —রাঘবকো বোলাও।

যতই মামলায় উৎসাহী হউক, রাঘব ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু জিদ্ ছাড়িতে পারে নাই। উপায়ও নাই। বেশ সাহস দেখাইয়া গিয়া সে দাঁড়াইল। সাহসের সঙ্গেই নিজের উকিলের প্রশ্নে জানাইল—তাহারা চিত্রিসারের চৌধুরী, মস্ত বড় সম্মানিত ঘর, চিত্রিসায়ের প্রতিষ্ঠাতা। সিংহবাহিনীর স্থাপয়িতা, নীলমাধব তাহাদের গৃহদেবতা, কত জন তাহাদের পরিবারে পোষ্য, ইত্যাদি। শৈল তাহার ভাগিনেয়ী; সে বালিকা, তাহাদের দ্বারাই প্রতিপালিত। তাহাকে চুরি করিয়া অন্য কেহ বিবাহ করিতে চায়, এখন তাহারাই তাহাকে নানাভাবে প্রলোভিত ও প্ররোচিত করিতেছে। ইত্যাদি।

জেরা আরম্ভ হইলেও রাজীবের সাহস একেবারে উড়িয়া যায় না।

আসামীর ব্যারিষ্টার তুখোর মানুষ। জেরা করেন—তুমি রাজীব চৌধুরী? করোকি? পেশা কি?—রাঘব জানায়—ভূম্যাধিকারী।

কত টাকা খাজনা দাও সদরে?

রাঘব স্মরণ করিতে পারে না। বিপক্ষ দল হাসিয়া উঠিল। জিরতলীর উকিল ব্যাখ্যা করিতে চাহিল—খাশে জমি আছে, জলকরের আয় আছে। প্রতিপক্ষ তাহাও প্রশ্ন করিয়া উড়াইয়া দিল,—আসলে, চৌধুরীদের 'ভূম্যধিকারী' বলা চলে না।

প্রশ্ন হইল: তুমি আর কিছু করো—'জমিদারী' দেখা ছাড়া।

রাঘব ভাবিয়া বলিল: হাঁ, স্কুল চালাই।

স্কুল চালাও? কি পর্য্যন্ত তুমি পড়েছ?

ছাত্রবৃত্তি—সঙ্গে সঙ্গে জানাইল—পরীক্ষা দিই নাই।—কিন্তু না বুঝিয়া রাজীব বিপদে পড়িল।

ছাত্রবৃত্তিতে কি পড়িতে হয়?

রাঘব চেষ্টা করিল মনে করিতে। কিন্তু ততক্ষণে আরও প্রশ্ন আসিয়াছে। চারিদিকে হাসি উঠিতেছে। কে বলিল—কেন ওই সব কথা। বললেই হত 'কিছু করি না'।

রাঘব ইঙ্গিত বুঝিল। বলিতে গেল এখন আমি পড়াই না। রোহিণী চক্রবর্তী পড়ায়।

তখনি প্রশ্ন হইল: আগেও তুমি পড়াও নাই?

না। সময় হত না।—আবার সকলে হাসিল। তারপর নূতন প্রশ্ন ও উত্তর।

ওঃ! তোমাদের এত বড় পরিবার তাহলে চলে কিরূপে? তোমার মেজখুড়া সাহায্য করেন। আর কেউ করে না?

রাজীব বুঝিল, বলিল: না।

এই রসিদগুলিতে কাহার স্বাক্ষব? তোমার স্বাক্ষর?

রাজীবের প্রেরিত টাকার রসিদ তাহার চোখের সম্মুখে ধরিল পেশকার।

রাঘব নীরব। প্রশ্ন হইল, তুমি স্বাক্ষর করতে জানো না, না?

কে বলে?

না হলে এ স্বাক্ষর চিন্‌তে পার না কেন?

পারি। ও আমার লেখা।

আর এ টাকা মাসের পর মাস তুমি পেতে রাজীব চৌধুরীর কাছ থেকে?

রাঘব নীরব। আবার প্রশ্ন,—আসলে পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য সাহায্য করে রাজীব চৌধুরী?

রাঘবের জিদ্ যায় নাই। বলিল, মিথ্যা কথা।

তুমি কি সাহায্য করতে, প্রমাণ দাও।

রাঘব ভাবিয়া পায় না। —চাষবাস দেখতাম, বাড়িঘর দেখতাম।

কি রকম দেখতে?—এইবার আসল প্রশ্ন আসিল।

শৈলবালা তোমার ভাগ্নী, তাকে দেখতে না?

হাঁ।

তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছ? তুমি শিখিয়েছ?

হাঁ।

কেমন শিখেছে? পড়তে পারে, লিখতে পারে,—কতদূর লিখতে পারে? চিঠিপত্র লিখতে শিখিয়েছ?

হাঁ। তা শিখেছে।

রাজীবের নামে শৈলর চিঠি এবার দাখিল হইল।

যে রহস্য পূর্বেই রাঘব অনুমান করিয়াছিল, এবার তাহা পরিষ্কার

বুঝিল। অবিলম্বে আবার জেরা চলিল, শৈল'র বিবাহের সম্বন্ধ তুমিই স্থির করেছিলে ?

রাঘব সতর্ক হইল,--কথাবার্তা চলছিল।

কোথায় বলো ত ?

উকিলের শিক্ষা মত রাজীব বলিল ; অনেক খনেই কথা চলছিল। কুলীনের মেয়ে, পণের প্রশ্ন আছে। তাই নানা খানেই চেষ্টা হচ্ছিল।

কুলকান্দির বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে প্রস্তাব পাকা হয়েছিল ?

কথা হয়েছিল, পাকা হয়নি।

তোমার মত ছিল ? বায়না করেছিলে—এই যে স্বাক্ষর।—সেই কাগজ বাহির করে প্রতিপক্ষ।

রাঘব বিপন্ন হইল, হাঁ। শৈলীর মা এইখানেই বিবাহ দিতে চান। বাঁড়ুজ্জেরা তাঁদের পাল্টা ঘর।

মা চান ? তুমি চাও নি ?

হাঁ, না।

হাঁ, না, না ?—উকিল ধমক দিলেন।

না।

আপত্তি থাকলেও সই করেছিলে কেন ? —বেশ, তোমার আপত্তি ছিল, তা বলেছিলে ?

হাঁ।

আর, শৈলরও তোমার মত আপত্তি ছিল।

রাঘব সাবধান হইল। বলিল : না।

না, কেন ?

সে ছোট মেয়ে। তার মায়ের কথায় চলে।

ছোট মেয়ে ? কত তাহার বয়স ?

বারো বৎসর।

সেদিকে আগেই রিপোর্ট আসিয়াছিল—কমিশনার ছাড়াও খ্রীষ্টান মেম ডাক্তারকেও হাকিম পূর্বেই এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইবার হাকিম ক্ষেপিয়া গেলেন, জানাইলেন, ছাখো, ঠিক বুঝিয়া কথা বলো। না হইলে এইরূপ মিথ্যা সাক্ষের জন্য তোমাকে দণ্ড পাইতে হইবে।

কত বয়স শৈলর ?

রাঘব ঘাবড়াইল। বলিল, না, হিসাব করে দেখছি; চৌদ্দ বৎসর।

আবার হিসাব করো—পনের বৎসরও হইতে পারে, না ?—রাঘব বুঝিতে পারে না।

ষোল ?—রাঘব কথা বলে না। ঘাবড়াইয়া হিসাব করিবার নামে বলিল, কয় বৎসরে ষোল বৎসর হয় ?

তুমুল হাসির সৃষ্টি হইল। রাঘবও কিছুতেই নিজেকে আর সামলাইয়া লইতে পারিল না। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল : আমার ভাগ্নীর বয়স আমি জানি না, তোমরা শ্যালারা জানো ?

কি, কি ?—হাকিম কথাটা অনুবাদকের মুখে ইংরেজিতে শুনিলেন। 'শ্যালা শব্দটা' তাহার অপরিচিত নয়। তিনিও ত সময় মত তাহা ব্যবহার করেন। তাই তিনি গর্জন করিয়া উঠিলেন। —বলিতেছি, তোমাকে আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি দিতে পারি। সাবধান হও। তোমাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্যেও শাস্তি দিতে পারি। আর, মিথ্যা মোকদ্দমায় অন্যদের জড়াইবার জন্যও শাস্তি দিতে পারি। কি চাও তুমি, বলো ?

রাঘবের ক্রোধ আবার তেমনি ভয়ে পরিণত হইল। হাকিম আবার হাঁকিলেন,—কি, কি চাই তোমার ?

রাঘব এবার ভাঙিয়া পড়িল। —কিছুই চাই না। শুধু রাজীবের দণ্ড চাই। সে আমাদের মুখে চুণকালি দিয়েছে।

এবার কেহ হাসিতে পারিল না। কিন্তু হাকিমের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল—আসল কথা, সেই সংস্কারবাদী যুবকদের উপর পৌত্তলিকদের প্রতিশোধ তোলা।

তুমি তা হলে তোমার ভাগ্নীকে ফেরত চাও না?

না। সে কুলটা। আমাদের বাড়িতে তার স্থান নেই।

সিদ্ধান্ত প্রায় স্থির হইয়া ছিল। বাদীদের মামলা যে আসলে অমূলক, তাহা শৈলীর কথাতেই প্রমাণিত হয়, এবং উহা যে অন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত, এবং রাঘব চৌধুরী যে বস্তুত অভিভাবক নয়, অভিভাবক হইবার যোগ্যও নয়,—তাহার নিজের কথাতেই তাহা প্রমাণিত। রায়ে শুধু এই বলিয়াই উইলিয়মসন ক্ষান্ত হইয়াছেন—"দেশে আজ রিফর্মের চেষ্টা দেখা দিয়াছে। এই সময়ে নানারূপে শিক্ষিত লোকদের অপদস্থ করারও চেষ্টা হইতেছে। ব্রিটিশ সরকার তাহার দায়িত্ব ভুলিবে না, ব্রিটিশ জাষ্টিস্‌ও কিছুতেই পরাজিত হইবে না।" মুখে তিনি বাদী-বিবাদী সকলকেই সাবধান করিয়া দিতে ছাড়িলেন না: "এই মামলায় বাদীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্যের অভিযোগ আনিলাম না। কিন্তু জানিও, অনেষ্ট রিফর্মারস্ হ্যাড্ নাথিং টু ফিয়ার। ব্রিটিশ জাষ্টিস্ উইল ষ্ট্যাণ্ড বাই দেম—এজ্ বাই এভ্রি লয়েল সাব্জেক্ট অব্ হার মেজিষ্টি।"

হরকান্ত দত্তের বিশ্বাস অমূলক নয়।

১০

মনোরমা এইবার পড়াশুনায় বেশ উৎসাহ বোধ করিল। কারণ, মনোরমা আজ জানিল—চিন্তাহরণ তাহাকে লইয়া সুখী, আর ইহার মত সুখ মনোরমার আর কি হইতে পারে? এই সুখের আস্বাদনে মনোরমা আজ বাঁচিয়া উঠিল। লেখাপড়া শিখিতেও তাহার আজ সুখ। সত্যইত, কত গল্প, কত কথা, কত কাহিনী,—কত দেশ-বিদেশের ঘটনা, সূর্য-চন্দ্রের কথা হইতে জলস্থল আকাশের কত বৃত্তান্ত। আদিম মানুষের কথা হইতে বেদ-উপনিষৎ পার হইয়া বুদ্ধ, যীশু, সম্বলিত কত যুগের কত মহাপুরুষের সাধনার, রাজার রাজত্বের, বীরের দিগ্বিজয়ের, দেশের ও জাতির পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনী। আর মানুষের সুখ দুঃখের, প্রেম-প্রীতির, আনন্দবেদনারই বা কত বিচিত্র নিবেদন! 'বিধাতার মহদভি-প্রায়ের ক্রম বিবর্তন' চিন্তাহরণ তাহার মনের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া ধরিতেছে। আর তাহাতেও সত্যই পরম সুখ।

আসলে সুখ আজ মনোরমার সর্বাঙ্গ বাহিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে। আপনারই মধ্যে মনোরমা তাহা অনুভব করিতে পারে—সে ত আর একা নাই। তাহার মধ্যে আর একটি নবাঙ্কুরিত প্রাণ দিনে দিনে তাহারই দেহে দেহ মিশাইয়া উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে। এমন সুখ আর কি আছে জীবনে?—মনোরমার কতদিনকার স্বপ্ন যে ইহা।

ঝড়ের মুখে রাজীব দুর্জয় তেজে পাড়ি জমাইয়াছিল। যতদিন মামলা চলিয়াছে ততদিন একবার ছুটিয়াছে কলিকাতা, আবার আসিয়াছে ঢাকা। অর্থ, উদ্যোগ, সাহস কোনো জিনিসেরই অভাব

হয় নাই। সমাজের কর্তৃপক্ষ ব্রাহ্ম সমাজের বিপুল প্রভাব ও সমস্ত শক্তি দ্বারা রাজীব ও শৈলীকে সহায়তা করিয়াছে বলিয়াই তাহাদের জয়লাভ হইয়াছে। চারিদিকেই তাহার জন্য হাত বাড়াইয়া দেয় নব জাগ্রত যুবক শক্তি। ঢাকা মেসের ছাত্ররা তাহাকে 'হেরো' করিয়া তুলিয়া নিজেরাও উৎসাহে প্রত্যেকেই 'হেরো' হইয়া উঠিতে চাহে। শ্রীহট্ট মেসের ছাত্ররা ঢাকা-ওয়ালাদের পিছনে পড়িয়া যাইবে না, রাজীবকে তাহারাও মেসে লইয়া গিয়া আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতে ত্রুটি করে নাই।

শরৎ গুপ্তের ত কথাই নাই। এখনো তিনিই বলিলেন, তুমি যাও না ঢাকায়, তাতে কি? শৈল আমাদের এখানেই থাক্‌বে—পড়াশুনা করবে। গিরীশও জানায়, শৈলর খোঁজখবরের ভার সে গ্রহণ করিতেছে। রাজীব ঢাকা ফিরিবে—কারণ, শৈলীর দায়িত্ব ত সে-ই গ্রহণ করিয়াছে, যে ই যত সহায়তা করুক, এই দায়িত্ব রাজীবের নিজের। তাই রাজীবের এখন প্রধান প্রয়োজন অর্থার্জন—চিরকাল শৈল অন্যের গৃহে প্রতিপালিত হইতে পারে না। রাজীবেরও তাহা সহ্য হইবে না, শৈলরও তাহা উচিত হইবে না।

শরৎ গুপ্ত তাহা বুঝিয়াই বলেন, ঠিকই ত। তোমারও সম্মান আছে শৈলরও সম্মান আছে। যখন তুমি ভার গ্রহণ করতে পারবে তখন আমিই বলব—'এইবার তোমার উপর ভার'।

কিন্তু শুধু শৈলর দায়িত্বও নয়, দেশের নানা দিক হইতেই এমন তাহাদের প্রয়োজন—তাহাদের জন্য আহ্বান। যুগের জোয়ার আজ দেশের নানা দিকে বহু যুগ সঞ্চিত আবর্জনা ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে; দেশ এই আহ্বানের অপেক্ষায় জাগিয়া বসিয়া আছে। বিশেষ করিয়া আবার ব্রাহ্ম সমাজই আজ বিধাতার মহদভিপ্রায়ের মূর্ত বিগ্রহ। একমেবাদ্বিতীয়ম্‌এর মন্ত্রে—এক ধর্ম, জাতি, এক রাষ্ট্র গঠনের সমস্ত

দায়িত্ব, তাহাদেরই! ধর্ম সংস্কারের, সমাজ-সংস্কারের, জাতি-গঠনের সেই সাধনা আর কাহারও নয়। দেশে স্কুল চাই, স্ত্রীশিক্ষা চাই, সস্তা সংবাদপত্র চাই, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চাই, সত্য ও ন্যায়ের সমর্থন চাই, এবং সর্ববিষয়ে অগ্রণী তাহারা। পিতা মাতার মতের বিরুদ্ধে দুর্জয় সাহসে কে বিধবা-বিবাহ করিবে?—ব্রাহ্মরা সহায় হইবে। অসৎপথ গামিনীর পুনরুদ্ধারে কে সহায় হইবে? ব্রাহ্মরাই কেহ। সেই ভগিনীকে তাহারা উদ্ধার করিবে, নিজ গৃহে সসম্মানে আশ্রয় দিবে, গুণ্ডাদের সহিত মারামারিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না, তারপর সসম্মানে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিবে সেই ভাগ্য-বিড়ম্বিতা মহিলাকে। কোথায় কোন পতিতা নারী আশ্রয় প্রার্থীনী;—কে যাইবে সেই দুর্গম পিচ্ছিল পথে অভাগিনীর হস্তধারণ করিয়া পাপের পঙ্ক হইতে তাহাকে মানুষের মুক্ত বায়ুর দেশে ফিরাইয়া আনিতে? ব্রাহ্মরাই কেহ। তাহারাই তাহাকে স্বগৃহে স্থান দেয়, নানা জটিলতা, উপহাস ও বিড়ম্বনা মাথা পাতিয়া লয়,—মামলা-মোকদ্দমা, বিপদ-আপদে ভ্রূক্ষেপও নাই। কলিকাতায় রাজীব এই বহুবিধ প্রয়াসের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া দিনের পর দিন আরও উৎসাহিত বোধ করিয়াছে। ধর্মের উপরে, সমাজের উপরে, এবং বিশেষ করিয়া যুবক-বৃদ্ধ সকলের সমাদরে নিজের কর্মশক্তির উপরেও তাহার স্বাভাবিক বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইয়াছে। সেই আত্মবিশ্বাস লইয়া সে ঢাকা ফিরিল। —এইখানেই তাহার কর্মক্ষেত্র।

পূর্ববাঙলাও সত্যই টলমল করিতেছে। ঢাকাতেও এই আন্দোলনের তরঙ্গাঘাত তেমনি লাগিতেছে।

শৈলর ব্যাপারের পর হইতে ঢাকায় চিন্তাহরণকেই সকলে এইরূপ উদ্যোগের কেন্দ্র বলিয়া গণ্য করে। তাহার গৃহই সমাজ-অত্যাচারিতদের প্রধান আশ্রয়; আর মনোরমাই সকলের চক্ষে সেই সহৃদয়া আশ্রয়দাত্রী।

নিত্য নূতন কুলীন কন্যা শৈলর মত আশ্রয় প্রার্থীনী হয় না,—হইলে হয়ত তাহা দুঃসহ হইত, কিন্তু চিন্তাহরণের গৃহ ধর্মপ্রাণ, সংস্কার কামী যুবকদিগের আশ্রয়। —মনোরমা মুক্তহস্ত, সদাশয়া।

বিড়ম্বনাও আছে। কারণ, মনোরমা বড়বাড়ির কর্ত্রী, কেহ ভিক্ষাপ্রার্থী হইলেও বিমুখ করিতে পারে না। কতদিন ঠিক আহারের পূর্বেই আসিয়া কেহ হয়ত দাঁড়ায়—মা অন্নপূর্ণা, খেতে দাও। মনোরমার আর খাওয়া হয় না। চিন্তাহরণ এই হৃদয়ব্রতী নারীকে যতই শ্রদ্ধা করুক, কেমন যেন নিজেকেও মনে করে অপরাধী। মনোরমাকেও বলিতে গেলে লাভ হয় না—শুনিবে না।

ওমা। একবেলা না খেলে মানুষের কি হয়?—সে বিস্ময়ে হাসিয়া যেন কুলকিনারা পায় না।

কিছু না হোক্, ক্ষিদে পায়।

সে ত ওই বুড়ী আর তার নাতনীটার পেয়েছিল আরও বেশি। নইলে আস্‌ত ভাত চাইতে আমার কাছে?

ঠিক। কিন্তু তুমি আবার দুটি বেঁধে নিলে না কেন?

সে কথায় তুমি আস্‌ছ কেন পুরুষ মানুষ? —সে বলে না—চা'ল ছিলনা।

চিন্তাহরণ তাহা মানিবে না। মনোরমা গম্ভীর হয়—তোমাদের পাল্লায় পড়ে ত ব্রত, উপবাস সব গেল। নইলে বামুনের মেয়ে অমন দু' চার দিন উপবাস আবার কে না করে?—তারপরে হাসিয়া বলে—না হয় হয়েছি ব্রাহ্মী, তা বলে উপোসও করব না?

চিন্তাহরণ রাগ করিয়া বলে, বেশ। আমিও তো ব্রাহ্মণ—আমিও তবে উপোস করব।

এমনি সময়েই চিন্তাহরণ জানিল—তাহার সংসারে নূতন অতিথিরও আবির্ভাব ঘটিতেছে। কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগিল মনে;

সপুলক আনন্দের আস্বাদন সে লাভ করিল। একটা নূতন দায়িত্ববোধ, বেশ একটু নিজের গুরুত্বও, সে বোধ করিল। সমস্ত দায়িত্বই ত তাহার প্রতিপালন করিতে হইবে। এই সময়ে মনোরমাকে সস্নেহে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, এমন নারীও তাহার সংসারে কেহ নাই। প্রতিবেশিনীরাও কেহ অগ্রসর হইয়া আসিবে না। মনোরমার মা কি এই সময়ে অন্তত ভ্রাতৃগৃহে আসিয়াও সহায়তা করিতে পারেন? মনোরমা বলিল, প্রয়োজন নাই। মামাদের ত জানো—তোমার—আমার খোঁজও নেন না সমাজের ভয়ে।

কিন্তু রাজীব আসিয়া পৌছিল। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদটা সে রামজীবনবাবুর নিকট পৌছাইল, আর সন্ধ্যা হইতে না হইতেই রামজীবন বাবুর স্ত্রী, কন্যা, শাশুড়ী তিন পর্যায়ের সাহায্যকারিণীরা আসিয়া মনোরমাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। লজ্জায়, তাড়নায়, বিড়ম্বনায়—এবং সুখেও—মনোরমা কি করিরা যে ইহাদের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবে তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

একটু বিলম্ব আছে বটে, কিন্তু ব্যবস্থা ত করিতে হইবে। মাসীমায়ের বউমায়ের জন্য এতই উৎকণ্ঠা যে, বিলম্ব আছে বলিয়া মনে হয় না, এখনই তিনি ব্যবস্থা করিতে পারিলে খুশী হন। ডাক্তার ধাত্রী প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার কথা বলিয়া রাখিতে হয়।

হাসপাতালের পিছনের রাস্তা দিয়া চিন্তাহরণ ফিরিতেছিল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলো। হঠাৎ একটি মধ্যবয়স্কা মহিলা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

মাস্টার মশায়?

চিন্তাহরণ দাঁড়াইল, বিস্মিত হইয়া কহিল: হ্যাঁ। কিন্তু আপনি?

হাঁ, আমি মিসেস মোহান্তী।

মিসেস্ মোহান্তী ডাক্তার মোহান্তীর স্ত্রী—ত্রিশ-বত্রিশ হয়ত বয়স। ডাক্তার মোহান্তী কয় মাস পূর্বে মারা গিয়াছে। এখানে ধাত্রীর কাজ করে এখন মিসেস্ মোহান্তী। তাই নামটা চিন্তাহরণের অপরিচিত নয়। ভাবিল, মনোরমার সম্পর্কেই কি কিছু কথা আছে? রামজীবনবাবুর স্ত্রী বলিয়াছেন? —মিসেস্ মোহান্তী জানাইলেন, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

আমার সঙ্গে? বেশ, কি কথা বলুন?

মিসেস্ মোহান্তী দাঁড়াইলেন, কি ভাবিলেন,—একবার কি আমাদের বাড়ি আসবেন? সময় লাগবে বলতে।

চিন্তাহরণ কি ভাবিল। বলিল, এখনি?

হাঁ! তা হলেই ভালো হয়—

চিন্তাহরণ ভাবিতেছে। বুঝিয়া মিসেস্ মোহান্তী বলিলেন, বুঝতেই পারছেন—বড় বিপদে পড়েছি আমার মেয়েকে নিয়ে।

মেয়েকে নিয়ে?—কোথায়?

শুনবেন, চলুন।

চিন্তাহরণ প্রশ্ন করিল না। মেয়ের বিপদ—ইহার পরে আপত্তি করা চলে না! তবে ইহারা খৃস্টান, ইহাদের কি বিপদ, তাহা সে ভাবিয়া পায় না।

ঘরে পৌছিয়া মিসেস্ মোহান্তী বলিলেন, বসুন, দেখে আসি—ফিরিয়া বলিলেন, না, কেউ নেই। তারপর বলিলেন: আচ্ছা, আপনিও ত জাতিতে ব্রাহ্মণ?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে চিন্তাহরণ বলিল, হাঁ। কেন? পরক্ষণেই বলিল, শুনুন, আমি জাত মানিনা, আমি ব্রাহ্ম।

তা শুনেছি। কিন্তু ব্রাহ্মণ ত? শুনুন তবে-আমিও ব্রাহ্মণের মেয়ে।

চিন্তাহরণ বিস্মিত হইল। পরক্ষণেই বলিল, কিন্তু আপনারা ত খ্রীস্ট-ধর্মাবলম্বী ?

উত্তর না দিয়া মিসেস্ মোহান্তী বলিলেন, শুনুনই না। আমি বেনিডিক্টা নই, বৃন্দাসুন্দরী। বলিয়া মিসেস্ মোহান্তী বলিলেন, মিসেস্ মোহান্তীও নই, খয়েরসোলের অম্বিকা পাঠকের স্ত্রী।

চিন্তাহরণ শুনিতে লাগিল—অম্বিকা পাঠক গ্রাম ছাড়িয়া শহরে গিয়াছিল। ছোট নাগপুরের শহর। সেখানে শহরের হাসপাতালে সে কম্পাউণ্ডারী শিখিয়া কাজ পায়—আর সেখানেই স্ত্রী কন্যা লইয়া বাস করিত। কুমুদিনী জন্মিয়াছিল গ্রামেই। কিন্তু অম্বিকা পাঠক শহরে কলেরায় মারা গেল। সেখানেই তখন নূতন পাশ করা ডাক্তার ছিল অ্যালেন মোহান্তী। সে ক্যাথোলিক খ্রীস্টান। বৃন্দাসুন্দরীই তখন হাসপাতালের পাচিকা হইল—মোহান্তীর চেষ্টায়। তারপর—মোহান্তীর সহিত বিবাহ ত হইতে পারে না—কারণ, মোহান্তীর ধর্মপত্নী বিদ্যমান। ক্যাথোলিকদিগের ধর্মে বিবাহ বিচ্ছেদ অচল। বৃন্দা তাহা জানিত না—মোহান্তী তাহাকে বিবাহই করিতেছে বলিয়া বুঝায়। তাই খ্রীস্টান সেও নয়, তাহার মেয়েও নয়। মোহান্তী বদলি হইলে তাহার সঙ্গে তাহারা এখানে আসে। কারণ, মোহান্তীকে ছাড়িতে পারিলেও তাহাকে সমাজে গ্রহণ করিত না। "সমাজের দোষ কি ? আমিও ত ব্রাহ্মণের বিধবার মত থাকি নি।" তারপর কুমুদিনী বড় হইতেছিল। ভালো ভাবিয়াই তাহাকে সে পড়িতে কনভেন্টে দিয়াছিল। মোহান্তীও মাতাল—বয়স্থা মেয়েকে ঘরে রাখিতে চাহে নাই। কিন্তু এখন খরচপত্র চলে না। কনভেন্টের লোকেরা এখন কুমুদিনীকে বলে ওলিভারকে বিয়ে করতে—ওলিভার ফেথফুল কনভেন্টের বাহিরের কাজের দপ্তরী। কুমুদিনী রাজী না হইলে তাহাকে উহারা 'নান্' করিয়া রাখিবে। তাহাকে রাজীবেরা রক্ষা করুক, মিসেস্ মোহান্তীর তাহাই প্রার্থনা।

চিন্তাহরণ বলিল, কুমুদিনী কি বলেন ?

সে বলে 'আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে—আমি সেই বুনোটাকে বিয়ে করব না।'

চিন্তাহরণ হাসিল। বলিল, ভালো। ভালো। আপনাদেরও কুলীন পাত্র না হলে চলবে না।

মিসেস মোহান্তী বলিলেন, আপনি রাগ করলেন মাস্টার মশায় ? চিরদিন ভদ্রসমাজে রয়েছেন, জাত না খোয়ালে তাই বুঝবেন না—জাতের দাম কত। থাক সেই কথা—কিন্তু কুমুদিনীকে আপনার আশ্রয় দিন।

মিসেস্ মোহান্তীর কণ্ঠস্বর ব্যাকুল।

চিন্তাহরণ বলিল, আমরা আশ্রয় দোব ? সে কোথায় ?

এইখানে—পার্শ্বের ঘরে। দিন পাঁচেকের ছুটি নিইয়ে তাকে এনেছি আমার কাছে। —বলিতে না বলিতে বৎসর পনের ষোলর তরুণী মেয়ে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

চিন্তাহরণ উঠিয়া দাঁড়াইল. বলিল, থাক্। আপনার কথা বুঝে্ছি।

কিন্তু দাঁড়ালেন যে! বলুন—তাকে আশ্রয় দেবেন।

'না' বলতে পারব না। কিন্তু 'হাঁ' বলাও অসম্ভব। আপনাকে জানি না, ডাক্তার মোহান্তী জীবিত নেই, তিনি থাক্‌লেও আপনার কথার সত্যমিথ্যা বুঝা যেত। অজ্ঞাত কুলশীলা একজন মেয়ের কথায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি আরও ভালো করে ভেবে দেখুন, আমরাও আরও একটু সংবাদ সংগ্রহ করে নিই।

ইতিমধ্যে তারা জোর করে কুমুদিনীকে বিয়ে দিলে ?

জোর করে হিন্দু মেয়েকেও বিয়ে দেওয়া যায় না, দেখেছেন।

সে মেয়ের যদি জোর থাকে। সকলের কি তেমন জোর থাকে ?

চিন্তাহরণ চলিতে গিয়া দাঁড়াইল, তবে কি আমাদের জোরে সে রক্ষা

পাবে? তা হয় না। নিজের জোরেই রক্ষা পেতে হয়। 'তারপর আবার মুখ ফিরাইল, যাক্। আমি চলি, পরে খবর নেবেন।

চিন্তাহরণ বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু তাহার শান্ত মনে তখন নানা তরঙ্গ উঠিতেছে। ইহা মিসেস মোহান্তীর ছলনা যদি না হয়, তাহা হইলে তাঁহার আচরণকে কাপুরুষতাই বলিতে হইবে—একজন বিপন্না নারীর নিবেদনে সে বধির। সেই শ্যামলা মেয়েটির করুণ শান্ত চক্ষুও তাহার মনে পড়িল। কিন্তু মনোরমাকে সে আর উত্তেজনা ও অস্বস্তিতে পীড়িত করিতে চায় না। একটা স্বস্তি ও সুখ সে এখন লাভ করিয়াছে—বিশেষত এই সময়ে তাহার শান্তি প্রয়োজন। কিন্তু সত্যই এই রূপ বয়স্থা মেয়েকে আর কেহ এই শহরে আশ্রয় দিবে? কোথায় সে এখন এই মুহূর্তে তাহাকে লইয়া গিয়া তুলিতে পারে?

রাজীবের সঙ্গে চিন্তাহরণের এই বিষয়ে আলোচনা শুনিতে না শুনিতেই মনোরমা বলিয়া বসিল, কেন, এখানে নিয়ে এলে না কেন?

কিন্তু রাজীবও মানিল—প্রকৃত ব্যাপার না জানিয়া একজন অজ্ঞাত-কুলশীলার মুখের কথায় তাহা করা অন্যায়। তাহা ছাড়া মামলা-মোকদ্দমাও বাধিবে। এই ক্ষেত্রে মিশনারিরা হইবে বাদী। পুলিশ ও ইংরেজ কর্মচারীরা তাহাদেরই সাহায্য করিবে। আর, সত্যই তাহাদের গৃহে স্থান কোথায়? মনোরমার বর্তমান অবস্থায় সেই গৃহে কাহাকেও তোলা, তারপর আসামী হইয়া মামলা-মোকদ্দমায় তাহার জীবনকে ক্লিষ্ট, পীড়িত করা—রাজীব প্রাণ থাকিতে তাহাতে সম্মতি দিবে না।

কিন্তু পরদিন দ্বিপ্রহরে মিসেস মোহান্তীই নিজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার সঙ্গে কুমুদিনী। চিন্তাহরণ বা রাজীব কেহ গৃহে নাই। বাড়িতে মনোরমা একা—নিজের কর্ম সমাপনান্তে একটা বই খুলিয়া

বসিয়া কি স্বপ্ন দেখিতেছিল। মিসেস্ মোহান্তী বলিলেন, কেউ নেই? তা হলে,—কিন্তু আপনিই বোধ হয় মাষ্টার মশায়ের স্ত্রী?

মনোরমা বুঝিতে পারিল না, বলিল, হাঁ। কিন্তু আপনারা?—

আমাদের চিন্‌বেন না আপনি—আমি মিসেস্ মোহান্তী, আর এটি আমার মেয়ে কুমুদিনী।

এই সেই মিসেস মোহান্তী, আর এই কুমুদিনী। শ্যামলা মেয়েটির ভাসা-ভাসা চোখ দুইটিতে একটা শঙ্কিত করুণ সংশয়—পৃথিবীতে কেহ কি তাহাকে আশ্রয় দিবে?

মনোরমা মনঃস্থির করিয়া ফেলিল। বলিল, আসুন—ভিতরে চলুন।

ভিতরে আসব?—পায়ের জুতার দিকে সে তাকাইল। বলিল, ঘরে খাবার জল আছে, না?

হাসিয়া মনোরমা বলিল, আছে, কিন্তু তার কিছু হবে না।

চোখে-চোখে কি কথা হইল—মা ও মেয়ে পায়ের জুতা খুলিয়া ফেলিল, সন্তর্পণে খালি পায়ে গৃহে প্রবেশ করিল।

মিসেস্ মোহান্তী একটু চিন্তিত হইলেন। পরে বলিলেন, তোমার এ অবস্থা জানতাম না, মা। মাষ্টার মশায় কেন কাল দ্বিধা করেছেন বুঝলাম।

মনোরমা মুখ অবনত করিল। তাহার জন্যই কি ইহারা বিমুখ হইবে? ওই ভাসা ভাসা চোখ মেয়েটির চোখ দুইটি এখনো তাহার মুখের দিকে আশা-নিরাশার দৃষ্টি মেলিয়া কাঁপিতেছে। তাহার নিজের মনে আজ এত সুখ, প্রাণে আজ এত আত্মপ্রত্যয়—তথাপি কি সে কিছু করিতে পারে না? এই মেয়েটিকে একটু সুখী করিতে পারে না? তাহার অন্তর-ভরা সুখের একটা সামান্য অংশ ইহাকে বাঁটিয়া না দিলে যে তাহার সুখের মধ্যেও একটা অপূর্ণতা থাকিয়া যাইবে।

মনোরমা বলিল, আপনারা বসুন। উনি ইস্কুল থেকে ফিরুন। তখনই শুনবেন।

রাজীব গৃহে ফিরিয়া শুনিল—মনোরমা প্রতিশ্রুতি দিয়া বসিয়া আছে; চিন্তাহরণও সম্মতি দিয়াছে। এমন কি, কুমুদিনী আর মায়ের সঙ্গে ফিরিয়া যায় নাই,—কন্‌ভেণ্টে সে ফিরিয়া যাইবে না। একবার সেইখানে প্রবেশ করিলে তাহার উদ্ধার তখন অসাধ্য হইয়া উঠিবে।

রাজীব বলিল, আর দ্বিধা করিবার কিছু নাই। আসলে রাজীব নিজেও যেন কূল পাইল। বলিল, অবশ্য মিশনারিরা নিশ্চয়ই মেয়েটিকে ছাড়বেনা।

মনোরমা বলিল, আমরাও তাকে ছাড়ব না।

চিন্তাহরণ বলিল, আপাতত কিছু দিন কিন্তু ছাড়তে হবে। তাকে সরিয়ে রাখতে হবে যাতে আইন-আদালতের কবলে সে সহজে না পড়ে। পড়লেই তাকে পাঠিয়ে দেবে—খ্রীষ্টানদের শোধনাশ্রমে কিম্বা ওই মিশনে। তার পূর্বে তাদের পাঠিয়ে দিই কলকাতা।

চিন্তাহরণ মিথ্যা অনুমান করে নাই। আর একটা ঝড় উঠিল, আর সেই ঝড়ের মাতনে রাজীবও মাতিয়া উঠিল।

জাহাজ ঘাট হইতে পুলিশ মিসেস মোহন্তো ও কুমুদিনীকে এবং রাজীবকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিল;—ক্যাথোলিক মিশন সংবাদ পাইয়া গিয়াছিল। সে রাত্রির মত কাহারও জামিন মিলিল না। পুলিশ সাহেব স্বয়ং জানিয়াছেন, মেয়ে-চুরির একটা নোটোরিয়াস্ গ্যাঙ এই শহরে সৃষ্টি হইয়াছে। এইবার তাহারা হাতে-হাতে ধরা পড়িয়াছে, সরকার ইহাদের কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন।

তথাপি জামিন মিলিল। মিসেস মোহান্তী নিজে জবানবন্দী দিলেন, সে বৃন্দাসুন্দরী, তাহার কন্যার অভিভাবিকা—কস্মিনকালেও তাহারা খ্রীষ্টান নহে। ক্যাথোলিক কর্তৃপক্ষ তাহার কন্যাকে জোর করিয়া খ্রীষ্টান করিতে চাহে, এবং তাহাদের দপ্তরী ওলিভার কেথ্‌ফুলএর সঙ্গে

কুমুদিনীর মোর করিয়া বিবাহ দিতেছিল বলিয়া সে কুমুদিনীকে নিজের গৃহে আনয়ন করে। সে সংস্কারবাদী, হিন্দু ধর্মানুরাগিণী ; সেই ধর্মেই কুমুদিনীকে মানুষ করিতে চাহে বলিয়াই চিন্তাহরণ গাঙ্গুলীর স্ত্রীর হাতে কুমুদিনীর শিক্ষা ও রক্ষার ভার সে সমর্পণ করিয়াছে।

কোর্টে কুমুদিনীর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করিতে কিছু দেরী হইবে। ততদিন কুমুদিনী কোথায় থাকে? ইংরেজ প্রোটেষ্টাট্ হাকিম হুকুম দিলেন—স্থানীয় মিশন ইস্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর জিম্মায় থাকিবে। ভাগ্যবশে মিস টর্ক এখন নাই। আর প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ও তাহার স্বামী মিষ্টার ব্যানার্জী—তিনিও মিশন ইস্কুলের শিক্ষক,—শিক্ষক চিন্তাহরণের পরিচিত।

কুমুদিনীকে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন: তুমি পালাচ্ছিলে কেন? কুমুদিনী বলিল, আমি বামুনের মেয়ে, আমি ওই বুনোটাকে বিয়ে করব কেন?

মিষ্টার ব্যানার্জী ও মিসেস্ ব্যানার্জি পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন। ঠিকই, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হইতে রেভারেণ্ড কে, এম, ব্যানার্জি পর্যন্ত কে তাঁহারা এই গর্বটা অনুভব না করেন? আর এই ক্যাথোলিকগুলি হিন্দুরও অধম।

শেষ পর্যন্ত মিসেস মোহান্তী অভিভাবক সাব্যস্ত হইলেন।

কিন্তু তাহার পূর্বেই তাহার হাসপাতালে চাকরি গিয়াছে। তিনি যান কোথায়? কুমুদিনী করে কি? আপাতত চিন্তাহরণের গৃহেই তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিল—সেখানে প্রয়োজনও এ সময়ে আছে।

ঝড় কাটিতে বেশ কিছুদিন লাগিল।

অত্যল্পকাল পরেই একদিন অর্ধ-চেতনা মনোরমা তাহার কানের কাছে শুনিতে পায় কুমুদিনীর ডাক: 'দিদি! ও দিদি!' নিমীলিত

চক্ষুদুটি মেলিয়া মনোরমা দেখিল সেই শ্যামলা মেয়ের ভাসা-ভাসা চোখ দুইটি উচ্ছ্বসিত আনন্দে উজ্জ্বল।

ছেলে, দিদি, ছেলে! ছাখো! ছাখো!

মনোরমার চোখ মেলিল—আগ্রহে, আশায়, অবিশ্বাস্য স্বপ্নে!

সুখে—প্রাণভরা সুখের পরম পরিতৃপ্তিতে—মনোরমার চক্ষু আবার মুদিয়া আসিল।

সুখ। এই ত সুখ। সে অমৃতলাভ করিল।

'শৈলী' এবার শৈল হইয়া উঠিল।

দু সাহসের বশে সে আপনাকে রাঘব চৌধুরীর কবল হইতে বাঁচাইবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল। শৈশবে পড়িতে পড়িতে দেবপ্রসাদের নিকট শুনিয়াছিল বহুবিবাহ ও কৌলিন্যের অখ্যাতি। মাকে দেখিয়াছিল,—আজন্ম প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে মায়ের জীবনের গভীর লাঞ্ছনা ও হতাশা সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিল। পীতাম্বর গাঙ্গুলীর সহিত বিবাহ প্রস্তাবের সময় হইতে বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি বিরূপতা জন্মিয়াছিল, এবং বিদ্রোহ-বাসনা তাহার জাগিয়া উঠিয়াছিল রাজীবের কথায় ও কর্মে। এইবারও সবই ভাঙিয়া যাইত যদি সেদিন সেই নিমেষে রাজীব চৌধুরী আপনার প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে তাহাকে চৌধুরী গৃহ হইতে টানিয়া আনিয়া নৌকায় না তুলিত। সেই অভাবনীয় পরিবেশে তারপর প্রতি পদে শৈলীকে আপনার দ্বিধা ঠেলিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতে হইল—শৈলীর তখন বিমূঢ় হইলে চলিবেনা। শরৎ গুপ্তের গৃহে পৌঁছিতেই পা কাঁপিতে লাগিল, চোখ অন্ধকার হইয়া আসিতে চাহিল,—অপরিচিত গৃহ, অপরিচিত লোকজন। রাজীব, গিরীশ এখনো আছে, এবার বিদায় লইবে। —বুঝি কী বিভীষিকা শৈলীকে গ্রাস করিবে এইবার। কিন্তু দ্বিধা

করিবার ত আর সাধ্য নাই—মরীয়া হইয়া সে শরৎ গুপ্তের বাড়িতে পদার্পণ করিল।

শুনিয়া অন্তঃপুর হইতে প্রৌঢ়া গৃহিণী স্বয়ং আগাইয়া আসিয়া শৈলীকে লইয়া গেলেন। শৈলীর মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন: আঃ! এমন লক্ষ্মীর মত মেয়ে। যাক্, মা খুব বেঁচেছ। ওদেরও মুখ রেখেছ, নিজেও প্রাণে বেঁচেছ!

কি ছিল তাঁহার কথায়, চোখে মুখে, অকৃত্রিম সমবেদনায়, আব সস্নেহ সম্ভাষণে শৈলী সেই মুহূর্তেই যেন আশ্বস্ত বোধ করিল। আপনার কন্যাদিগকে গৃহিণী ডাকিলেন। তাহারা সকলেই বয়সে শৈলীর ছোট, কিন্তু একেবারে অপ্রাপ্তবয়স্কাও নয়। শৈলীকে বলিলেন, ছ্যাখো, এরা সব তোমার বোন্। ও চন্দ্রমুখী, ও আমার মেয়ে সরোজিনী। ছ্যাখলো, এই তোদের দিদি এল। কি দিদি হবে তুমি? 'রাঙা দিদি' ছাড়া তোমাকে কোনো নামে মানায় না।

শৈলী লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। তাহার সংকোচও সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি কমিয়া আসিল। যাহা ছিল তাহা সারা দিনের কথায় ব্যবহারে শেষ হইতে লাগিল। গৃহিণী তাহার চিহ্নও থাকিতে দিলেন না। 'শৈলীকে' তিনি একটা নূতন মর্যাদা দান করিলেন—সে আর 'শৈলী' নয়, তাঁহার মুখে হইল 'রাঙা মা', 'শৈল', অন্যদের নিকট 'রাঙা দিদি।'

মফঃস্বল শহরের সাদাসিধা বাসগৃহ ও গৃহসজ্জার তুলনায় কলিকাতার পদস্থ মানুষের গৃহসজ্জায় বাহুল্য বেশি—শরৎ গুপ্তের বড ছেলে মুনসেফ্, দ্বিতীয় ছেলে দেবেন্দ্র বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়ে, নিজ গৃহে স্বাচ্ছন্দ্যও 'আধুনিক' চাল। শৈলীর পক্ষে সবই তাহা বিচিত্র। কিন্তু তাহার সেই চমক আবার কাটিয়া গেল—এই গৃহের মানুষদের জন্য, স্নেহ-সম্ভাষণে। আত্মীয়-কুটুম্ব পরিজনের আশ্রয়-রূপিণী গৃহিণী, স্নেহে মাতৃরূপিণী,

মর্যাদায় যাহার গর্বের লেশও নাই। শরৎগুপ্তও তেমনি—প্রশস্ত ললাট, জ্যোতিষ্মান চক্ষু, দীর্ঘশ্মশ্রু উদার প্রসন্নহাস্য পুরুষ, ব্যক্তিত্ববান্ অথচ হৃদয়বান্। আন্তরিকতার সহিত তিনি বলেন, তুমি হ'লে চৌধুরীদের ভাগ্নী—কত পুরুষের পরিচয় তাদের সঙ্গে আমাদের গুপ্তদের। তা হয়ত জানো না (শৈলী অবশ্য জানিত)। জানবে আর কি, দেবপ্রসাদ পর্যন্ত বেঁচে নেই—রাজীবকে ত আমি তখন চোখেও দেখিনি। দেবপ্রসাদ চৌধুরী থাকলেও জানতে—মধ্যমগ্রামের গুপ্ত আর চিত্রিসারের চৌধুরী, দু'এক পুরুষ নয়, প্রায় দু একশত বৎসরের বন্ধুত্ব এই দুই গোষ্ঠীর।

শৈলীও জানিত—বহুবার শুনিয়াছিল,—বহুকাল হইতেই গুপ্তরা দেশে বিখ্যাত। বিদেশে এই গুপ্তরা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শিক্ষায়-দীক্ষায় আর সরকারী কর্মে অর্থোপার্জন করিয়া এখন শুধু ভাগ্যবান্ হয় নাই। তাহাদেরই আশ্রয়ে দেশের বহু লোক,—দেবপ্রসাদ, শিবপ্রসাদও—জীবিকার্জনের সুযোগ লাভ করে। চৌধুরীদের তাহারা শুধু সুহৃদ নহেন, আসলে মুরুব্বি। এই গৃহে শৈলী আরও নূতন জিনিষ দেখিল—পতনোন্মুখ চৌধুরী পরিবারের অস্বচ্ছলতায় ও ব্যাহত গ্রাম্য-সমাজে সে যাহা দেখিতে পায় নাই—পুরাতন সহজ ভদ্রতার সঙ্গে একালের শিক্ষিত জীবন-যাত্রার সম্মেলনে রচিত এই সারল্য, এই পরিচ্ছন্নতা, মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে অকপটতা, উদারতা।

শৈল জানিত শরৎগুপ্তের তিন মেয়ে। কিন্তু সে জানিত শৈলেরই মত আরও বিধবা বা অনূঢ়া কন্যাদেরও গৃহিণী নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়াছেন। কিন্তু কে কন্যা, কে বা তাহার স্নেহপালিতা—বুঝিবার উপায় কোথায়? প্রায় একই বয়সের এত মেয়ে ত আর একজন মাতার সন্তান হইতে পারে না।

গৃহিণী ততক্ষণে শৈলীকে বলিতেছেন : তুমি কি বল্‌বে আমাকে ?

শৈল সপ্রতিভ হইতে চেষ্টা করিল : সবাই যা বলে।

গৃহিণী খুশী হইয়া উঠিলেন : বাঁচালে। একটা মাসী, পিসি, দিদিমা, আইমা করে দাওনি যে। যাক্, এসো, তা হলে। তুমি হলে আমার 'রাঙামা', এটি বড়মা, তুমি রাঙামা, ওটি খুদি মা এ চিন্মোহিনী, এ সন্মোহিনী, এ আনন্দদায়িনী—

সকলেই তাহারা কেহ পড়ে—বেথুন স্কুলে যায় ; বিলিতী মেমদের ইস্কুলের ছাত্রী তাঁহার মেয়েরা তিনজনে। শৈল বুঝিয়া লইল তাহারাই এই গৃহের কন্যা—এই চিন্মোহিনী, সন্মোহিনী, আনন্দ-দায়িনী।

মনোরমার ব্যাপারের পরে শৈল ভাবিয়াছিল সাবধান হইবে। কিন্তু এই বাড়ির গৃহিণী, গৃহকর্তা, কন্যা, সকলের নিকট সহজ আত্মীয়তা এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ও সাহসের অযাচিত প্রশংসা লাভ করিয়া শৈল আবার তৎপর হইল ; আপন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আরও সুনিশ্চিত হইতে পারিল—শৈলী শৈল হইয়া উঠিল। এমন কি, বুদ্ধিতে, কর্মনিপুণতায় আপনার সেই বিশিষ্টতা প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষাও আর গোপণ করিতে চাহিল না। আসিল কমিশন, আসিল উকিল, ডাক্তার কত কিছু ; কিন্তু শৈল ভাঙিলও না, মচকাইলও না।

প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন শরৎ গুপ্ত—মেয়ের মত মেয়ে শৈল। অন্য মেয়েদের ডাকিয়া বলেন—এমনি হওয়া চাই তাহাদের। গিরীশকে ডাকিয়া বলেন,—এমন মেয়ে যে দেশে জন্মায় সে দেশের আবার ভাবনা ?

গৃহিণী বলেন, রান্না থেকে বাঁটনা-বাঁটা কোটনা-কোটা—কোনটাতেই ওর সঙ্গে পারে না ঝি-চাকরেরাও। কই মাছ ত ওরা কুটতেই জানত না। আমি বলছি—'আমি যাচ্ছি, তোরা দেরী কর।' ওমা এসে দেখি

কেটে-কুটে তৈরী সব! রাঙামা বললে, 'কই-পাতুড়ি রাঁধি।' বামুনের মেয়ে, রাঁধতে ওস্তাদ।

গুপ্ত মহাশয় মহা খুশী। মামলায় জয়ের পর তিনিই উকিল ব্যারিষ্টার ও রাজীবের বন্ধু-বান্ধবদের নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। 'ঢাকার মেসের' গিরীশেরাও আসিয়াছে। তাহাদের সগর্বে বলিলেন, খেয়ে যাও—শৈলই রেঁধেছে সব, বিশেষত কই পাতুড়ি। পটলডাঙার মেসে পাবে না এই রান্না।

শৈল ও গৃহিণী পরিবেশন করিতেছেন—মেয়েরা বাপের নিকটে।

গিরীশ পরিহাস করে, পাতুড়ি না পেতে পারি। কিন্তু আমাদেরও বাঙাল মেস্—ঝাল ঝোলের আস্বাদ পাই।

খেয়েছ শৈল'র কৈ-পাতুড়ি! শৈ'লর হাতের রান্নাও খাওনি আগে। আরে তোমরা না চৌধুরীদের কুটুম্ব?—ওবাড়িতে যাওয়া আসাও ছিল।

তখন ওর বয়স কত? পাঁচ ছ বৎসর।

অদূর হইতে শৈল বলিয়া ফেলে: আর আপনার?

আমার? আমরা নদীতে যেতাম নৌকা নিয়ে। আর পাঁচ বৎরের মেয়ে তুমি কান্না জুড়ে দিতে—আমাদের সঙ্গে যাবে। তারপরে দাদা বলতেন, 'চলুক না; রাজীব।' রাজীব তোমার পিঠে একটা কীল মারিয়া বলিত—'বেশ চল্ তবে।'

হাসিয়া ওঠে মেয়েরা সকলে, শৈলও লজ্জাবোধ করে।

হাসিয়া বলেন শরৎগুপ্ত: তা, যা বলো গিরীশ, জাত আমিও মানি না কিন্তু ছেলেদের বিয়ে দোব বামুনের মেয়ের সঙ্গে,—মেয়েদের বিয়ে যেখানে খুশী হোক,—ছেলের বউরা অন্তত রেঁধে খাওয়াবে ভালো।

আবার হাসির রোল পড়িয়া যায়।

রাজীব চলিয়া যায়। এবার শৈলী স্কুলে পড়িতে গেল।

ব্রাহ্ম কর্তৃপক্ষরা মেয়েদের নূতন ইস্কুল খুলিয়াছেন। একজন বিদুষী

ও ভারত হিতৈষিণী ইংরেজ মহিলাকে তাঁহারা প্রধান শিক্ষিকারূপে পাইয়াছেন—ইউনিটেরিয়ান খ্রিশ্চিয়ান হিসাবে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে আসিয়াছেন। এই ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁহারা শিক্ষাদান করিবেন নিজেদের আদর্শানুযায়ী। কুসংস্কার-মুক্ত ভারতীয় আদর্শে সেখানে ভারতীয় কন্যাদের মন বুদ্ধি চৈতন্য গঠিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার্জনের মত শিক্ষাও দিতে হইবে—যেন তাহারা আত্মনির্ভর হইতে পারে। কিন্তু শরৎগুপ্ত ভাবিতেছিলেন কি করেন—তাঁহার নিজ কন্যারা ডাবটনে পড়ে;—তাহাদের অবশ্য জীবিকার্জন করিতে হইবে না। তাহাদের একটু বিলাতী মেয়ের মত শিক্ষা প্রয়োজন। চিন্মোহিনীর অভীষ্ট বরটি বিলাতে পড়িতেছে। অন্য মেয়েরাও সিষ্টারদের স্কুল ছাড়িতে চাহেনা, ছাড়া উচিতও নয়। কারণ গৃহিণী পারিলে বিলাত ফেরৎ ছাড়া জামাই করিবেন না। শরৎগুপ্তেরও মনে মনে তাহাই ইচ্ছা—তবে সেরূপ পাত্র কোথায়? অবশ্য প্রতিশ্রুতি পাইলে এক-আধটি কৃতী ছাত্রের বিলাতের শিক্ষাব্যয়ও তিনি আংশিক বহন করিবেন। সে যাহাই হউক, তাঁহার গৃহাশ্রিতা বালিকাদের তিনি এই নূতন স্কুলে পড়িতে দিতে পারেন। ইহাদের প্রধানতঃ নিজের পায়ে দাঁড়াইবার মত শিক্ষা দিতে হইবে, কারণ, অনেকেই তাহারা আত্মীয়-পরিজন-হীনা।

শৈলী এই নূতন ইস্কুলে পড়িতে যাইবে। শরৎ গুপ্তের বাড়ির অন্য মেয়েরা সেই ইস্কুলেই যোগদান করিয়াছে। গিরীশ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না—নূতন ইস্কুল ও 'ভারতীয় শিক্ষায়' তাহার আপত্তি।

মিস্ জেনিংস-এর বাড়িতে গেল গিরীশ। মিস্ জেনিংস বলিলেন: ভারতীয় আদর্শ বলতে আপনারা কি মনে করেন জানিনা। ধর্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা?—তা ত আপনাদের নেতারাই দেবেন। আমি চাই এই মেয়েরা যেন স্বাধীনভাবে চলতে পারে, ফিরতে পারে, এবং

ভাবতে পারে, তারপর অন্য মেয়েদেরও আবার স্বাধীন হতে শিক্ষা দিতে পারে।

ঠিক কথা।— গিরীশ উৎসাহে প্রায় লাফাইয়া উঠে। মিস্ জেনিংসও এইরূপ শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক কম দেখিয়াছেন। কেবল এক কথাই তিনি এই দেশে শুনিতেছেন, 'মেয়েরা মেম সাহেব হবে না।' 'এরা ভুলেই যান মেম সাহেবরাও মেয়ে। এবং এজ্ প্রাউড্ অব্ দেয়ার ক্রিশ্চিয়ান হোম্ এজ্ ইউ। ভারতীয় বলতে ত দেখছি এই—তোমাদের মেয়েরা পথে বেরুবে না, গাড়ীতে পর্দা চড়াতে হবে, দুয়ার-জানালায় চিকের পর চিক টানিয়ে ইস্কুল করতে হবে— পাছে তোমাদের মেয়েদের কেউ দেখে ফেলে!

গিরীশ নিশ্চিন্ত হইল— শিক্ষা যথার্থ হইবে।

শৈল'র আনন্দের পরিসীমা নাই। মিস্ জেনিংসও তাহাকে স্বাভাবিক ভাবেই পছন্দ করিলেন। শৈল'র বিষয় তিনি আগেও শুনিয়াছিলেন—প্রকৃতপক্ষে শৈলর বিচারকও ছিলেন তাঁহার কাউন্ট্রির লোক। তাই মিস্ জেনিংস্ জানিতেন—শৈল ব্রেভ্ গার্ল। অবিলম্বেই তিনি দেখিলেন—শৈল তাঁহার ইস্কুলের বেষ্ট্ গার্ল। লেখাপড়ায় পরম উৎসাহী, আচরণে-ব্যবহারে সপ্রতিভ, বেশভূষায় শ্রীময়ী সচেতন। সকলকে সে সগর্বে ছাড়াইয়া যায়—সকলের উপরে আপনার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন না হইতে সে থামে না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, যোগ্যতা আছে।

বৎসর না যাইতেই মিস্ জেনিংস বলিলেন, তোমাকে পুরস্কার দিতে চাই। কি নেবে বলো।

শৈল বলিল: যা আপনি উপযুক্ত মনে করেন।

উপযুক্ত তুমি সেরা জিনিসের— কি চাও এখন? জামা, কাপড়?

শৈলও মিস্ জেনিংসকে চিনে। বলিল: বই।

মিস্ জেনিংস তাহার দুই গালে চুমা খাইয়া বলিলেন: শ্রেষ্ঠ জিনিসই তোমাকে দোব—সেক্‌স্‌পীয়র—

শৈল পুলকে শিহরিত হইয়া বলে: আমি কি বুঝতে পারব?

নিশ্চয়ই পারবে—একদিন।

শরৎ গুপ্ত ডাকিয়া বলিলেন: ওগো রাঙামা, কোথায় গেলে?—মুখে-চোখে তাহার অনান্দোচ্ছ্বাস,—মেমসাহেব ত তোমার নামে পঞ্চমুখ। বলেন, 'শী ইজ এ জুয়েল! আমি তাকে সেক্‌স্‌পীয়রের গ্রন্থাবলী পারিতোষিক দোব।' সেক্‌স্‌পীয়র! শশিকান্ত বাবু বলেন, 'সে কি ঠিক হবে? ইয়ং লেডিকে সেক্‌স্‌পীয়র দেওয়া যায়?' শুনে গিরীশ ক্ষেপে যায়—'তবে কি দেওয়া যায়—'কথামালা'?' মহেশ বললে, 'তা যাবে না কেন? বাউডলারের সংস্করণ আছে।' শশিকান্ত বাবু বললেন, 'তা নয় দিলে; ও বুঝবে কি?' মেম সাহেব বলেন, 'বুঝবে একদিন।' আমি বলি বুঝবে হয় যবে—আপাতত আমাদের ত খাওয়াও এক দিন—তুমি প্রথম হয়েছ, রাঙা মা। তুমি হচ্ছ 'জুয়েল'! রাঁধো দেখি ভালো করে—কি রাঁধবে? ইলশে ভাতে, কি বলো?

সত্যই পরের রবিবারে গিরীশ গঙ্গার ইলিশ লইয়া আসিয়া উপস্থিত। শরৎ গুপ্ত বলিলেন: সে কি! গিরীশ! ইলিশ নিয়ে এলে তুমি!

এনেছি আমি, কিন্তু বলেছে শৈল। আর জানেনই ত—টাকা রাজীবের। তার টাকা পাঠাবার কথা ছিল—তা এসেছে। —বলিয়া আরও পাঁচ টাকা সে গুপ্ত মহাশয়ের সম্মুখে রাখিল।

শরৎ গুপ্ত ছল ক্রোধে বলেন সে পাজি ত মহা পাজি। আমার মেয়েকে টাকা পাঠাচ্ছে—আমাকে না বলে।

রাজীব বলিল, আপনার মেয়ে, ওরও ত বোন।

শরৎ গুপ্ত হাসিয়া উঠিলেন—আর তোমারও ইলিশ-ভাতে খাওয়া চাই, না? —বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

গৃহিণী একান্তে শরৎ গুপ্তকে বলিলেন, রাজীবের চাকরী এখনো ঠিক হয় নি—সে পাঠাল টাকা? ও টাকা গিরীশের—ওর বৃত্তির টাকা

শরৎ গুপ্ত অবাক্ হন। —তাই নাকি? তুমি কি করে বুঝলে?

বুঝতে পারি বলেই বুঝেছি।

দুইজনেই কি ভাবিতে লাগিলেন। গিরীশ উজ্জ্বল নক্ষত্র—তাহাদের সমাজের। বিলাত গেলে বিশেষ ভালো হইত। কথাটা শরৎ গুপ্ত আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আই-সি এসের বয়স আর গিরীশের নাই। খানিক পরে গৃহিণী বলিলেন, না থাক্,একবার কথাটা পাড়ো না।

শরৎ গুপ্ত বললেন: তুমি বলছ?

হাঁ। বিলাতে পাঠাতে হলে ত এমন ছেলেকেই পাঠানো উচিত। তারপর ছাখো মেয়ের অদৃষ্ট!

কিন্তু মহেশের কথা বলছিলে না তুমি—

গৃহিণী বলিলেন, সে তো আছেই। বাপের পয়সায় সে যেতে পারে, যাবেও। সে দেখা যাবে পরে —আরও ত মেয়ে আছে।

কাকে দিয়ে কথাটি পাড়ি তবে?—শৈলকে বলব?

গৃহিণী অবাক্ হইলেন। —কি যে বলো? এমন না হলে তোমাকে 'ঘটীরাম' বলি। তারপর বলিলেন,—শৈল তার কে ?

শরৎ গুপ্ত বুঝিলেন না। বলিলেন: ওঃ! ঠিক। তা হলে দেখছি।

কথাটা সমাজের একজন কর্তাই এক সময় পাড়িবেন।

আহারের শেষে শৈলকে আজ ডাকেন গৃহিণী—এবার পড়ে শোনাবে কিছু।

শৈল লজ্জিত হইলেও উৎফুল্লই হয়।—আরও দুই একবার তাহাকে বলিতে হইবে।

গৃহিণী বলিলেন, ঠিক হয়েছে রাঙা মা, ওই বইটা একটু পড়ো—বা পুরস্কার পেলে।

হঠাৎ শৈল'র মুখ শুষ্ক হইয়া গেল—সেক্স্‌পীয়র! এখনো সে ইংরেজিতে লেখা সব সময়ে পড়িয়া উঠিতে পারে না।

শরৎ গুপ্ত হাসিয়া বলিলেন: তুমি ক্ষেপেছ? আমরা সেক্স্‌পীয়র পড়তে হিম সিম খাই।'

ও মা! তবে যে চিন্মোহিনী সম্মোহিনী তা আবৃত্তি করে?

শরৎ গুপ্ত বলেন, ওরা কতদিন পড়ছে। আর ওদের ইস্কুলে তা শেখায়।

গৃহিণী বলিলেন, এ ইস্কুলে কি শিখে তবে শৈলরা—অত যে মেমসাহেব বড়াই করে।

শিখাইয়াছে বৈ কি? এই কয় মাসে সহজ শব্দের ইংরেজি রচনা তাহারা পড়িতে পারে। এমন কি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে শৈল কথা বলিতেও পারে।

আবৃত্তি?

শৈলী অধোবদন হয়। জানিলেও সাহস পায় না।

গৃহিণী বলেন, নাও, চিন্মহিনী তবে কিছু আবৃত্তি করো—ওঁরা শুনুন। চিন্মোহিনীর এইরূপ আবৃত্তি আরও হয়ত করিতে হয়। সে অপ্রস্তুত হইল না। একটু বলিতেই বলিল, কি আবৃত্তি করব বলো?

সেই যে কাল বলছিলে দু'জনা—তুমি আর সনুতে—

সে তো ভিক্তর হুগো—ফ্রেঞ্চ!

শরৎ গুপ্ত হাসিয়া বলিলেন—ফ্রেঞ্চ। আমরা একবর্ণও বুঝব না।

গৃহিনী বলিলেন; তুমি ত বুঝবে, না গিরীশ?

গিরীশ গম্ভীরভাবে জানাইল—না।

তবে একমাত্র চিন্নুর মা বুঝ্‌বেন।—শরৎ গুপ্ত সহজ গল্প ও পরিহাসে কথাটা হাল্কা করিতেছিলেন।

গৃহিণীও ছাড়িলেন না, বলিলেন, ঠিকই। আমার কাছে ইংরেজিও যা, ফরাসীও তা। কিন্তু, ওঁরা যখন ইংরেজী বোঝেন ওদের ইংরেজিই শোনাও কিছু চিন্নু—

চিন্মোহিনী বলিল; কি শোনাব? সেক্‌সপীয়র থেকেই তবে নিই—

চিন্নু আরম্ভ করিল 'দি কোয়ালিটি অব মার্সি ইজ নট্ স্ট্রেন্‌ড্‌—মেমসাহেবদের নিকট শেখা বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও ভঙ্গী!

গৃহিণী গর্বে আনন্দে উৎফুল্ল। গিরীশের চোখের দিকে মাঝে মাঝে তাকাইয়া যেন নীরবে জিজ্ঞাসা করেন, আশ্চর্য নয় কি?

আবৃত্তি শেষ হইলে গিরীশ বলে, চমৎকার!

গৃহিণী বলেন, কিন্তু আমি ত একবর্ণও বুঝলাম না। বরং শৈল, তুমি একটা বাঙলা আবৃত্তি করো—আমি একটু শুনি।

ফরাসী, ইংরেজি—তাহার কাছে বাংলা! শৈল কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইবে না। শরৎ গুপ্তও বলিলেন, বেশ ত, তুমি একটু হেমচন্দ্রের 'রমণী-বিলাপ' শোনাও।

শৈল মিথ্যা করিয়াই বলিল, আমি তা শিখিনি কাকাবাবু।

গৃহিণী এবার বলিলেন—তা কেন শৈল, তোমাদের ইস্কুলেও ত আবৃত্তি শেখায়। স্কুলের শিক্ষার কথা তুলিয়া তিনি প্রস্তাব করিলেন—এখন একটু বিশ্রাম করো সকলে।—এসো গিরীশ!

গিরীশ জানাইল—না, আমি মেসেই যাব। শৈলীর সঙ্গে রাজীবের কথাটা বলে নিই।

কৃতজ্ঞতায় শৈলীর মন দুলিয়া উঠিল। বিজয়ীর মত সে দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—আমি ফ্রেঞ্চ শিখবই।

গিরীশ বলিল: নিশ্চয়ই! ফ্রেঞ্চ আমি জানি।

কুমদিনীদের আগমনের পর হইতেই গৃহে স্থানাভাব। রাজীব তাই রাত্রিতে স্কুলগৃহেই শয়ন করে। সেদিনও আহারান্তে রাজীব শুইতে যাইতেছিল—পথে হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে তাহার মাথায় দারুণ আঘাত অনুভব করিল। 'মাগো!' বলিয়া রাজীব আর্তনাদ করিয়া পড়িতে পড়িতেও ফিরিয়া দাঁড়াইল। প্রকাণ্ড লাঠী হাতে লোকটা আর এক ঘা মারিবার জন্য লাঠী তুলিয়াছে। বুঝিবামাত্র রাজীব তাহার উদ্দেশে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তাহাকে ধরিতে গেল। আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, কিন্তু রাজীবও লোকটাকে ধরিতে পারিল না, পালাইবার জন্য সে ছুটিল। 'গুণ্ডা!' 'গুণ্ডা!' বলিয়া রাজীব চীৎকার করিয়া পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিন্তু কি যেন ঘাড়ের উপর গড়াইয়া পড়িতেছে। রাজীব হাত দিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিতে গেল। হাতে এ কি লাগিল? রক্ত! রাজীব চৌধুরীর গতি শিথিল হইতেছিল, এইবার সে শঙ্কানুভব করিল। তারপর মাথা কেমন করিতে লাগিল। কিছু ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল রাজীব।—আর মনে নাই! দুই দিন দুই রাত্রি চৈতন্যও হয় নাই।

শহরে ডাক্তার ও ঔষধপত্রের অভাব হইল না চিন্তাহরণ মনোরমা এবং কুমুদিনীর মাতা ও কুমুদিনী রাজীবের প্রাণরক্ষায় সমস্ত শক্তি ঢালিয়া দিল। প্রাণের আশাও ক্রমে দেখা দিল। কুমুদিনীর মায়ের সন্দেহ মাত্র নাই—রাজীব চৌধুরীর প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছে সেই ক্যাথোলিক পাদ্রীরাই; এবং এমন মানুষের প্রাণ যাইতেছে তাহাদের জন্যই—তাহাদেরই দায়ে, তাহাদেরই পাপে।

ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি চিন্তাহরণের সহিত উপাসনায় যোগদান করেন। কিন্তু মনে মনে বলেন, মধুসূদন তুমি ত কত পাপীকে ত্রাণ করিতেছ।

আমাদের দিকেও মুখ তুলিয়া চাহিও। শাস্তি দিতে হয়, আমাকে দাও,—আমিই পাপিষ্ঠা। নিরপরাধ মহৎ যুবকের প্রাণ তুমি রক্ষা করো, রক্ষা করো!

কিন্তু কিছুতেই তাঁহার ভরসা হয় না। ঠাকুর দেবতার পূজাও যদি তিনি দিতে পারিতেন! একবার শেষে মনোরমাকে বলেন, ওই পার্শ্বের বাড়ির লক্ষ্মীনারায়ণের পূজার নির্ম্মাল্য একটু শিয়রে রাখলে হয়—ওরা বলছিল।

মনোরমা বিস্মিত হয়, বলে, সে কি! লক্ষ্মী-নারায়ণের নির্মাল্য।

ক্ষতি কি? ওরা বলছিল কত লোকের তাতে রোগ সেরে গিয়েছে।

ক্ষতি নয়? ওঁরা যে জানলে খুন হবেন।

ওরা জানবে কেন? না বললেই হবে।

মনোরমা দৃঢ়স্বরে বলে: না। প্রতারণা আমি করতে পারব না।

কুমুদিনীর মা বলেন, প্রতারণা কি? ওঁরা ঠাকুর দেবতা না মানুন, আমরা ত মানি?

না। —মনোরমা থামে, পরে দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করে, আমি মানি না।

কুমুদিনীর মা বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকেন। এত বৎসর খ্রীষ্টানের সঙ্গে জীবন-যাপন করিয়াও সে যে দেবতাতে অবস্থা হারায় নাই, মনোরমা কেমন করিয়া বলিতে পারে—তাহাকে মানি না?

নীরবেই তিনি আপন মনে প্রার্থনা করেন, নারায়ণ! মধুসূদন! তুমিই যে বিপদ-ভঞ্জন। মুখ তুলিয়া চাহ, ঠাকুর।

গিরীশ কলিকাতা হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সকলে কলিকাতায় স্থির করিয়াছে আপাতত রাজীবের কলিকাতায় চিকিৎসা করা চাই। চার টাকায় ভবানীপুরে কাঁসারিপাড়ায় গিরীশ তাই বাড়ি ভাড়া করিয়া আসিয়াছে। কুমুদিনী ও কুমুদিনীর মায়েরও কলিকাতায় যত শীঘ্র সম্ভব যাওয়া প্রয়োজন। এখানে অবস্থানে তাহাদের বিপদ বাড়িবে মাত্র।

রাজীব চলৎশক্তিহীন নয়। কিন্তু সে ঢাকা ছাড়িবে কেন? কাহার ভয়ে? এই ত, এখানেই ত তাহার বীরত্বের পরিচয়।

একদিন চিত্রিসার হইতে রাজীবের খুল্লতাত পুত্র 'বড়দাদা' অনন্ত চৌধুরী আসিলেন.। অনন্ত চৌধুরী মূর্খ গেঁয়ার মানুষ—রাজীবকে ভালোবাসেন। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই তিনি বলিলেন, মুখদর্শন করব না, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। পারলাম না, ছোটখুড়ীই আমাকে অস্থির করে তুললেন,—'একবার তাকে দেখে এসো—প্রাণে যেন সে বাঁচে।'—অনন্ত চৌধুরী বলিয়া যান,—প্রাণে মারবার মালিকটা কবে থেকে হল রে রাঘব? তুমি না হয় শৈলীটাকে চুরি করে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ওই রাঘব, কি করছে গ্রামে তা কে না জানে? এখানে এসে মহল্লার সর্দারদের লাগিয়েছে—'রাজীবকে খুন করবি'।—একবার রাঘবকে পেলে দেখতাম খুন কি করে করতে হয়। না, রাঘব এখন চিত্রিসারে থাকে না। বাড়ী খালি। ছোট খুড়ী ছাড়া কেউ নেই—খেতে পরতে কে দেবে? তুমি ত আমাদের ভুলেছ—বিভূতি ত এবার ইমতাহান দেবে। পুরণো রায়ত জন খাইয়ে রাখে, তাই আছি বেঁচে—

রাজীবও চিন্তাহরণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে—রাজীবকে মারিবার জন্য রাঘবই গুণ্ডা ভাড়া করিয়াছিল! অনন্তের অফুরন্ত সরল কাহিনী আর শুনিতেও পায় না।

অনন্ত চৌধুরী যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল—তা হলে তুমি ভালো আছ, তাই বলব ছোটখুড়ীকে।

রাজীব দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল: হাঁ। তারপর থামিল, কি ভাবিল, বলিল, একটু দাঁড়াও।

কথামত চিন্তাহরণ কি আনিয়া দিল। রাজীব অনন্তকে কাছে ডাকিল বলিল, আমি কলিকাতা যাচ্ছি, আর ফিরব না এখানে—এই টাকা ক'টা তুমি নাও, বড় দাদা।

অনন্ত চৌধুরী কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল। কেমন সঙ্কোচের সঙ্গে বলিল, বাড়ি ঘরে তাহলে আর আসবে না? বাড়িটা মনে রেখো তবু—

মনে রাখিবে? হাঁ, রাজীব মনে রাখিবে—চৌধুরী বাড়ি আর নাই, আর চিত্রিসারের গ্রামও নাই; রাজীব চৌধুরীর নিকটে উহাদের আর অস্তিত্ব নাই।

প্রয়োজনও নাই তাহাতে। বিপুল সংসারে রাজীবের আজ কোনো বাধা নাই। সম্মুখে, দিগন্ত বিস্তৃত জীবনক্ষেত্রে, জাতীয় জাগরণের বিরাট আয়োজনে। এইবার রাজীব আপনাকে এই কর্মস্রোতে ঢালিয়া দিতে পারিবে। একমেবাদ্বিতীয়মের সংগ্রাম, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ—রাজীব চৌধুরী আজ সমস্ত বন্ধন মুক্ত হইয়া তাহা গ্রহণ করিল। অভাবই বা কি তাহার এই সংসারে?—তাহার বন্ধু আছে—চিন্তাহরণ, গিরীশ; আত্মীয় আছে শৈলী; কৃতজ্ঞ হিতাকাঙ্ক্ষীও আছে—কুমুদিনীর মা ও কুমুদিনী মনোরমা; সকৃতজ্ঞ নারীর শুভ আশির্বাদও তাহার মাথায় আজ জয় টিকা আঁকিয়া দিয়াছে—রাজীবের কি চাই আবার?

•

জোয়ারের স্রোতের মুখে আসিয়া পড়িল রাজীব।

হিন্দু মেলায় সে গিয়াছিল বিশেষ করিয়া 'মহাব্যায়াম প্রদর্শনী' দেখিতে। দেখিয়া সে উৎফুল্ল হইল। কিন্তু সেই সময়েই দেখিল আবার মনোমোহন বসুর 'হরিশ্চন্দ্র নাটক',। শুনিল উহার গান:

> দিনের পর দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন।
> অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অপমানে তবু ক্ষীণ! ..
> ছুই, সূতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
> দীয়াশলাই কাটী, তাও আসে পোতে,
> প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে শুতে যেতে
> কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।"

প্রত্যেকটি কথা মনে করাইয়া দেয় চিত্রিসারের পুরাতন তাঁতী পাড়ার কথা, কামারপাড়ার কথা। চৌধুরীরা তাহাকে বর্জন করিয়াছে, কিন্তু রাজীব এই চিত্রিসারকে ভুলিতে পারিতেছে না—ইহা যে তাহার দেশেরই রূপ। 'কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন'—মনে পড়ে—তাহার দীক্ষাদিনের জীবন সংকল্প; আর সুরের টানে মনে পড়ে দূরের, বহু দূরের সেই স্বাধীনতার বীর সাধকের মূর্তি—দেব নন্দন ওঝা।

গিরীশের 'হিন্দু মেলার' উপরে বিরাগ,—আসলে উহা 'জাতীয় মেলা' নয়; হিন্দুদের ব্যাপার, তাহারা ব্রাহ্মরা উহার সহিত সম্পর্ক রাখে কেন? দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্ররা ও রাজনারাণ বসু নবগোপাল মিত্রের সহিত মিলিয়া সং সাজাইয়া এইভাবেই হিন্দুধর্ম ও আচার প্রচ্ছন্নভাবে প্রচার করে। রাজীব প্রতিবাদ করিতে যায়—উহা 'জাতীয় মেলা'। পাড়ায় পাড়ায় উহার চেষ্টাতেই ব্যায়াম অনুশীলন প্রসারলাভ করিতেছে।

মহেশ দত্ত তাহাতে ব্যঙ্গ করে। গিরীশ তাহাতে সায় দেয়, গিরীশের সঙ্গে রাজীবের তাই মতান্তরও হয়।

এদিকে শরীর দুর্বল। কুমুদিনীর মা ও কুমুদিনী ছাড়াও সেই গৃহে তাহার সেবার জন্য শৈলও আসিয়া রহিয়াছে। মিসেস্ জেনিংস রাজী হন; কারণ মিষ্টার গাঙুলি শৈলকে পড়িতে সাহায্য করিবে।

দুই-একদিন পরে-পরেই শরৎগুপ্ত সপরিবারে দেখিতে আসেন— গৃহিণীও আসেন—রাঙা মায়ের খোঁজও তাঁহার না করিলে নয়। গিরীশ, রাজীবও তাঁহাদের পরম স্নেহভাজন, সমাজের আশা ত ইহারাই। রাজীবের মত মানুষ সমাজের শক্তি, গিরীশ সমাজের গৌরব।

গাড়ীতে ফিরিতে ফিরিতে মহেশ দত্ত বলে, হুঁ। কিন্তু গিরীশ এবার কি করে দেখুন।

শরৎগুপ্ত বলিলেন, কেন? পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে বলে? হোক্, রাজীব তার বন্ধু, তাকে দেখবে না?

মহেশ বলিল, রাজীব না হয় অসুস্থ, দেখুক তাকে। কিন্তু তার বোন্‌কেও গিরীশের পড়াতে হবে কেন? শৈলরও বা ওবাড়িতে কি প্রয়োজন? গিরীশের নিজের পড়াশুনা নেই?

শরৎগুপ্ত তবু বলিলেন, গিরীশকে তা বলতে হবে না।

না হলেই ভালো।—মহেশ বক্রভাবে মন্তব্য করিয়া চুপ করে। তারপর নিজেই বলে,—কি জানেন, বাঙালের গোঁ।

শরৎগুপ্ত হাসিয়া উঠেন। বলেন, কিন্তু বলছ কাকে? আর গোঁ বলছ, তোমাদেব বিদ্যাসাগরের কি? শিবনাথ শাস্ত্রীর কি? আর রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথেরই বা কি? আমরা তো তোমাদের পিছনে-পিছনে ছুটছি।

তা নয়, বাবা বলেন—'ওই বাঙালদের সবতাতেই বাড়াবাড়ি, মাত্রাজ্ঞান নেই।'

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন শরৎগুপ্ত।

কিন্তু গিরীশ তাহাদের সমাজের গৌরব। তাই গৃহিণী বাড়ি ফিরিয়া বলিলেন, সত্যকথা, এখন ত সেরে উঠছে রাজীব, বাইরেও যায়। শৈলী বাড়ি চলে আসতে পারে। গিরীশেরও সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।

গৃহিণীর পরামর্শ মত শরৎগুপ্ত গিরীশকে বলিলেন, ওহে গিরীশ, রাজীব ত সেরে উঠেছে। ওরা বলছিল—'বাঙালদের বাড়াবাড়ি, গিরীশ পরীক্ষাটা খারাপ না করলে হয়।'

গিরীশ বলিল, 'ওরাটা' কে? মহেশ ত? তার অত ভাবনা কেন?

শরৎগুপ্ত বলিলেন, না, না। সে সব কথা নয়,—কিন্তু তোমাকে দিয়ে আমাদের সমাজের সুনাম।

গিরীশ বলিল, ভাব্‌ছেন—আমি তা বজায় রাখতে পারব না? বল্‌লেন না কেন, বাঙালের গোঁ ত মহেশ জানে, দেখে নেয় যেন ফার্ষ্ট কে হয়।

গৃহিণী সব শুনিয়া বলিলেন, তোমার কোন বুদ্ধি নেই।

শরৎ গুপ্ত হতবুদ্ধি হন, বলেন, কেন?

নেই বলে।

নেই ঠিক, কিন্তু কিসে তা বুঝলে?

দু'জন যুবকের বাড়ি, মেয়েদের ওবাড়িতে রাখা যায় কি? শৈলকে সেখানে রাখা আর ঠিক নয়।

শরৎগুপ্ত হাসিয়া বলিলেন, এই! একথা আর আমি ভাবি নি? এখন ত কুমুদিনীর মা, কুমুদিনীও রয়েছে সে বাড়িতে। আমরা ঠিক করেছি—ছাত্রীরা ত দিনে দিনে সংখ্যায় বাড়ছে, তোমার বাড়িতে কত রাখবে? একটা ভিন্ন বাড়ি চাই—আমাদের বাড়ির কাছে এই মেয়েদের একটা বাড়ি ভাড়া করব। বালিকা বিদ্যালয়ের এখন সুদিন আসছে।

উৎফুল্ল মুখে শরৎ গুপ্ত গৃহিণীর দিকে তাকাইলেন,—বুঝলে? এখন বলো—বুদ্ধি আছে, না, নেই।

গৃহিণী তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। শরৎ গুপ্ত বলিলেন, কি, বলো?

গৃহিণী বলিলেন: না, তোমার বুদ্ধি অতি প্রকাণ্ড—প্রায় হাতীর মত।—বলিয়া হাসিয়া ফেলিলেন—হাতীর ত বুদ্ধি কম নয়, তবু লোকে বলে হস্তিমূর্খ।

আকারে গৃহিণীও নেহাৎ তন্বীশ্যামা নহেন। তবু কথাটা শরৎ গুপ্তের প্রতিই তিনি প্রয়োগ করেন—পরিহাসচ্ছলে। দুইজনে তাই হাসিতে লাগিলেন।

কিন্তু রাজীব সুস্থ হইলেও শৈলী তাহার কাছেই রহিল,—কুমুদিনীর মাও অন্যত্র যাইতে রাজী নন। ইতিমধ্যে কাঁসারিপাড়ার

গৃহ যে মহেশের ও আরও দুই একটি সংস্কারব্রতী যুবকের পক্ষেও আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কাহারও জানিতে বাকি রহিল না।

শরৎগুপ্তের গৃহিণী গম্ভীরভাবেই রাজীবকে বলিলেন, তোমাদের এটা পুরুষদের বাড়ি। আমি রাঙা মাকে ও কুমুদিনীকে আর এখানে রাখতে চাই না।

গিরীশ তখন গৃহে নাই। বাড়ি ফিরিয়া গিরীশ শুনিয়া একটু গম্ভীর হইল বলিল: ছেলেতে-মেয়েতে দেখা সাক্ষাতে দোষটা কি? তোমরা মিলের 'লিবার্টি' পড়ো—আর এ সব বলো।

রাজীব বলিল, দোষ কে বল্‌ছে? তবে ওরা অবিবাহিতা মেয়ে।

গিরীশের স্বর একটু তীক্ষ্ণ হইল।—তাই বলে তাদের খোয়াড়ে পুরে রাখবেন না কি মিসেস গুপ্তা?

রাজীবও গোঁয়ার কম নয়। মিসেস গুপ্তার হৃদয়বত্তার পরিচয় কি গিরীশ জানে না? চটিয়া বলিল: তা না হোক্, তবে কি কোর্টশিপের ব্যবস্থা করবেন নাকি ছেলেতে মেয়েতে?

হবে না কেন কোর্টশিপ্—যদি তারা মানুষ হয়?—বলিয়াই গিরীশ বুঝিল, একটু উৎকট শোনাইল কথাটা। তাই বলিল, অবশ্য মাত্রা আছে তাতেও—যেমন সব জিনিসরই আছে মাত্রা।

রাজীব তর্কে পারিবে না—মিল, বেন্থাম, কোঁৎ সে কতটুকু জানে? কিন্তু ওই মহেশ দত্তটাকে তাহার ভালো লাগে না। চালবাজ! মেয়েদের কাছে বলিতে ব্যস্ত—আগামী বৎসর বিলাত যাইবে,—বাপের মরুব্বি কোন্ সাহেব কি চিঠি তাহাকে দিতেছে।

গিরীশ এই বিষয়ে একমত।—ওটা 'ফুল এণ্ড নেব'। সাহেবদের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে চাকরী বাগাবার জন্য। চাকরি না পেলে বিলাত যাবে, তা ঠিক। এবং ফিরে এসে ভালো চাকরি ও ভালো পাত্রী দুইই পাবে,—বলিয়া গিরীশ হাসিল।

রাজীব বলিল, এইটা আমাদের সমাজ থেকে বন্ধ করা দরকার—এই সরকারী চাকরি আর সাহেবদের দুয়ারে ধর্ণা দেওয়া।

গিরীশ আপত্তি করিল, কেন? পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা দেখিয়ে চাকরি নিক না। সাহেবদের সঙ্গেও মানুষের মত মিশুক। সাহেবরাও তা'ই চায়—মানুষ হও, যোগ্যতা দেখাও। মানুষের সঙ্গে তারা মানুষের মত মিশতে জানে।

কিন্তু সত্যই কি তাহা? রাজীবের সেইরূপ বিশ্বাস নয়। সেই ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে মারামারির ব্যাপার, শৈলীর মামলায় তাহাদের ব্রিটিশ তোষণের কৌশল, কেশবচন্দ্রের মত মানুষের ইংরেজদের প্রতি ভক্তি, সব জিনিসেই সে দেখিয়াছে— তাহারা ব্রাহ্মরা সাহেবদের অনুগ্রহলাভের পথেই নিজেদের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের পথ সুগম করিতে চায়। এমন কি, তজ্জন্য দেশের লোককে সাহেবদের নিকট হীন করিতেও কেহ কেহ কুণ্ঠিত নয়। ঠিক সেই কৌশলেই তাহারা আবার সাহেবদের খুশী করিয়া ভালো চাকরি ও সাংসারিক সুখ-সুবিধা অর্জনেও যত্নপর। 'বেইমানী! বেইমানী।'—দেবনন্দন ওঝার সেই তিরস্কার রাজীবের ইহা দেখিয়া বারে বারে কানে বাজে। ইহা দেশের সঙ্গে, বিধাতার সঙ্গেও বেইমানী। সত্যকে আশ্রয় করিতে হইলে অন্ততঃ এই সরকারী চাকরি ও সাহেব-সেবা বর্জন করিতেই হইবে। এই ধারণা তাহার ও চিন্তাহরণের ক্রমশঃই দৃঢ় হইয়াছে। কিন্তু গিরীশ মনে করে ইহা রাজীবের আর একটা গোঁড়ামি। গিরীশ নিজেও আনন্দমোহন বসুর স্টুডেণ্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের সভ্য, সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার ভক্ত; কিন্তু রাজীবের মত এই ধরণের গোঁড়ামি তাহার নাই। ইহা নি সন্দেহ—ইংরেজের শিক্ষা-দীক্ষা, সুশাসনেই এই দেশের উন্নতি। নিজের যোগ্যতা দ্বারা গিরীশ ইংরেজের সমকক্ষ হইবে, চাকরি লাভ করিবে—অবশ্য এম-এ পাশ করিলে।

রাজীব সুস্থ হইতে না হইতেই এম-এ পরীক্ষা শেষ হয়, আর তাহা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে শুনিতে পায়—গিরীশ এম-এ পরীক্ষায় সগৌরবে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। রাজীব ও শৈলীর আনন্দের সীমা থাকে না। গিরীশ যে প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হইবে না, ইহাতে কি আবার সন্দেহ ছিল?

শরৎ গুপ্ত রাজীবকে বলেন: গিরীশ বিলাত যাক না, রাজীব? তুমি একবার বলবে?—অর্থ সাহায্য আমরা দেখব না হয়—

গিরীশ রাজীবকে জানাইল, গেলে নিজের উপার্জনে যাব। কিন্তু সে সময় এখন নেই, এখন প্রথম পাশ করব চাকরির পরীক্ষা! তুমি রাগ করবে। কিন্তু তুমি ততক্ষণ স্বাস্থ্যলাভ করে প্রস্তুত হও—ডাক্তারি পড়ো; দাদাও পাশ করুন্। তারপরে লাগো তোমরা সংস্কারকর্মে—আমি আছি।

রাজীব আপত্তি করে, তুমি ব্যারিস্টার হও, বাগ্মী হও। কিন্তু গিরীশ শুনিবে না, তাহার উপার্জ্জন করা এখনি প্রয়োজন।

দুই বন্ধুতে তবু একমত তাহারা—যাহাই করুক, রিফর্ম করিতে হইবে সমাজ।

রাজীব শিক্ষকতা করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক পড়িবে ও শিখিবে। দুই জনায় প্ল্যান করে, ডাক্তার হইয়া সমাজের কার্যে রাজীব আত্মনিয়োগ করিবে। অবশ্য শৈলর কথাও রাজীবকে সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে হইবে। তাহাকে জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত করা তাহার প্রধান দায়িত্ব।

শৈলর ভাবনা?—গিরীশ বলিল-সে তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও।—বেশ গম্ভীর অর্থপূর্ণ তাহার কথা।

তোমার উপর?—রাজীব গিরীশের মুখের দিকে তাকাইল। গিরীশ মুখ তুলিল। স্থির অকম্পিত স্বরে বলিল; হাঁ, আমি বুঝেই বলছি। চাকরির পরীক্ষায় পাশ করলেই আমি তাকে বিয়ে করব।

রাজীব তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল— যেন গিরীশের কথা সে বুঝিতে পারে না।

গিরীশ বলে, কি, তুমি অমত করছ ?

রাজীবের চমক ভাঙে, আমার অমত ?—সে গিরীশকে আলিঙ্গন করিল—এমন ভাগ্য শৈলীর হবে, আমার হবে, তা কল্পনাও করি নি। —তারপর মনে পড়িল, বলিল, কিন্তু গিরীশ, শৈলীর মতামত নিতে হবে। সে পড়বে, শিক্ষা ব্রত নিবে, এই ত ঠিক আছে। তবু বুঝিয়ে বল্‌লে তার মত হবে, নিশ্চয়ই—

গিরীশ এবার একটু লজ্জিত হইল, তার মত আছে।

এইবার বুঝিতে কষ্ট হয়না—কেন রাজীব বিলাতও গেল না, কেন সে চাকরির পরীক্ষা পাশ করিতেছে, এবং গুপ্ত মহাশয়রাও কেন শৈলীকে তাহাদের নিকট হইতে দূরে রাখিতে চাহিতেছিলেন !

অদ্ভুত মনে হইল সেদিন রাজীবের নিকট পৃথিবী। সে জানে মানুষ প্রেমে পড়ে, কিন্তু তাহা নাটকে নবেলে, অথবা বিলাতে। এদেশে মানুষ বিবাহ করে, তারপর তাহাদের মধ্যে প্রেম জন্মে। আর না হইলে করে গুপ্ত প্রেম, অবৈধ প্রণয়—কুৎসিৎ, দুর্নীতি তাহা। কিন্তু নাটকে নয়, নবেলে নয়, তাহারই চোখের সম্মুখে তাহারই বন্ধু গিরীশ,—আর সেই তাহার ভগ্নী শৈলী—যাহাকে রাজীব টানিয়া না আনিলে সে বুঝি সেই কৌলিন্যের কর্দমেই ডুবিয়া মরিত—সেই শৈলীও কিনা সেই রোমান্সের জগৎকে এই মাটির জগতে জীয়াইয়া তুলিতেছে ! রাজীব এখনো যেন এত অসম্ভবকে সম্ভব মনে করিতে পারে না।

কিন্তু রাজীব পরম আনন্দ অনুভব করে—তাহার ভগ্নী শৈলী ও তাহার বন্ধু গিরীশ, ইহাদের সম্মেলন, এমন সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে ?

সঙ্গে সঙ্গে আবার অনুভব করে—এই পৃথিবীতে এবার তাহার আর

দায়িত্ব থাকিবে না। শৈলীও আর তাহার নাই। কে তবে তাহার আপনার বলিতে রহিল ?

গিরীশ চাকরি পরীক্ষায় পাশ করিতেই আপন অভিপ্রায় অন্যদের নিকটও সে প্রকাশ করিল—সে শৈলকে বিবাহ করিবে।

সকলেই আনন্দিত—আশ্চর্যান্বিতও গিরিশ করিবে শৈলকে বিবাহ। সমাজের উজ্জ্বল নক্ষত্র সে, আর শৈল শরৎ গুপ্তের আশ্রিতা কন্যা মাত্র। সত্যই ব্রাহ্ম সমাজে আদর্শবাদের একটা সদ্দৃষ্টান্ত গিরীশ।

শরৎ গুপ্তের গৃহিণী বলিলেন : ছেলেটি ভালো ছিল। সিন্মোহিনীর সঙ্গে মানাত ?

গুপ্ত মহাশয় বলিলেন : না। বিলাত ফেরৎ না, সিনুর কেমন লাগত ?

গৃহিণী বলিলেন, আগেই গিরীশ দেখেছিল শৈলকে। প্রথম থেকেই মনে মনে ঠিকও করেছিল। তাই চাকরির পরীক্ষা দিলে তাড়াতাড়ি।

তা হবে। শৈলও চমৎকার দেখতে।

হ্যাঁ। ভালোই—বড় সড়।—তবে একটু ইয়ে—

শরৎ গুপ্ত বলেন, ইয়ে, মানে ?—

গৃহিণী তাড়াতাড়ি বলেন, আমি বলছিলাম—শৈল বুদ্ধিমতী।

গুপ্ত মহাশয় হাসিলেন, বলিলেন, আমাদের চিনু-সনু থেকে বেশী বুদ্ধিমতী নয়, তা বলে।

গৃহিণী প্রীতা হইলেন। বলিলেন, তা নয়। তবে সব তাতে একটু বেশি-বেশি শৈল'র।

গুপ্ত মহাশয় বুঝাইয়া বলেন : গ্রামে ছিল। তাল পায় না প্রথম প্রথম এখনো।

চিনু-সনুর জন্য কিন্তু এখন ভাবতে হয়।

তা ত ভাবছি—বিলাত থেকে আসুক ফিরে সেই ছেলেরা।

গৃহিণী কিছুক্ষণ পরে বলিলেন: আমি কিন্তু শৈলকে একটা ভালো কিছু দোব—ডায়মণ্ড কাটা বালা।

ও বাবা! এত!—কিন্তু শৈলকে কেন শুধু, তোমার ত আরও মেয়ে আছে। একটি সে মেয়ের বিয়ে দিলে মাত্র। অন্য মেয়েদের কি হবে? স্বর্ণময়ী, কুমুদিনী।

প্রসন্ন হাস্যে গৃহিণী বল্লেন, দিতে হবে। আগে ছেলে আসুক তাদের জন্য।

শৈল নূতন সংসার পাতিয়া প্রথম কিছুদিনের মত কলিকাতায় বসিল। তারপরেই তাহার সংসার সচল হইয়া উঠিল—কখনো লাহোরে, কখনো বোম্বাই, কখনো মাদ্রাজে চলিল। গিরীশের উদ্যোগ, কর্মশক্তি অসাধারণ; তাহার পদবৃদ্ধিই বা ঠেকাইবে কে? আর তাহার সেই জয়রথে শৈল সারথি।

চিন্তাহরণ মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। প্রথম দীক্ষাদিনের সেই আন্তরিক প্রতিজ্ঞার ও কঠিন পরীক্ষার দিনগুলি ঝাপ্‌সা হইয়া যায় নাই। সেদিন তিনজনেই তাঁহারা ব্রাহ্মধর্মের নামে আত্ম-নিবেদন করিয়াছিল। গিরীশ তেজস্বী প্রকৃতির, সে চাহিয়াছিল আপনার যোগ্যতার সমাদর, ইংরেজের মত আত্ম-উন্নতির অবকাশ। চিন্তাহরণ নিজেকে বুঝায়—আপনার সেই ভাবনানুযায়ীই গিরীশ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। না, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। রাজীবও তেমনি কর্মজীবনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে ; সে কর্মীপুরুষ, ইহাই তাহার পরিচয়। কিন্তু সে চিন্তাহরণ? সেদিন সে ভাবিয়াছিল—ধর্মসাধনা ও ধর্ম-প্রচারই তাহার জীবনের ব্রত। কোথায় তাহার সেই আদর্শ? সেই ব্রহ্মসাধনা কি আদর্শ ব্রাহ্ম-পরিবার গঠনের নামে সে একটু-একটু করিয়া পরিত্যাগ করিতেছে? শিশুসন্তান ও সামান্য আয়ের সংসার পরিচালনা করিতে করিতে ইদানীং মনোরমা আর পড়াশুনার সময় পায় না, চিন্তাহরণই বা আর তাহাকে পড়িতে বসিবার জন্য আর বলে কিরূপে? আসলে তাহার পারিবারিক জীবন গতানুগতিক নিয়মে গঠিত হইতে চলিয়াছে।

অথচ সমাজ ও ধর্মে সমস্যা জটিল হইয়া উঠিতেছে—কেশবচন্দ্র অগ্রবর্তী ব্রাহ্মদের মতামতানুযায়ী সমাজ পরিচালনায় অনিচ্ছুক। স্ত্রী-স্বাধীনতায় তিনি কুণ্ঠিত হন, জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি উদাসীন, সমাজে গণতান্ত্রিক নীতি-নিয়ম প্রবর্তনের তিনি বিরোধী। রাজীব লিখিতেছে—কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ ক্রমেই অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিতেছে। চিন্তাহরণ কিন্তু দুঃখিত বোধ করে—কেশবচন্দ্র সত্যই

ভক্ত! চিন্তাহরণ ধর্মসংস্কার অপেক্ষা ধর্ম-সাধনাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করিতে পারে না। বিশেষত সে দেখিতেছে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকেও। কিন্তু কি করিবে চিন্তাহরণ এই সংকটে? কেবলই পারিবারিক কর্তব্যে জড়াইয়া পড়িতেছে—রাজীবের মতও কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

মনোরমার বুঝিতে বিলম্ব হয় না—চিন্তাহরণ কোন ভাবনায় পীড়িত।

কিন্তু কেন তাহার এই মর্মপীড়া? মনোরমার জন্য কি? সে ত চিন্তাহরণের আদর্শকে আপনার আদর্শ করিয়াছে; শুধু আচরণে নয়, সত্যই সে একমেবাদ্বিতীয়ং-এও বিশ্বাসী। ব্রাহ্মাদর্শের ত্যাগ, কঠিন জীবনও সে কি স্বীকার করে নাই? ভয় কি তাহাতে? তাহার প্রাণভরা সুখের মধ্যে চরম সুখ রূপে আসিয়াছে তাহার পুত্র—চিন্তাহরণের দান। তাই কি এই সংশয় চিন্তাহরণের?

মনোরমা শিশুকে জড়াইয়া ধরে—কেমন করিয়া মনে হয় সে তাহার অন্তরের অন্তর, আপনারও আপন। চিন্তাহরণই কি তাহা না ভাবিয়া পারে? পারে না,—মনোরমা জানে—পারে না। তাই চিন্তাহরণের এত সংশয়—পাছে সে অধ্যাত্মসাধনায় পত্নী পুত্রের প্রতি অবিচার করিয়া বসে। সত্যই আশঙ্কার কারণ আছে। সংসারে তাহাদের অভাব কমে নাই। এখন আরও একটু দুগ্ধ চাই, আরও একটু আয়োজন চাই, আরও একটু স্থান চাই—নূতন প্রাণ-কণিকা এই দাবী ত নানা ভাবেই জানায়। তাই কি চিন্তাহরণ ভয় পায়? ভাবিত হয়? কেন মুখ ফুটিয়া সে মনোরমাকে বলে না—চিন্তাহরণ দেখিবে মনোরমা গাছতলাতেই তাহার সহিত গিয়া থাকিবে, সেখানেই মনোরমা মানুষ করিবে চিন্তাহরণের শিশুকে।

অভাব হয়ত কিছুটা দূরও হইতে পারিত। মনোরমারই আগ্রহে চিন্তাহরণ বি-এ পড়িয়াছিল, পরীক্ষা দিতেই পাশ করিয়াছে। স্বভাবতই

সম্মান ও অর্থ দুই-ই এখন লাভ হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তাহরণ পত্র পাইল স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর বনমালী চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতেঃ চিন্তাহরণ সরকারী শিক্ষাবিভাগে যোগদান করিবেন কি? আর সেই সঙ্গে আর-ও একটু জিজ্ঞাসা—বৎসর দশ পূর্বে তিনি যখন ঢাকায় স্কুলের ডিপুটি ইন্‌স্পেক্টর রূপে কাজ করিতেছিলেন তখন স্বর্গীয় দেবপ্রসাদ চৌধুরী নামক একজন শিক্ষকের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। তখন দেবপ্রসাদ চৌধুরীর ছাত্র হিসাবে দুই একটি মেধাবী বালকের সঙ্গে তাঁহার দেখাশুনা হইত; তাহাদের একজন কবিতা লিখিত। বনমালী চাটুজ্জে তাহাদের বিস্মৃত হইতে পারেন নাই—দুই এক সময়ে দুই একটি পত্রে চিন্তাহরণ গাঙুলীর কবিতা ও প্রবন্ধ তিনি দেখিয়াছেন। এবং দেবপ্রসাদ চৌধুরীরর পুত্র বিভূতি চৌধুরী তাঁহাকে বলিয়াছিল—সেই চিন্তাহরণ ঢাকায় শিক্ষক। "সন্দেহ নাই—আপনিই সেই চিন্তাহরণ। আমার অভিপ্রায় আপনাকে শিক্ষা বিভাগে নিয়োগ করিয়া শুধু আপনার বৈষয়িক উন্নতি-সাধন নয়, বরং আপনার সাহিত্য-সেবার পথ সুগম করিয়া তোলা। সত্য কথা, বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিলে আপনার দারিদ্র্য অনিবায, কিন্তু আপনি দেবপ্রসাদ চৌধুরীর ছাত্র হইলে তাহাতে পরাঙ্মুখ হইবেন কি? বরং মধুসূদনের দুর্ভাগ্যই যেন আপনার কাম্য হয়, তবু যেন লক্ষ্মীর নিকট আত্মবিক্রয় না করেন।"

চিন্তাহরণ পত্র পাইয়া বিস্মিত হইল। এই বনমালী চট্টোপাধ্যায়ের নিকট চিন্তাহরণ তাহার প্রথম পদ্য সেই কবে পাঠ করিয়াছিল, এখনো তিনি তাহা মনে রাখিয়াছেন। তখন মধুসূদন সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন, দীনবন্ধুর প্রথম নাটক রচিত হইয়াছে, বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছেন কিনা সন্দেহ—ইংরেজি সাহিত্যের বিমুগ্ধ ভক্ত বনমালী চট্টোপাধ্যায় এই দূর 'পাণ্ডববর্জিত দেশে' বসিয়া তখনই বাঙলা সাহিত্যের উদয়-আশায় অস্থির হইয়া

উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সেই উৎসাহ-ভরা মুখ চিন্তাহরণ ভুলিতে পারে নাই। কিন্তু তেমনি তাহার মনে পড়িতেছে বনমালী চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙালদের' প্রতি অবজ্ঞা এবং কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিদ্রূপ। বাঙালীর একমাত্র আশা তাঁহার নিকট বাঙালীর সাহিত্য। চিন্তাহরণ ভাবিল, হয়ত বনমালী চট্টোপাধ্যায় জানেন না—সেই চিন্তাহরণ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত দৃঢ়বিশ্বাসী ব্রাহ্ম যুবক। জানিলে আর এই প্রস্তাব করিতেন না। কথাটা তাঁহাকে প্রথম জানানো প্রয়োজন।

চিন্তাহরণ বিনীত ধন্যবাদ ও প্রণাম নিবেদন করিয়া কথাটা জানাইল। উত্তরও যথাসময়ে আসিল—দেবপ্রসাদ চৌধুরীর পুত্র বিভূতি চৌধুরীর নিকট বৎসর দুই পূর্বে সেই সংবাদ বনমালী চট্টোপাধ্যায় জ্ঞাত হইয়াছেন। ইহাও জানেন—"ব্রাহ্মসমাজ একবার ভাঙিয়াছে, আর-একবার ভাঙিতে চলিয়াছে, এবং শেষ পর্যন্ত উহাব কি হইবে, তাহা তিনি বলিতে চাহেন না। কিন্তু মধুসূদনও বঙ্কিমের বাঙলা ভাষার মৃত্যু নাই। আর তাহা লইয়া কি করিবেন আপনারা ব্রাহ্মরা যাহাতে অমৃত হইতে পারিবেন না?"

কথাটা তীব্রভাবে আসিয়া চিন্তাহরণকে আঘাত করিল। 'অমৃত!' মনোরমাও তাহার পুত্রের নাম রাখিয়াছে 'অমৃত।' ব্রাহ্মসমাজ তাহাকে এই চেতনা দিয়াছে। সে মৈত্রেয়ী নয়; ইহা কাত্যায়নীর অমৃত! কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ যদি অমৃতের সন্ধান না পাইয়া থাকে তবে কি বাঙলা সাহিত্য দিতে পারে সেই সন্ধান? সাহিত্য-রসকে চিন্তাহরণ অমৃত বলিয়া মানিতে পারে না। এমন কি, জায়া বা পুত্রও সেই আত্মার জন্যই প্রিয়, তাহাও অমৃত নয়। সাহিত্য ত কল্পনার প্রকাশ, কখনো তাহা সত্য নয়। সাহিত্য যত আনন্দদায়ক হউক, সেই আনন্দ-স্বরূপের উহা ছায়ামাত্র। কিন্তু যাহাকে অমৃত বলিয়া চিন্তাহরণ মনে

করে, জ্ঞান, কর্ম, প্রেম, সকলের মূলীভূত সেই সত্যজ্ঞানামৃত—তাহাই সে বরণ করিয়াছে কি? না, তাহা সে করে নাই। কেন তাহা করিতেছে না? পুত্রের নাম অমৃত রাখিলেই হইল?

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্র হইতে আসিয়া এইবার কথাটা চিন্তাহরণের সমস্ত হৃদয়কে বিদ্ধ করিল—তেনাহং কি কুর্যাম যেনাহং নামৃতা স্যাম্। না, বৈর‍্যাগ্যের কথা সে বলিতেছে না—শাশ্বত সেই সুষমার কথাই বলিতেছ—যাহা জ্ঞানের ফল, কর্মের অবলম্বন, এবং প্রেমের পরম সাধনা।

চিন্তাহরণ মনোরমাকে পূর্বেই পত্র দেখাইয়াছিল, আলোচনাও তখন করিয়াছিল। মনোরমা জানিত—চিন্তাহরণ ও রাজীব সরকারী চাকুরির বিরোধী, গিরীশের সরকারী চাকরি গ্রহণে সেই কথাও তখন আলোচিত হইয়াছিল। ইহাও সে বুঝে—অভাব মোচনের একটা সুযোগ সমাগত। তবু মনোরমা বলিল, কিন্তু তুমি সরকারী চাকরি করবে নাকি?

চিন্তাহরণ নিজের মনোগত ইচ্ছা কতকটা গোপন করিয়াই বলিল, ঠিক বুঝছি না। শিক্ষকের বৃত্তি ভিন্ন অন্য বৃত্তি আমি অবলম্বন করব না। সেই হিসাবে সরকারি ইস্কুলে শিক্ষকতা বেশি সুবিধাজনক—ভালো ছাত্ররা সেই ইস্কুলেই পড়ে।

মনোরমা বলে, কিন্তু তুমি ত বলো—স্বাধীন ভাবে শিক্ষাদানের সুযোগ সেখানে নেই। তা ছাড়া, সরকারি চাকরি করবে না, এই ছিল তোমাদের তিনজনার সংকল্প।

কিন্তু—চিন্তাহরণ বলিতে গিয়া থামিল, বলিতে যাইতেছিল 'তখন জানতাম যে আমি ছিলাম একা।'

মনোরমা বুঝিয়াছিল, স্থিরকণ্ঠে বলিল, 'কিন্তু' কি? বলো, থামলে কেন? আমি তোমার ঘাড়ে তখনো চাপি নি?

চিন্তাহরণ হাসিয়া বলিল, না। বরং বলব, তোমাকে জিজ্ঞাসা করা তখন হয়নি। কাজেই সংকল্পটা আমার ঘাড়ে চেপে বসেছিল—আমার ভুলে। এখন তোমার ঘাড়ে তা চাপিয়ে দিতে চাইলে হবে কেন?

মনোরমা বলিল, থাক্। নিজে যদি বুঝে থাক সরকারী চাকুরীতে মনুষ্যত্ব থাকবে না, তাহলে প্রাণ গেলেও আমি তোমাকে তা গ্রহণ করতে দেব না—আমাকে তুমি—মনোরমা কি বলিতে যাইতেছিল, হয় ত বলিতেছিল 'শৈল পাওনি', কিন্তু থামিয়া আত্মসম্বরণ করিল, পরে বলিল 'তেমন মেয়ে পাও নি।'

সেদিনের মত আর বেশি কথা হয় নাই। দ্বিতীয় পত্র পাইয়া চিন্তাহরণ বিচলিত হইল। মনোরমাকে বলিল, পড়ো। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, কি করতে বলো?

মনোরমা বলিল, যা তোমার বিশ্বাস। তোমার বিশ্বাস কি ভেঙেছে?

বিশ্বাস ভাঙবে কি?—চিন্তাহরণ বিমূঢ় বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কিসে বিশ্বাস ভাঙবে—ভগবানের নিরাকারত্বে? ভগবানের অদ্বৈতত্বে? ভগবানের করুণায়?

তবে কোন্ সমাজ ভাঙল না ভাঙল, কি যায় আসে? ত্যাখো না গোস্বামীজীকে। যা ঘটুক, তুমিও ব্রাহ্ম থাকবে—আর যেমন পার লিখবে, পড়বে, সাধন করবে।

চিন্তাহরণ উত্তর দিল না। বিজয়কৃষ্ণ প্রচার ছাড়িয়া সাধনার মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছেন। চিন্তাহরণও চিন্তায় নিমজ্জিত হইয়া যায়। কি করিবে সে? তেনাহং কিং কুর্যাম...শেষে বলিল, তাই বা কি করে হবে?

কেন? কি বলছ বলো?

চিন্তাহরণ শান্তভাবে বলিতে চেষ্টা করিল, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারই

আমাদের জীবনের ব্রত হবে, এই আমরা স্থির করেছিলাম। অথচ প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করতে আমরা পারি নি।

কেন পারবে না? বাধা কি?

চিন্তাহরণ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বলিল, বাধা—সত্যই, বাধাই বা কি?—তারপর আপনা আপনিই যেন বলিল, অভাব-অনটন? সে ত আছেই,—তুমি যখন আছ তা জানতেও আমি পাব না—

মনোরমা গোপন অভিমান বশেই সগর্বে বলিল, জানতে তুমিও পাববে। কিন্তু সেজন্য আমি অন্তত মাথা হেঁট করব না।

প্রচারকের জীবন যে ত্যাগের জীবন—চিন্তাহরণ কৃতজ্ঞ চোখে তাকাইয়াছিল। আবার নিজেই বলিল, অভাব কখনো গোপন থাকে না।

মনোরমা বলিল, আর অভাবেই মানুষ ছোট হয়, ত্যাগে মানুষ ছোট হয় না,—তোমরাই এ কথা বলো।

চিন্তাহরণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মনোরমার হাতটি নিজের হাতে লইয়া বলিল, আমি জানি, তুমি আমাকে ছোট হতে দেবে না। অভাবের কাছে যেন মাথা হেঁট না করি। ধর্মপথে তুমি আমাকে রক্ষা করো।

হঠাৎ ছেলের ক্রন্দনে চকিত হইয়া মনোরমা দ্রুতপদে গৃহান্তরে গেল। দুই বৎসরের অমু বড়ই অস্থির। দুয়ারে হাতখানেক উঁচু বাঁশের 'হাঁটুয়া' বেড়া দিয়া তাহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। না হইলে রন্ধন, গৃহকর্ম, কিছুই করিবার উপায় নাই। একা-একা তক্তপোষের নিচে অমু আপন খেলার স্থান রচনা করিয়াছে। সেইখানেই তক্তপোষে মাথা ঠুকিয়া এইবার তারস্বরে চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে—'মা! মা!' মনোরমা ছুটিয়া যাইতেই ক্রন্দনের স্বরটা চড়িয়া গেল। কিন্তু মনোরমার ধমকে তাহা স্থায়ী হইতে পারিল না।

চিন্তাহরণ পিছনে পিছনে আসিয়া বলিল, আহা, ওকে ধম্‌কিয়ে কি হবে ?—চিন্তাহরণ অমুকে কোলে তুলিয়া লইল।

না হলে কান্না থামত না।—অমুর ক্রন্দন কিন্তু থামিয়াছে।

চিন্তাহরণ হাসিয়া বলিল, একা-একা ছিল, ব্যথা পেয়েছে, কাঁদবে না ?

না। কাঁদলে চলবে কেন ?—আমার রান্নাবান্না রয়েছে, তা ফেলে ওকে কখন দেখি ? কখন কোলে নিই ? ওকেও তা বুঝে উঠতে হবে। —মনোরমার মুখে কিন্তু হাসি নাই, এই ত অভাবের স্বরূপ।

চিন্তাহরণ তখনো সহাস্য মুখে বলিল: বুঝে ও নিজে থেকেই উঠবে—তার আগে কেন ব্যস্ত হচ্ছ ?

অমু এইবার মায়ের কোলে যাইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল। মনোরমার আর দৃঢ়তা রহিল না।—দ্যাখো না, তোমার আদর পেতেই কেমন আব্দার বেড়ে গেল—এখন আমার কোলে উঠবেন।

উঠবে বৈকি—এই ত ওর সিংহাসন।

মনোরমাও আর পারিল না। ছেলেকে কোলে লইতে গেল, আসুন রাজপুত্তর!

অমু কেমন খেলা পাইল। মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, না।

'না!'—দুইজনে স্নেহ উৎফুল্ল কৌতুকে হাসিয়া উঠিল। মনোরমা চিন্তাহরণকে বলিল, না, তুমি দেখছি যাদু জান।

চিন্তাহরণ বলিল, কাকে যাদু করেছি ? তোমাকে ?

তা আর জানো না ?—সলজ্জ পুলকে মনোরমা বলিয়াই চোখ নত করিল। তারপর ছেলেকে বলিল: তবে থাক ওঁর কোলে।

অমনি অমু মুখ ফিরাইয়া আবার হাত বাড়াইয়া দিল—মা—!

মনোরমা বলিল, না, আমি নোব না।

চিন্তাহরণও সকৌতুকে বলিল: আমিও দোব না।—বলিয়া চলিয়া যাইবার ছলে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

অমু আদরের কান্না জুড়িয়া দিল, মা, মা!

মনোরমা হাসিয়া বলিল, মা কেন?

চিন্তাহরণ ফিরিয়া হাসিয়া বলিল, দেখলে?

মনোরমার কোলে শিশু এবার ঝাঁপাইয়া পড়িল।

চিন্তাহরণ সানন্দে বলিল, কে যাদু জানে দেখলে? এখন বলো—হুকুম।

মনোরমা আপন শিশুকে বুকের কাছে চাপিয়া বারেবারে অনুভব করিতে চাহিল—ইহাই তাহার অমৃত, ইহাকে পাইয়াই সে অমৃত হইয়াছে।

১২

দশ টাকা জলপানির জোরে বিভূতি কলিকাতায় পড়িতে আসিল। তাহার মুরুব্বি কেহই নাই; অন্যদিকে তাহারই মুখ চাহিয়া আছেন তাহায় বিধবা মাতা ও কনিষ্ঠ সহোদর জ্ঞান, এবং রাজীবের সাহায্যাভাবে হৃতশ্রী, দুর্দশাগ্রস্ত চিত্রিসারের চৌধুরীদের ভদ্রাসন। রাঘব শ্বশুরগৃহে আশ্রয় লইয়াছে, অনন্ত স্ত্রীপুত্রকে পাঠাইয়া দিয়াছে শ্যালকালয়ে, ঘরদুয়ার ভাঙিয়া পড়িতেছে, দোল-দুর্গোৎসব বন্ধ হইয়া গিয়াছে, পঞ্চবটীতলা প্রায় পরিত্যক্ত, নীল-মাধবের সামান্য ভোগ কোনোরূপে নিবেদন করেন মাত্র মহেশ্বরী। বিভূতি এইবার বিষয়কর্ম করুক, ইহাই তাহাদের দাবী ছিল। কিন্তু বিভূতি শুনিবে না। সে স্থির করিল দশ টাকা জলপানির পাঁচটাকা নিয়মিত বাড়িতে পাঠাইবে, বাকী পাঁচ টাকাতে নিজের চেষ্টায় সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িবে। বন্ধু যাদবও উৎসাহ কম দেয় নাই,—সে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িয়া ভবিষ্যতে উকিল হইবে। অবশ্য তাহার প্রধান আশা সে বিভূতিকে বলে নাই—কলিকাতায় এখন রাজীব চৌধুরী আছে, বিভূতির শৈল দিদি ও গিরীশ গাঙুলী আছে,—তাহারা বিভূতিকে নিশ্চয়ই সর্বান্তঃকরণে সহায়ত করিবে।

কিন্তু বিভূতি গিরীশ-রাজীবের সঙ্গে কলিকাতায় দেখাও করিতে গেল না। কি প্রয়োজন? অবশ্য শৈলর পলায়নের পরে তাহার মনে রাজীবের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ পূর্বে জন্মিয়াছিল তাহা আর বিশেষ নাই। রাঘব রাজীবের প্রাণনাশের চেষ্টা করায় রাজীবের প্রতি সেও মহেশ্বরীর মত একটা সমবেদনা বোধ করিয়াছে। শৈলকে উদ্ধার করিবার পক্ষে সত্যই যে অন্য পথও রাজীবের ছিল না, এখন তাহাও সে

বুঝে। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ বা ব্রাহ্মদের প্রতি সে আর আকর্ষণ বোধ করিল না। যাদবের সাধ্য হয় নাই আর তাহাকে ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় লইয়া যায়—পূর্ব সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করে। গিরীশ গাঙুলী ও শৈলর পরিণয়েও বিভূতি তাই অবজ্ঞাই অনুভব করিয়াছে—এইজন্ম গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন শৈলীদিদি?—পীতাম্বর গাঙুলীর পরিবর্তে তাহার পুত্রকে বিবাহ করিবার জন্ম? কি কারণে সে দেখা করিতে যাইবে—রাজীবের সঙ্গে, গিরীশের সঙ্গে? দুই একমাসের মধ্যেই বিভূতি নিজের ব্যবস্থাও করিল। কলেজের অধ্যক্ষের সুপারিশে খিদিরপুরের ঠিকাদার ইন্দ্রনাথ ঘোষাল তাহাকে আশ্রয় দিল। সেদিনের রাতুল মুৎসুদ্দির সে দৌহিত্র। প্রকাণ্ড বাড়িতে, গাড়ীতে, জুড়ীতে, কোম্পানির কাগজ ও বাড়ি ভাড়ায় তাহাদের ঐশ্বর্য্য কোনকালে ফুরাইবে মনে হয় না। ইন্দ্র ঘোষাল অবশ্য সেই নাম লইয়া বসিয়া নাই; সে দৌহিত্র। সে পরান্নজীবী থাকিতে চাহে নাই; একালে ডকের ঠিকাদারীও সে করিতেছে। সেই সূত্রে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সাহেব সুবারও সে পরিচিত। তাহাদেরই কথায় রাজীব চৌধুরীকে সে নিজের গৃহে স্থান দিয়াছে,—দরকারমত তাহার ব্যবসায়ের এষ্টিমেটও করিয়া দিবে এই বাঙাল ছাত্রটি, এদিকে পড়াশুনা করুক, মানুষ হউক! ওদিকে কথা রাখায় সাহেবরাও ঘোষালের ব্যবসায়ে সাহায্য করিবেন।

বিভূতি সম্পূর্ণ নূতন জীবন আরম্ভ করিল।

কলেজে বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ লইতে লইতে বিভূতি শুনিল ডারুইনের আবিষ্কারের কথা। তাহারা ছাত্ররা অধ্যাপকদের গৃহে যায়, সেখানে যাহাদের মাঝে মাঝে বৈঠক বসে, তাহাদের মুখে শুনিল মিল বেন্থাম হর্বর্ট স্পেন্সর কোঁৎ এর নাম। জ্ঞানে, গুণে, মানে-সম্মানে ইহারা অনেকেই অগ্রগণ্য। সে বুঝিল ব্রাহ্মরা নিজেদের যতই 'আলোকপ্রাপ্ত' মনে করুক, নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, মানব সমাজের

প্রকৃত উন্নয়ন পদ্ধতি সম্বন্ধে তাহাদের কিছু জ্ঞান নাই। শুধু কতকগুলী, দেশী আর বিলাতী কুসংস্কার লইয়াই উহারা আছে। অতএব সে 'পজিটিবিষ্ট' হইতে চাহিল। বিশেষ কিছু যে হইল তাহা নয়, কিন্তু নিজের পরিচয়টা স্থির করিল—'পজিটিবিস্ট'। কতকষ্টা যাদবের মত বন্ধুর ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি আকর্ষণ দেখিয়াই সে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে ধর্ম জিনিসটাই কুসংস্কার। 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্' বলিয়া ব্রাহ্মগুলি দাড়ি নাড়ে, আর 'ওঁ বিষ্ণু' বলিয়া পুরোহিতেরা টিকি নাড়ে—ও একই কথা। যাদবকে লইয়া তাই তামাসা করিতেও সে ছাড়ে না।

যাদব রাগ করে। সে বুঝিতে পারে—খিদিরপুরের সেই মুৎসুদ্দিদের বাড়ি না ছাড়িলে বিভূতির মঙ্গল নাই। বাবুদের ভাগিনেয় ওই ঘোষাল হাল আমলে ব্যবসায়ী, নানা ধরণের অশিক্ষিত লোক লইয়া ঠিকাদারী করে। তাহার বসিবার ঘরে গল্পে তর্কে লোক জুটে, আসর জমে—এবং গান-বাজনা সুরাপানও হয়। কোনো জিনিসেই তাহাদের কুসংস্কার নাই—বিভূতিও গর্ব করিয়া বলে। আবার বিভূতির গানের গলা থাকায় বাড়িটার বাবুদের মহলেও তাহার খাতির। সেখানে বহুদিনের রেওয়াজ মত সন্ধ্যা হইতেই বাবুরা জুড়িতে বাহির হ'ন, রক্ষিতাদের বাড়ি হইতে নিশীথ রাত্রে ফিরেন; খানসামারা অন্দরের দুয়ারে মদে চুর বাবুদের পৌঁছাইয়া দেয়, খাস খানসামা তখন আগাইয়া আসে, শয়নগৃহের দুয়ারে সে নিজ বাবুকে পৌঁছাইয়া দেয়, পান-দোক্তা রঞ্জিত অধর, বিলাস-আলস্যে ক্লান্ত অর্ধাঙ্গিনীরা ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া আসিয়া দাঁড়ান—বিছানায় বাবুদের শোয়াইয়া দেন। মাঝে মাঝে বাবুরা গানের আসর বাড়িতেও বসান, সবই ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু বাসভবনে বেতমিজ্ বা বেসামাল হইবার উপায় নাই। বিভূতির ত তাহা সম্ভবই নয়, হাজার হউক সে বয়ঃকনিষ্ঠ এবং অনুগৃহীত পরিজন মাত্র। তবে সে কলেজের ছাত্র, আবার গান বাজনাও বোঝে, বাবুরা তাহাকে তাই

আদর ও স্নেহ করেন, গান বাজনার আসরেও ডাকিয়া পাঠান। কলেজের ছাত্রকে দুই একপাত্র ব্র্যাণ্ডি দিয়া আপ্যায়ন করিতেও ভোলেন না। যাদব ভাবিত বিভূতি এই সবে মজিয়া যাইতেছে।

আসলে কিন্তু ইন্দ্র ঘোষাল মামাদের বা মামাত ভাইদের আসরে বড় যান না। সময় পান না। তবে তাঁহার নিজের বৈঠকখানা কৌচে কেদারায় সাজানো, সেখানে চালটা সাহেবি ব্যবসায়ীদের ধরণের, ভদ্রলোকরাও আসেন, ব্যবসা সম্পর্কে সাহেবরা আসে, তাহাদের জন্য খানা মাইফেলের বন্দোবস্তও মাঝে মাঝে থাকে,—বিভূতিকেও উহাতে সাহায্য করিতে হয়,—কিন্তু সেখানে তাই বলিয়া ইন্দ্র ঘোষাল হাল ছাড়িয়া দেন না। বিভূতিকেও বলেন, বাঙাল মাথা ঠাণ্ডা রেখো।

মাথা ঠাণ্ডা রাখা অবশ্য সহজ নয়। মেজবাবুর ছেলে কানাই বাড়ির 'নতুন বাবু'। বয়সটা রাজীবের কাছাকাছি। অর্থাৎ বৎসর খানেক হইল যথানিয়মে তাহার স্বতন্ত্র খানসামা বরাদ্দ হইয়াছে। 'ছোট বৈঠকখানায়' তিনি এখন বসেন—কৌচ, কেদারা আছে, পার্শ্বেই অন্যান্য ব্যবস্থা—ন্যায় রাত্রি যাপনেরও। বাড়ির দাসী বাঁদীদের পরিবর্তে এখন নিয়মিতভাবে তিনি বাহিরে বেশ্যা বাছাই করিয়া বেড়ান। তাঁহার বিবাহের বয়স হইতেছে, এবং 'বাগান' করিয়া বিশেষ কাহাকেও রাখিবার মত সময়ও হয় নাই,—এই অবস্থা। কিন্তু কানাইবাবু ইংরেজি পড়িয়াছেন, তাই দেশীর সহিত বিলিতীরও তিনি যাচাই-বাছাই করিতে উৎসাহী। আর ফিরিঙ্গী মেয়ে মানুষের সঙ্গে বিভূতির মত ইংরেজি জানা এক আধজন ফ্রেণ্ড না লইয়া গেলেও বাবুর মর্যাদা থাকে না।

ইন্দ্র ঘোষাল সকালে উঠিয়া বিভূতিকে ডাকাইয়া পাঠান,—কাল সন্ধ্যায় গিয়েছিলে কোথায়?

বিভূতি মুখ নত করিল।

'নতুন বাবুর' সঙ্গে বেরিয়েছিলে। তা বেরোও। শহরে এসেছ,

চালাক হও। কিন্তু ওরা শুধু জানে উড়তে—আর ওড়াতে—রাতুল মুৎসুদ্দির টাকা। কিন্তু তুমি ত বাঙাল দেশের মানুষ, কোনো পুরুষ মুৎসুদ্দিগিরি করেছে কেউ?

বিভূতি বুঝিল ভৎর্সনা যথার্থ। ইন্দ্র ঘোষাল আবার বলিলেন, নতুন বাবুর ইয়ার হতে চাও, হও,—ওর পর্য্যন্তও চলবে, কোম্পানির কাগজ গিয়েছে, বাড়িগুলো আছে। কিন্তু আমার সাকরেদ যদি হতে চাও—তা হলে জেনো উপায় করতে হবে;—খাটবে, রোজগার করবে, মানুষ হবে—রাখবে নিজের মেয়ে মানুষ। আর তা নয় যদি বাবুর ইয়ার-বক্সি হতে চাও, বাবুদের দাসী বাঁদী যা প্রসাদ পাও তাই সই—তবে গুড্ বাই—ও মহলে উঠে যাও—আমিই বলব'খন মেজবাবুকে কানাই তোমাকে ফ্রেণ্ড করতে চায়।

বিভূতির মাথা তাই আসলে ঠাণ্ডা রহিল। কারণ, দাসী চাকর খানসামা খাতাঞ্চি সরকার ইয়ারের হাতের পুতুল এই মূর্খ 'বাবুদের' ও 'পটের বিবিদের' ইন্দ্র ঘোষাল দেখিতে পারেন না। না হইলে স্ত্রী, মদ্য-মাংসে তাহারও অরুচি নাই, অন্যদেরও তিনি বারণ করেন না। 'নিজের পয়সায় মেয়ে মানুষ রাখো—স্ত্রীও বল্‌বে 'হাঁ পুরুষ বটে।' আর পরের পয়সায় ফুর্তি করো—মেয়ে মানুষও তোমায় বল্‌বে—বাঁদর!'

যাদবের সঙ্গে বিভূতির দূরত্ব বাড়িয়া গেল। অথচ বিভূতির 'নতুন বাবুর' ইয়ারের পদও গ্রহণ করা হইল না, 'বড়বাবু মেজবাবুদের' আসরেও মোসাহেবি করা সম্ভব হইল না। ইন্দ্র ঘোষাল তাহাকে লইয়া বসেন,

—ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছ, একটা কিছু তৈরী করতে পার? নবগোপাল মিত্র দু'বেলা বলেন—'কিছু একটা বানাও, কলের তাঁত, দিশলাইএর কল,—হিন্দু মেলায় দেখাতে হবে। সীতানাথ ঘোষের এয়ার পাম্প, এয়ার ইঞ্জিন বেরিয়েছিল; তুমিও কিছু করো।

বিভূতি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র; কল বানাইবে কি? কিন্তু ইন্দ্র

ঘোষালের তাড়ায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হয়। সুতাকল, চটকলের তাঁত তৈয়ারী কি সহজ কথা? শেষ পর্য্যন্ত শনের দড়ী সহজে পাকাইবার জন্য একটা যন্ত্র বিভূতি প্রায় তৈরী করিয়া ফেলিল। কলেজের দেশীয় মিস্ত্রীরাই তাহাকে সাহায্য করে।

ফিরিঙ্গি ফোরমান্ সেই দেশী মিস্ত্রীদের কাজ করিতে দেখিয়া বলিল,—ওটা কি হচ্ছে?

মিস্ত্রীরা জানাইল—একটা দিশী কল। বিভূতি চৌধুরী দেখাইবে হিন্দু মেলায়।

ফোরমান্ উপহাস করিল, ফু:।

বিভূতি বলিল, 'ফু:' কি?

সাহেব ইংরেজিতে বলিল, একেবারে গাছ না উঠ্‌তেই এক কাঁদি! নেটিব ব্রেন্‌কে একটু পাকতে দাও—

'নেটিব'-এর মাথা ফিরিঙ্গির মাথার থেকে কম কিসে?

বিভূতি ঝগড়া করিল। সাহেব রিপোর্ট করিল—বিভূতি কারখানার জিনিসপত্র চুরি করিতেছে। অন্য সাহেবরাও ছাত্রটির 'ইনডিসিপ্লিনে' রুষ্ট হইল। বিভূতির নাম ও জলপানি তাই কাটা গেল।

যাদব বলিল, খুব ত ইঞ্জিনীয়ারিং পড়লে! এখন করবে কি?

বিভূতি বলিল, ব্যবসা করব।

ব্যবসা!—যাদবের বিস্ময়ের অবধি থাকে না।—কিসের ব্যবসা!

ঠিকাদারী।

যাদব নাক সিঁটকায়। তারপর বলে, ও:, সেই খিদিরপুরের রাতুল মুৎসুদ্দির বাড়ি এখনো ছাড়বে না বুঝি?

কোথায় যাব?

রাজীবদা'র কাছে চল। গিরীশদা নেই—এক বাড়ি, অনায়াসে তুমি

থাকৃতে পারবে—কলেজে পড়বে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান কলেজ,—সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুজ্যে সেখানে পড়ান—শুন্‌বে ইংরেজি।

আমি আর পড়ব না, উপায় করতে হবে।

কলটাও বিভূতি তৈয়ারী করিতে পারিল না। অর্ধসমাপ্ত কলটা তথাপি ইন্দ্র ঘোষাল মেলায় লইয়া গিয়া তুলিলেন। স্বদেশী যন্ত্র তৈয়ারী আরম্ভ হইতেছে, ইহাতে শনের দড়ী পাকানো চলিত।

সেই হিন্দু মেলার যন্ত্রটার কাছে বিভূতি দাঁড়াইয়া থাকে সর্ব সময়ে। নানা লোকে দেখে, প্রশ্ন করে, কখনো সে উত্তর দেয়, কখনো তাহাদের মন্তব্য শোনে। ভাবে—হাব্‌গিব্‌স্‌, আর্করাইট্‌, কার্টরাইট, ওয়াট, ষ্টিভেনসন—ইহারা কয়জন ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলে পড়িয়াছে? অথচ আপন আপন কর্ম-সূত্রেই তাহারা যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। এক একটি সামান্য চেষ্টা হইতে আরম্ভ হয় এই বৃহৎ আবিষ্কার। উদ্যোগ চাই, সাহস চাই।

'সাহস, উদ্যোগ'—ইন্দ্র ঘোষাল বারেবারে বলে, 'ইহাই চাই।'

সামনে আসিয়া দাঁড়াইল দুইজন যুবক। দাড়ি ছাঁটা, গোঁফ আছে, কুর্তা ও কোট পরিধানে।

একজন বলিলেন, এইটেই বুঝি সেই ইন্দ্র ঘোষালের দড়ী বুনবার কল?

'ইন্দ্র ঘোষালের?'—বিভূতির কানে লাগিল। কিন্তু পূর্বেও সে এরূপ উক্তি শুনিয়াছে, তাই শুধু জানাইল—তিনিই উহা তৈয়ারী করাইয়াছেন।

কিন্তু চলে না শুনেছি?

বিভূতি অধোবদন হইল—'না'। শেষ করবার আগেই কলেজের ফিরিঙ্গি ফোরমান্‌ উদ্ভাবক ছাত্রটির সঙ্গে গোলমাল করলে।

যুবকটি কহিল, চলে না যখন তখন প্রদর্শনীতে দেওয়া ঠিক হয়নি।

বিভূতি আহত হইল। চুপ করিয়া রহিল। অন্য যুবক বলিল, না, রাজীব, এইরূপ সৎ-প্রচেষ্টায় উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।

চিন্তাদা', এ দেখে লোকে বরং হতাশ হবে।

দুইজনে আলোচনা করিতে করিতে চলিল। বিভূতি তাকাইয়া রহিল—এই ত রাজীব চৌধুরী!—হাঁ—সেই শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ পুরুষ। এবং —এই কি চিন্তাহরণ গাঙ্গুলী? সৌম্য মূর্তি, শশ্রু বিমণ্ডিত শান্ত চক্ষু। বিভূতিকে কেমন আকর্ষণ করিল তাহারা। এই রাজীব, এই চিন্তাহরণ। বিভূতি তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সে বিভূতি চৌধুরী—দেবপ্রসাদ চৌধুরীর পুত্র, সে এই যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিল,—সেই সূত্রে সে তাহার উদ্দিষ্ট পথ হইতেও আজ বিতাড়িত হইয়াছে,—রাজীব চৌধুরী কি জানে তাহা? রাজীব চৌধুরী ভাবে—কলটা বাজে, এই চেষ্টার মূল্য নাই। ক্ষোভ ও অপমান বোধ করে গিরীশ। ইহারাই 'উন্নতি' চায়।

এক খানে একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া একদল কবিতা পাঠ শুনিতেছিল, পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহারা মান্যগণ্য লোকই হইবেন মনে হয়। রাজীব ও চিন্তাহরণের পশ্চাতে বিভূতিও সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। স্বদেশ প্রেমের কবিতা পড়া হইতেছে—দিল্লীর দরবারের বিরুদ্ধে তিরস্কার সূচক। নাটক, বক্তৃতা, জাতীয় মেলায় নিয়মিত হয়; ওস্তাদেরা আসে, এবারেও আসিয়াছে, তাহা ছাড়া সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের গান, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের জাতীয় সঙ্গীতও এখানে গীত হইয়াছে। এখন কবিতা পড়িতেছিল এক সুকণ্ঠ কিশোর, ইজের চাপকান তাজ পরা। কিন্তু বিভূতির তাহাতে বিশেষ মন গেল না। শ্রোতাদের ছোট দলটির একজনকে দেখাইয়া বিভূতির পার্শ্বেই কে নিম্ন কণ্ঠে বলিল, 'হাঁ, আমি জানি ইনিই কবি নবীন চন্দ্র সেন।' বিভূতি উৎসুক দৃষ্টিতে লক্ষিত শ্রোতাকে দেখিল—বৎসর ত্রিশ-বত্রিশের সুপুরুষ, বুদ্ধিমান্, গর্বিত পুরুষ, চাপকান পরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, ইনিই তাহার আবাল্য শ্রুত 'পলাশীর যুদ্ধের' নবীনচন্দ্র সেন। কবিতা পাঠের শেষে বিভূতি তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল, রাজীবের কথা বিস্মৃত হইয়া গেল।

ইন্দ্র ঘোষাল বিভূতিকে ঠিকাদারী কাজে নিজের কর্মচারী হিসাবে গ্রহণ করিল - নাই বা সে পাশ করিল, কাজেকর্মে ওভারসিভার হইয়া উঠিতে তাহার বাধা কি?—ঠিকাদারীর সঙ্গে সেও বসাইবে ছোট কারখানা।

বিভূতিও বুঝিল—অন্তত বাড়ির অভাব সে পূর্ণ করিতে পারিবে। তারপর সেও দেখিবে—কি তাহার সাধ্য!

ইন্দ্র ঘোষালের সঙ্গে রেলের ঠিকাদারীর কাজে বিভূতি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া প্রথম গেল মোগলসরাই, তারপর বৎসরের পর বৎসর ক্রমে লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর করিতে লাগিল। কখনো সে নিজেও করে ঠিকাদারী. মালপত্রের ছোট মিস্ত্রীখানা দেয় ভাগ্য প্রসন্ন হয়, আবার অপ্রসন্ন হয়—গোলমাল বাধিয়া যায় কোন ইংরেজ বড় ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে—তাহার ইঁট কিসে নিকৃষ্ট বিলাতী কোম্পানীর ইঁট হইতে? তাহার মিস্ত্রীখানার কাঠ কিসে তুচ্ছ কোনো ফিরিঙ্গি কন্‌ট্রাক্‌টরের কাঠ হইতে? কলহ বাধে, বিভূতি সরকারী ঠিকাদারী হারায়, ইন্দ্র ঘোষালের নিকট আবার ফিরিয়া আসে। কমিসেরিয়েটের ঠিকাদারীতে ইন্দ্র ঘোষাল তখন পশ্চিমে প্রচুর উপায় করিয়া বসিয়াছিল। বিভূতিকে বলেন, 'এসো। কিন্তু সাহেবরা থাকতে তোমার আমার ইঁট ফার্স্ট ক্লাস হবে না। আমাদের কারখানায় বল্টু, ইস্‌ক্রুপও বানানো চল্‌বে না। সে পথ ছাড়ো।' ইন্দ্র ঘোষাল আরও ভাবিতেছিলেন, তাহার নিজের ছেলেরা মানুষ হয় নাই; এই বাঙাল ছেলেটার নিকট তাঁহার 'পালিতা কন্যাটি' বিবাহ দিয়া ইহাকে ব্যবসায়ের ভার অর্পণ করিলেন। বিভূতিও তাহা বুঝিতে পারিতেছিল; কিন্তু হঠাৎ ইন্দ্র ঘোষাল মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা ওলট-পালট হইল,—মেয়েটি ও বিভূতিকে লইয়া একটা

গোল বাধিল। বাধ্য হইয়া কাজ ছাড়িয়া বিভূতি আবার ব্যবসায়ে লাগে। কিন্তু আবার ঝগড়া বাধিয়া যায় রেলওয়ের কোন্ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে, ব্যবসা প্রায় ফেল হইতে চলে—মেয়েটিকেও ততক্ষণে ঘোষালের ছেলেরা কলিকাতায় পার করিয়া বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। বিভূতি বেনারসে আসিয়া সাধারণ ঠিকাদারী আরম্ভ করে। স্বপ্ন দেখিয়া সত্যই লাভ নাই, ঠিকাদারী করাই শ্রেয়ঃ।

১৩

হাওড়া স্টেশনে শৈল ও গিরীশকে বিদায় দিয়া রাজীব চৌধুরীর মনে হইল—সে মুক্ত। এইবার আপন আদর্শকে জীবনে রূপ দান করিবার মত তাহার সুযোগ আসিল। একটা ইস্কুলে সে পঁচিশ টাকা বেতনে শিক্ষক, তাহাই যথেষ্ট; তাহা ছাড়া সে মহেন্দ্রলাল সরকারের উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া লোকসেবার উদ্দেশ্যে হোমিওপ্যাথিক পড়িতেছে। সে স্বাধীন। আর চিত্রিসার নাই, আর শৈল নাই, নিজেরও ভাবনা নাই; আছে শুধু ব্রাহ্মধর্ম, আছে ব্রাহ্মসমাজ, আর স্বদেশ,—সেই এক ঈশ্বর, এক জাতি, এক রাষ্ট্রের সাধনা।

রাজীব চিন্তায় মগ্ন, গৃহের কড়া নাড়িতে না নাড়িতেই গৃহদ্বার খুলিয়া তাহার সম্মুখে প্রদীপ হস্তে দাঁড়াইলেন কুমুদিনীর মাতা! রাজীব চমকিত হইল—তাইত, ইহারাও ত তাহার মুখাপেক্ষিণী। রাজীবের মনে পড়িল—ইহাদের ব্যবস্থা এখনো তাহারা করিয়া উঠিতে পারে নাই; তাহারই উহা ব্যক্তিগত দায়িত্ব। কুমুদিনী পড়িতেছে, তাহার মাও আছেন। রাজীবের মনে হইল—এই ত কর্মের আহ্বান, আদর্শের পরীক্ষা। ভাবিয়া রাজীব উদ্বুদ্ধ বোধ করিল—সমাজের সেবায় সে-ও কাহারও অপেক্ষা কম নয়। সে ধনী নয়, ধনার্জনের আকাঙ্খাও তাহার তীব্র নয়, তথাপি সে আপনার অর্জিত ধন আপনিই আত্মসাৎ করে না। সে বিদ্বান নয়, কিন্তু যতটুকু বিদ্যা আছে তাহারও সে সদ্ব্যবহার করিবে শিক্ষায়, চিকিৎসায়। সে কর্মী, আপনার সমস্ত শ্রমশক্তি সে সমাজের নেতাদের হাতে তুলিয়া দিতেছে—সমাজ সংস্কার-আন্দোলনের প্রধানদের নিকট সে বয়ঃকনিষ্ঠ সহকারী। —কুমুদিনীর পড়া, রোগীর সেবা, ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি, সভা করা, পত্র-পত্রিকাদি মুদ্রণের খোঁজ খবর করা—কোন কিছুতে তাহার অবকাশ রহিল না।

সমাজেরও আজ আত্ম-সংস্কারের সময়—কোনো একনায়কের হাতের পুত্তলি তাহারা নয়; স্বাধীনতার সাধনায় ঐরূপ কোন 'প্রেরিত পুরুষের' স্থান নাই। সেইজন্যই চিন্তাহরণও শীঘ্রই কলিকাতায় আহূত হইল। আপাতত দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে একটি স্কুলের কাজ সমাজকর্তারা তাঁহার হাতে ন্যস্ত করিতেছেন। তদবসরে তিনি যথাবিহিত অধ্যয়ন শেষ করিয়া প্রচারক পদের জন্য প্রস্তুত হইবেন। সপরিবারে চিন্তাহরণও আসিয়া পৌঁছিতে রাজীবের গৃহ ও কর্মোৎসাহ জমিয়া উঠে। দুজনাই অবশ্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে—সমাজের আসন্ন সংকটে উদাসীন থাকিতে পারে কে? গিরীশ শৈল পর্যন্ত দূর হইতে অবস্থা জানিতে উৎসুক।

ইহারই মধ্যে রাজীব চিন্তাহরণকে লইয়া 'জাতীয় মেলার' উৎসবেও গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চিন্তাহরণের এই মেলার আদর্শের সঙ্গে সহানুভূতি অকুণ্ঠিত। গিরীশের মত সে উহাকে 'হিন্দু' ব্যাপার মনে করে না। "দেশের বিদ্বান ও বিজ্ঞ লোকেরা মেলাস্থলে বসিয়া দেশের মঙ্গলচিন্তা করিতেছে"—ইহা কি এই অধঃপতিত দেশের পক্ষে একটা নূতন জিনিস নয়? আর শুধু ত চিন্তা নয়, প্রস্তাব পাশ করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হয় না। ব্যবসা বাণিজ্য, দৈহিক, মানসিক সকল উদ্যোগে জাতির সর্বব্যাপী আত্মোপলব্ধির আয়োজনও এই মেলায় চিন্তাহরণ লক্ষ্য করিতে পারে। এমন আর এদেশে কবে কখন হইয়াছে? গ্রীকজাতির ওলিম্পিক উৎসবের মতই ইহা বুঝি নূতন ভারতবর্ষের মহামিলনের ক্ষেত্র। এখানে ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির কথা আলোচিত হয়—সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তুমুল উৎসাহে রাজনারায়ণ বসুর মত জ্ঞানিপুরুষেরা বক্তৃতা করেন। সাহিত্য রচনা এখন প্রায় পরিত্যাগ করিলেও চিন্তাহরণ তাই উৎফুল্ল হইয়া উঠে। ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় নানা দেশের পালোয়ানরা আসে;—এইবার তাহাদেরই ঢাকার ছাত্ররা প্রথম হইয়াছে—'মাষ্টার মশায়'ও রাজীবকে

এইখানে পাইয়া তাহারাও উৎফুল্ল। কৃষি ও শিল্পজাতের প্রদর্শনী বসিয়াছে, মালী ও শিল্পীরা পারিতোষিক লাভ করে। আবার মনোমোহন বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাতীয়তামূলক নাটক অভিনীত হয়; সঙ্গীতের আসর বসে,—এইবার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ মৌলাবক্স নাই; কিন্তু অন্য ওস্তাদেরা পশ্চিম হইতে আসিয়াছেন। নূতন সঙ্গীতও রচিত ও গীত হয়। রাজীব সঙ্গীত পারদর্শী নয়, তথাপি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত গানটি শুনিয়া সে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে—

"মিলে সব ভারত সন্তান একতান একপ্রাণ
গাও ভারতের যশো গান।"

'একতান এক প্রাণ'—এক ধর্ম ঈশ্বর, এক জাতি, এক দেশ,—এই ত সেই আহ্বান। আর এই ত পাঞ্জাবী, নেপালী, হিন্দুস্থানী মহারাষ্ট্রী ভারতের নানা জাতির মানুষ সকলে আজ একত্রিত হইয়া সাধারণের উন্নতির কথা আলোচনা করিতেছে। সকলই জানেন তাঁহারা এই ভারতবর্ষের সন্তান,—একদেশ, এক তান, এক প্রাণ। জাতীয় মেলার নানা প্রয়াসের মধ্য দিয়া উদ্যোক্তারা অন্তত আজ জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন,। শিক্ষা ও স্বাবলম্বনই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য,—তাঁহারা ইংরেজের মুখাপেক্ষী নয়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী। জাতীয় অনুশীলনের দ্বারা তাঁহারা জাতিকে আত্মবিশ্বাসী করিতে চান—ভিক্ষায়াং, নৈব নৈবচ।

ইহাকে জাতীয় জীবনের নবজাগরণের জোয়ার বলিবে না ত কি বলিবে রাজীব-চিন্তাহরণ?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজীবের মনে পড়ে—তাহাদের ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণেরা অনেকে মনে করেন ইংরেজের মুখাপেক্ষিতাই বিধাতার বিধান! ভাবিতেই রাজীব উত্তেজিত হয়, চিন্তাহরণও ব্যথিত হয়,। আত্মনির্ভরতা ছাড়া কোন জাতি বা সমাজ কি কখনো দাঁড়াইতে পারে?

বিশেষত এইবৎসর তাহারা কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছে। শীঘ্রই মহারাণী সাম্রাজ্ঞী পদে অভিষিক্ত হইতেছেন—দিল্লীতে দরবার হইবে। অথচ ইহা দুর্ভিক্ষের বৎসর। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের মধ্যে দরবারের অপচয় ও রাজা-রাজড়াদের উৎসাহ একটা উৎকট দাসত্ব-লোলুপতার মত দেশের সাধারণ মানুষের অন্তরকে পীড়িত করিতেছে। একজন নেতাও কেন স্পষ্ট করিয়া বলেন না—ইহা অশোভন, ইহা অন্যায়! তাঁহাদের একজনও কেন সেই মূর্খ ব্রাহ্মণ দেবানন্দ ওঝার মত ঘোষণা করিতে পারেন না 'ইহা বেইমনী—বেইমানী!' কেহ কি বলিতে পারে না—ইহা আমাদের উৎসব নয়। ইহা আমদের পরাধীনতারই বিজ্ঞাপন?

চিন্তাহরণকে ডাকিয়া লইয়া গেল কে—সমাজেরই কোনো ধনী সুহৃৎ—'কবিতা শুনবে এসো।' রাজীবকেও সঙ্গে যাইতে হয়। প্রকাণ্ড এক বৃক্ষতলে শাদা ঢোলা ইজার চাপকান পরিহিত সুন্দর এক নব যুবক। বয়স মনে হয় ষোল-সতেরো বৎসর। দিল্লীর দরবার সম্বন্ধে তিনি গান গাহিলেন; কবিতা পাঠ করিলেন:

সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায়, হরষে মাতিয়া উঠিছে সবে।

শুধাই তোমারে হিমালয় গিরি,—ভারতে আজি কি সুখের দিন?

কণ্ঠস্বর, আবৃত্তির মাধুর্য, বেদনা-আহত যুবক হৃদয়ের অভিমান, জাতীর প্রাণের সমস্ত অপমান-বোধ—বার বার ফুকারিয়া উঠিতেছে কথা কয়টিতে 'ভারতে আজি কি সুখের দিন?'

রাজীব ভুলিয়া গিয়াছে আপনাকে, ভুলিয়া গিয়াছিল পরিবেশ। তাহার অন্তরের মধ্য হইতে যেন দেশের আত্মা জাগিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'ভারতে আজি কি সুখের দিন?'

কে এই নব-যুবক? কাহার মুখের ভাষায় দেবনন্দন ওঝার সেই তিরস্কার এমন করিয়া জীইয়া উঠিল, কাহার কণ্ঠে আগামী

দিনের ভারতবর্ষের জিজ্ঞাসা আজ জাতীয় চেতনার দুয়ারে আসিয়া পৌঁছিল?—কে একজন বলিল—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজীবের উদ্দীপ্ত অস্বস্তি ক্রমে প্রকাশ পথ পাইল।

চিন্তাহরণের অগ্রজগণ নূতন জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিতেছে—'ভারতসভা'। আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যাহারা ম্যাৎসিনি ও স্বাধীনতা-মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ হইতেছিল, তাহারাই অগ্রবর্তী হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য। গিরীশ নাই, কিন্তু রাজীব ও চিন্তাহরণ আশ্বস্ত হইয়া উঠিল—তাহাদের ব্রাহ্মসমাজের যুবক-প্রাণ আপনার মুক্তিমন্ত্র বিস্মৃত হয় নাই। এইবার তাহারাও যোগ দিতে লাগিল এই জাতীয় প্রয়াসে। ইহা আর 'হিন্দুমেলা' নয়, 'ভারত সভা'। রাজীব বক্তা নয়, সে ভাবুক নয়, কর্মী পুরুষ। বক্তা বা ভাবুকের ত অভাব নাই, অভাব কর্মীরই। রাজীবকে তাই উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন হইল।

অন্যদিকে সমাজেও ধর্মে নূতন স্রোত আর কাটা-খালের মধ্যে সুস্থির শান্ত গতিতে বহিতে পারিল না।

কেশবচন্দ্রের সমস্ত ব্যক্তি-মহিমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ব্রাহ্ম যুবকেরা নূতন সমাজ গঠনে অগ্রসর হইলেন। —সত্যের মহিমা 'প্রত্যাদেশের' নামে খর্ব করা চলিবে না। ব্যক্তি প্রাধান্যের নিকটে সাধারণের মতামতকে বলি দিবার সাধ্য কাহার আছে?

রাজীব ও চিন্তাহরণ এই বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রয়াসে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সুদূর সিমলায় গিরীশ চঞ্চল হইয়া উঠে—'আমি আসিব কি?' একবার সে ভাবিল—সরকারী কর্ম ত্যাগ করিয়া সেও কি চিন্তাহরণ-রাজীবের

মত এই মহাব্রতেই আত্মনিয়োগ করিবে? এক সময়ে ইহা ত ছিল তাহারও আদর্শ। কিন্তু কলিকাতার বন্ধুরা তাহাকে জানাইল—উহার প্রয়োজন এখনো নাই, বরং সেইখানেই প্রস্তুত থাকিও। দেশব্যাপী প্রচারের আয়োজন করিতে হইবে। ভারতবর্ষের নবজাগরণের পুরোহিত আমরা—পূর্বে পশ্চিমে সমস্ত দিকে আমাদের ছুটিতে হইবে।

কি হইবে সমাজের নাম?

রাজীব ভাবিতেছিল নাম হউক 'স্বাধীন ব্রাহ্মসমাজ'। চিন্তাহরণ ভাবিতেছিল নাম হউক—'ব্রহ্ম-সাধন সমাজ।' গিরীশও নামের কথা ভাবিয়াছিল—'ব্রহ্ম বিজ্ঞান-সমাজ'। শেষ পর্যন্ত নাম হইল 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ।' 'সাধারণ'—সকলেই একমত ইহাই যথার্থ নাম। বিধাতার জাগ্রত সাক্ষী এই সাধারণ; তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠাতে বিধাতারই আত্মপ্রকাশ।

স্রোতোচ্ছ্বাসে রাজীব ও চিন্তাহরণ আপনাদের জীবন-তরীর হাল সেই বিধাতারই হাতে তুলিয়া দিল।

মনোরমা কলিকাতার গৃহে কুমুদিনী ও কুমুদিনীর মাকে ফিরিয়া পাইয়া খুশী হইয়াছে। কলিকাতার সমাজ তাহার পক্ষে নূতন। কিন্তু অনেকের নাম সে শুনিয়াছে—শরৎ গুপ্ত ও তাঁহার গৃহিণী ও গৃহের বহু ব্যবস্থাই তাহার জানা। গুপ্ত মহাশয়ের গৃহিণী সকলেরই আপনার হইয়া উঠিতে পারেন; মনোরমাকেও তিনি আপন 'বোন-ঝি' বলিয়া গ্রহণ করিলেন। সহজেই দুই জনার মনের মিলও হয়। কুমুদিনী মেয়েটির উপর শৈলর মনোভাব দেখিয়া মাসীমা দুঃখিত ছিলেন। তিনি জানান,—রাজীব গিরীশ পুরুষ মানুষ, কি খোঁজ রাখিত এই গৃহের?—মনোরমাও এখানে আসিতেই বুঝিয়াছে—শৈল তাহাদিকে অবাঞ্ছিত বোঝা বলিয়াই মনে

করিত, বিশেষ সদয় ব্যবহারও করে নাই। এখন শুনিল, রাজীব-গিরীশ না থাকিলে কুমুদিনীর শিক্ষাব্যবস্থাও হইত না। কারণ শৈলর মতে কুমুদিনীর 'মাথা নাই'।

মনোরমা চমকিয়া উঠে, 'মাথা নাই'।—শৈলর সেই পুরাতন অবজ্ঞা যে কোনো নারীর প্রতি।

মাসীমায়ের বুঝিতে দেরী লইল না যে, কুমুদিনী মনোরমাব স্নেহপাত্রী,—'বড কাজেব মেয়ে'। কিন্তু শৈল তাহার এই ছোট মনেও বেশ আঘাত দিয়া গিয়াছে। মনোরমাও গুপ্তমহাশয়ের গৃহিণীকে তাই বলিতে পারিল,—মাসীমা, শৈলীর গুণ অনেক, কিন্তু একটা দোষ—ও ভাবে, ওর মত মাথা কারও নেই।

মাসীমা বলেন, ওই ত বল্লাম, তাই কুমুদিনীয় হয়েছিল বিপদ। তোমার ওখান থেকে এল—কন্ভেণ্টে পডেছে,—অল্পই পডেছে, কিন্তু ইংরেজি উচ্চাবণ ছিল শৈলর থেকে ভালো।—তা শৈল রাগ করলে হবে কেন? আমার মেয়েদেরও তো দেখেছি—কন্ভেণ্টে মেমসাহেবরা শেখায় ভালো। দ্যাখো জামাই যদি তেমন পাওয়া যায়,—বলা ত যায় না, বিলাত ফেরৎই হবার কথা,—এখন মেয়ের অদৃষ্ট,—তাহলে জামাই ত চাইবেই স্ত্রী ওসব বিষয়ে শিক্ষিতা হোক। কিন্তু তা বলে সব মেয়ের কন্ভেণ্টে লেখাপড়া শেখাব দরকার কি? আমাদের ইস্কুলে আমাদের মেয়েরা আমাদের মতই লেখাপডা শিখবে—নয়ত কি মেম সাহেব হবে? এই ত কুমুদিনী এখন পড়ছে সে ইস্কুলে, মন্দটা কি হয়েছে? আর ওই গিরীশ তা মানত না। বিয়ে করে শৈলকে ফরাসী শেখাবার জন্য সে মেম সাহেব রেখেছিল মাইনে করে। কি হবে তার ফরাসী শেখে? সম্মোহিনী জানে, তাই শৈলর জিদ—তারও শেখা চাই।

মনোরমাও একমত হয়। বলে, ওই শৈলর আর এক দোষ—ভাবে, সবাইকে টেক্কা দিতে হবে।

সহজেই মাসীমাকেও মনোরমা আপনার নিকটের লোক বলিয়া বুঝিতে পারে—সে আর শৈলী না, সে মনোরমা।

কুমুদিনীর মা ও কুমুদিনীও আবার তাই একটা নিশ্চিত আশ্রয় পাইল। বিশেষ করিয়া মনোরমার খোকা কুমুদিনীকে বেশ পাইয়া বসিল। গৃহকর্মে মনোরমারই ব্যস্ত থাকিতে হয়, কাজেই সে সময়ে কুমুদিনী খোকার ভার গ্রহণ করে। খোকার খেলা ও তাহার নিজের পড়াতে মিলিয়া সমস্ত জিনিসটা একটা উপাদেয় খেলা হইয়া ওঠে। মনোরমাও তাই কুমুদিনীকে আরও আপনার বলিয়া জানে,—তবে পড়াশুনা ছাড়িলে চলিবে কেন? তাহার নিজের ত আর তেমন অবসর নাই, কিন্তু কুমুদিনীর এখনো সময় আছে। তারপর তাহারও যখন সংসার হইবে সে কি আর সময় পাইবে?

কুমুদিনীর মা সখেদে বলেন, সে ভাগ্য আর হল কই ওর? বয়স ত কম নয়—এখন আঠার'তে পৌছুচ্ছে। ঘরে-দুয়ারে থাকলে কি আর পাত্র জোগাড় হত না?

সত্যই ত, বিবাহ ম'সু'' করিতেই হইবে এবং বয়সও হইয়াছে কুমুদিনীর। কিন্তু কাহার সহিত এই সমস্যা মনোরমা আলোচনা করিবে? চিন্তাহরণ আছে, কিন্তু সে বড় ভাবাশ্রিত মানুষ। এই একটা বৎসর ধরিয়া তাহারা আবার নানা কাজেকর্মে প্রায় নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পায় না।

মনোরমা তাই মাসীমাকেই বলে, আচ্ছা, এসব ত হল। কিন্তু এত যে মেয়ে আপনারা উদ্ধার করছেন, তাদের বিয়ে দেবেন না? না হলে, ওরা করবে কি? সমাজের হবে কি?

গুপ্তমহাশয়ের গৃহিণী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, ওই ত মুশকিল। ওঁদের কি সে খেয়াল আছে? ওঁকে বল্‌লাম। উনি বলেন, 'ওই ঘটকালিটা তোমাদের—মা-মাসীদের। বিলাতেও তাই হয়।' বল্লো

ত কে শোনে আমাদের কথা আজকাল? ছেলেরা মেয়েরা নিজেরা ঘটকালি করছে,—ওই ত শৈল-গিরীশকে দেখলাম।

সমস্যাটি তুলিয়া মনোরমা চিন্তাহরণকে বলিল, আমি কুমুদিনীর কথা ভাব্‌ছিলাম।

চিন্তাহরণ বলিল, কুমুদিনী? তার কি হয়েছে?

হবে কেন? কিন্তু তার বিয়ে হবে না?

চিন্তাহরণ বলিল, হবে নিশ্চয়।

কোথায়, তা ভেবেছ কি? কে বিয়ে করতে রাজী হবে তাকে? —আবার কুমুদিনীর মাও ত মেয়ের সঙ্গে থাকবে।

চিন্তাহরণ দুঃখিত হয়।—রাজী হবে মানে? ব্রাহ্মসমাজে এমন যুবক কে আছে যে বল্‌বে—'আমি এ মেয়েকে বিয়ে করব না।' সে ব্রাহ্মই নয়।

মনোরমা বলে, বেশ! তাহলে রাজীব ঠাকুরপোকে বলো, না?

রাজীব!

নয় ত কে? সে তাদের পূর্বাপর জানে। সে যদি জেনে শুনে কুমুদিনীকে বিবাহ করতে না পারে, তাহলে অন্য কেহ কেন এই অপরিচিতা মেয়েকে বিয়ে করবে?

চিন্তাহরণ মানিল ইহা সত্য কথা। সমস্যাটা রাজীবের নিকটও ঠিক এই পদ্ধতিতেই তখন মনোরমা উত্থাপন করিল।

রাজীবও তেমনি বলিল, ব্রাহ্ম যুবক সত্যই ব্রাহ্ম হলে নিশ্চয়ই এ বিবাহে স্বীকৃত হবে।

মনোরমা বলিল, সে ত কথা নয়। কে করবে—বিয়ে? তোমরা কেউ করবে? তার মাও ত আছেন সঙ্গে। এইত এখন চিন্তায় পড়লে। বলো কে করবে?

রাজীব কি ভাবিতেছিল বুঝা গেল না। বলিল, আমি।

মনোরমা চিন্তাহরণকে সহাস্যে জানাইল, ঠাকুরপো ও ঘটকালিটা নিজেই করতে পারতেন, বুঝ্‌লাম। আমার দরকার ছিল না। কুমুদিনীর গাল টিপিয়া বলিল: কিলো, সব যদি ঠিক জানতিস্‌, আমাকে কেন ঘুরিয়ে মারলি।

কুমুদিনী অবাক্‌ হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, কি দিদি?

সহজে মনোরমা বিশ্বাস করিত না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কুমুদিনীকে অবিশ্বাস করিতে পারিল না। মেয়েটা সত্যই সরল। রাজীবই তাহা হইলে মনে মনে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু চিন্তাহরণ বলিল, তাহাও সত্য নয়। রাজীবও পূর্বে তাহা ভাবে নাই, ভাবিলে সে চুপ করিয়া থাকিত না। সে নিজেই উদ্যোগী হইত। সেও ত একটি অকাট ষণ্ড!

দূর শৈলাবাসে গিরীশ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, হুররা।

শৈল শুনিল রাজীবের বিবাহ।

কোথায়, শুনিতে শৈল উদগ্রীব; শুনিয়া শৈল গম্ভীর হইল। বলিল, ওই মেয়েটাকে দাদা ভাই বিয়ে করবেন? কার না কার মেয়ে?—

গিরীশের কপালে ভ্রুকুটি দেখা দিল। শৈল তাড়াতাড়ি বলিল, তা নয়। ওর মাটা ডাইনী বুড়ী, পৌত্তলিক পূজা হিন্দু আর্চাও করে—

গিরীশ বলিল? মা যাই থাক, মেয়ে তাতে মন্দ হবে কেন?

গিরীশ ঠিক করিল, কুমুদিনীকে একটা বড় উপহার দিবে—একটা নেক্‌লেস। কিন্তু শেষ পর্যান্ত শৈলর কথা মত একটা পার্শী ইয়ারিরিং মাত্র পাঠাইতে হইল—সিমলায় বড় খরচ। রাজীব যে সত্যই সংসারে প্রবেশ করিল তাহাই আনন্দের কথা।

শৈল ও গিরীশের প্রস্থানের পরে চিন্তাহরণ মনোরমার সংসারকে রাজীব একটা নূতন আশ্রয় ক্ষেত্র হিসাবে প্রথম দেখিতে পায়। সে বুঝিল —সন্তান শুদ্ধ বউঠান চিন্তাদাদার জীবনে একটা নূতন গতিবেগের সঞ্চার করিয়াছেন, তাই চিন্তাদাদা এমন সহজভাবে আজ সমাজের কাজে আত্ম-

নিবেদন করিতে পারিলেন। কারণ, সংসার ধর্ম তাঁহাকে একটা শান্তি দান করিয়াছে। সেই তুলনায় রাজীব যেন বায়ুভূতঃ নিরাশ্রয়। মনে মনে এই বোধটা পাকিয়া উঠিতেছিল, তাই প্রস্তাবটা উঠিতেই রাজীব এক মুহূর্তেই স্থির করিয়া ফেলিল—সংসার সে বরণ করিবে কুমুদিনীকে লইয়া। কিন্তু স্বীকার করিবার পরে মনে হইল—সে একটা আরাম বোধ করিতেছে। হাঁ, বিবাহ করিতে হইলে সে আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিত না। কুমুদিনী না জানিয়াই তাহাকে লতার মত ঘিরিয়া ধরিয়াছে, রাজীবও তাহাকে লইয়াছে স্বচ্ছন্দে। কথাটা ভাবিতেও সে একটা সলজ্জ আনন্দ লাভ করিতেছে। তাইত,—রাজীব বিস্ময় চকিত দৃষ্টিতে ভাবিল,—তাইত এই অনুভূতিটা কি? অদ্ভুত মধুর যে এই অনুভূতি! ইহাই কি তবে প্রেম? ইহাই প্রেম?

রাজীব আরও চমৎকৃত হয়। কিন্তু সে কর্মীপুরুষ, আপনার মনে তাহা লইয়া বিচার বিশ্লেষণ করিতে বসে না। সে স্থির করিয়া ফেলে, হাঁ, ইহাই প্রেম। কুমুদিনীকে সে পূর্বাপরই ভালোবাসিয়াছে।

শিক্ষকরূপে রাজীব গেল বাঙলার শেষ প্রান্তে—আসামের শহরে। সেখানে উদ্যোগী ব্রাহ্ম উকিল দুইজন ছিল, আর ডিপুটি হরকান্ত দত্তও তখন সেখানে। তাহারা একটি ব্রাহ্ম কেন্দ্র গঠন করিবে। একটা মধ্য ইংরেজী ইস্কুলে এন্‌ট্রান্স পড়াইবার আয়োজনও তাহারা করিয়া ফেলিল। সমাজকর্তারা রাজীব চৌধুরীকে শিক্ষকরূপে প্রেরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও করিবে, সমাজের প্রচার তাহাতে অগ্রসর হইবে। উপরন্তু রাজীবেরও কিছু উপার্জন হইতে পারিবে; উপার্জন না করিলে চলিবে কেন? দুইদিন পরেই সে সন্তানের পিতা হইবে। ব্রাহ্মপতি, ব্রাহ্মপিতা, দায়িত্ববোধহীন মানুষ নন; উপার্জন ও সঞ্চয় না করিলে তাহাদের কর্তব্যচ্যুতিই ঘটিবে।

এই নূতন ইস্কুল পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর বনমালী চট্টোপাধ্যায়। রাজীবের পরিচয় জানিয়া ফেলিলেন।

—তুমি সেই দেবপ্রসাদ চৌধুরীর ভাইপো! তাঁর ছেলে সেই বিভূতি গেল কোথায়? তুমি ব্রাহ্ম বলে তারা তোমার খোঁজ রাখেনি, তুমিও তাদের খোঁজ রাখনি? কি যে তোমরা বলো।

তারপর: আচ্ছা, তাঁর ছাত্র চিন্তাহরণ গাঙ্গুলী বাঙলা কবিতা লিখত তখন, বি-এ পাশ করেছিল, সে কোথায় গেল?

প্রৌঢ় ঈষৎ-স্বতন্ত্র বনমালী চট্টোপাধ্যায়ের চোখ ঔৎসুক্যে উজ্জ্বল;—চিন্তাহরণের কথা তিনি শুনিলেন। চিন্তাহরণ কাজ লইয়া কলিকাতায় আছে। আর বাঙলা লিখে না। অবশ্য সেখানে ইংরাজীতে ধর্মবিষয়ক পত্র পরিচালনায় সাহায্য করে।

স্পষ্টই তিনি বিষণ্ণ হইলেন। বাঙলায় কি কিছু লিখিবার মত নাই?

বাঙালীর সমাজ, সাহিত্য কি কিছু নয়? 'আর বাঙলা লেখে না'?—কথাটা একটু খেদের সঙ্গেই আবৃত্তি করিলেন বনমালী চট্টোপাধ্যায়। তাহারা বাঙলা লিখিল না—অথচ এমন কৃতী সন্তান তাহারা দেশের, লিখিবার মত শক্তিও ছিল। শুধু ধর্ম ও সংস্কারে নামে সব ছাড়িয়া দিতে হইবে কেন? রমেশচন্দ্র দত্তকে দেখুক। শত কাজ, শত গবেষণার মধ্যেও তিনি বাঙলা উপন্যাস রচনা করিতেছেন—'সংসার' তোমরা পড়িয়াছ! কিন্তু 'মাধবী কঙ্কণ' দেখিয়াছ?—তারপর তাঁহার উৎসাহ আবার জাগিয়া উঠে—আজ বাঙলা সাহিত্য আর অবজ্ঞার জিনিস নাই। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের কবিতা দেখ। 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'ভারত সঙ্গীত' ত আজ মুখস্ত বলিতে পারে স্কুলের ছাত্ররাও। আরও কবিও আছেন;—বিহারীলাল চক্রবর্তীর নাম তত শোনো নাই?—'আর্যদর্শনে' 'সারদা মঙ্গল' কতকটা বাহির হইয়াছে। হয়ত চিন্তাহরণও তাহা পাঠ করিলে উপকৃত হইত। হাঁ, 'বঙ্গদর্শনের' মত না হউক 'আর্যদর্শন', 'এডুকেশন গেজেট', 'অবোধবন্ধু', 'ভারতী' এইসব পত্রের মধ্য দিয়া বাঙলা সাহিত্য প্রসার লাভ করিতেছে। 'সোমপ্রকাশ', 'অবলাবান্ধব', 'সমদর্শী', 'সুলভ সমাচর' যাহা করিতে চায় করুক; বনমালীর তাহাতে তত উৎসাহ নাই। কিন্তু একখানি ভালো কাব্যগ্রন্থ, একটি ভালো উপন্যাস, একখানি ভালো নাটক—ইহা সমস্ত লেখা, তর্ক, আলোচনা, উত্তেজনা ছাড়াইয়াও দীর্ঘতর দিন বাঁচিয়া থাকিবে,—জাতিকেও আরও অধিক মর্যাদাদান করিবে। ধর্মান্দোলন নয়, সংস্কারান্দোলনও নয়, বরং সাহিত্যই মানুষের মুক্তি-সাধনার আজ প্রধান ক্ষেত্র।

—সে সাহিত্য তোমরা লিখলে না?—বনমালী চট্টোপাধ্যায় আবার বলেন—বিষণ্ণ হাস্যে।

সকলে কি লিখতে পারে?—রাজীব বলিল।

তাতেই ত আরও দুঃখ -যারা পারে তারাও যদি না লেখে। নরত্বং দুর্লভং লোকে কবিত্বংস্তু সুদুর্লভং। চিন্তাহরণ ভুল করলে।

আবার শুনেন তিনি চিন্তাহরণ কি করিতেছে, গিরীশই বা কোথায়।

তারপর বলিলেন: যাক্ তুমি কি করবে?

শিক্ষকতা করছি।

বনমালী চট্টোপাধ্যায় বলিলেন,—তাহলে এসো গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে তোমাকে নিই—

গবর্ণমেণ্টের? রাজীব পূর্বে ভাবে নাই। হঠাৎ মনঃস্থির করিতে পারিল না। অবশ্য শিক্ষাবিভাগের কার্যে তাহার তত বিরাগ নাই। তবু রাজীব বনমালী চাটুজ্জেকে বলিল, আপনাকে পরে জানাব।

কিন্তু মনঃস্থির করিতে বিলম্ব হইল না। গৃহে চিন্তাহরণের পত্র পূর্বেই আসিয়াছিল, তাহা রাজীব আবার খুলিয়া পড়িল।—শীঘ্রই চিন্তাহরণ প্রচারের কাযভার লইয়া পশ্চিমে যাইবে, সম্ভবত পাঞ্জাবেই সে যাইবে। শিখ ও অন্যান্য ভারতীয় সাধনা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে সে আগ্রহান্বিত। ইতিমধ্যে কিন্তু তাহারা পুরাতন বন্ধুরা একটা সত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছে। রাজীব ত জানে, তাহারা কতবার ভাবিয়াছে সেই শপথ গ্রহণ করিবে:—নিরাকার এক ঈশ্বরের উপাসনা ছাড়া অন্য কোনও উপাসনায় যোগদান করিবে না; জাতিভেদ মানিবে না; সরকারী চাকুরি গ্রহণ করিবে না, ষোল বৎসরের কম নারীর বা একুশ বৎসরের কম পুরুষের বিবাহে পৌরোহিত্যও করিবে না। রাজীব পড়িল—এই শপথই কাল আমরা গ্রহণ করিয়াছি। আমরা স্বহস্তে প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিলাম। তারপর উপাসনা করিলাম। অগ্নি স্পর্শ করিয়া আবার প্রত্যেকে সেই প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিলাম। আবার উপাসনা করিলাম। এই সত্যব্রত গ্রহণ করিয়া প্রাণ সুস্থির হইল।

তুমি উপস্থিত নাই, তবু অনুভব করিলাম—তুমি প্রাণে-প্রাণে আত্মায়-আত্মায় আমাদেরই সাথী হইয়া রহিয়াছ।"

পত্রখানা রাজীব আবার তুলিয়া রাখিল। সেখানে সে উপস্থিত ছিল না। না থাকুক এই সত্যব্রতে সে তাহাদেরও সাথী, চিন্তাহরণের এই অনুভূতি কি মিথ্যা? না। চিন্তাহরণ জানিত, সত্য-সত্যই রাজীবেরও ইহাই ছিল সংকল্প। আর দেরী করিল না—রাজীবও অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত করিল, প্রার্থনা করিল, শপথ পাঠ করিল—কুমুদিনী তাহার সঙ্গী রহিল। প্রার্থনা করিল, হে একমেবাদ্বিতীয়ং, এক জাতি, এক স্বাধীন রাষ্ট্র,—হে ভগবান, ভারতবর্ষের জন্য তোমার এই বিধান যেন আমি এক নিমেষের জন্য বিস্মৃত না হই।

বনমালী চট্টোপাধ্যায় তথাপি একটা উপকার না করিয়া ছাড়িলেন না। জলপাহাড়ীর ছোটকুমারের সম্পত্তি সরকারের রক্ষণাবেক্ষণে আসিয়াছে। হরকান্ত দত্ত উহার ভারে। বালক জমিদার পুত্রের জন্য একজন অভিভাবক শিক্ষক প্রয়োজন। প্রবীণ কোনো শিক্ষকই নিযুক্ত হইবার কথা। দত্ত মহাশয় আশা করেন নাই সেই বঙ্কিম ভূদেবের শিষ্য বনমালী চাটুজ্জে নাম সুপারিশ করিবে ব্রাহ্ম রাজীব চৌধুরীর। কিন্তু রাজীবের নামেই সুপারিশ যখন আসিল, তখন রাজীবকে হরকান্ত দত্ত নিযুক্ত করিলেন জোর করিয়াই। নাবালক জমিদারের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বড় কুমার ইহাতে আপত্তি করিয়া প্রজা-পুরোহিত দিয়া দরখাস্ত দেওয়াইল। কিন্তু সেই কথা সরকার শুনিবে কেন? এই দুর্বৃত্ত ভ্রাতার কবল হইতে নাবালক ছেলেটিকে রক্ষা করাই হইবে অভিভাবকের প্রধান কাজ।

হরকান্ত দত্ত বলিলেন: আসল কথা ভুলো না—ছেলেটা যেন মানুষ হয়। আমাদের দিকে যেন ওর আকর্ষণ বাড়ে, তা ত দেখবেই,—কিন্তু সাবধানে।

রাজীবের ভয় ছিল জমিদারের ছেলেকে মানুষ করা সহজ কথা নয়, বিশেষত তাহার বিধবা মা আছেন। সর্বদাই তিনি ভাবেন—'শত্রুরা' বুঝি তাঁহার ছেলের জীবননাশ করিবে। এই 'শত্রুরা' অবশ্য তাহার সপত্নীপুত্র সূর্যনারায়ণ, তাহার মাতা ও তাহার দলবল। ভাগ্যক্রমে রাজীবের সুবিধা হইল। সূর্যনারায়ণ রাজীবকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেই রাজীব তাহাকে প্রকাশ্যে এমন অপমানিত করিল যে, সূর্যনারায়ণের প্রধান শত্রু হইয়া উঠিল জয়নারায়ণের এই ব্রাহ্ম মাষ্টার। গুণ্ডা লাগাইয়া সুবিধা হইবে না, রাজীবের সাহসের ও শক্তির খ্যাতি এখানেও পৌঁছিয়াছে। গুপ্ত চেষ্টাও ব্যর্থ হইল—রাজবাড়ির 'সিধা'র কাঁঠাল খাইয়া রাজীবের ভৃত্য দশরথ প্রায় মৃতপ্রায় হয়। ডাক্তার বলিল, আর্সেনিকের বিষক্রিয়া। দশরথ বাঁচিল। কিন্তু এই ফল কোথা হইতে আসিল, তাহার অনুসন্ধান যখন জোর চলিতেছে তখন সূর্যনারায়ণ কলিকাতায় পালাইল।

রাণীমা এইবার নির্ভয়ে তাহার পুত্রকে সঁপিয়া দিলেন রাজীবের অভিভাবকত্বে, আর জয়নারায়ণও আপনিই মাষ্টার মহাশয়ের ভক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাজীব জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ লাভ করিল। একই সঙ্গে সে লাভ না করিল এমন জিনিষ নাই। রাজবাড়ির সংলগ্ন গৃহ জুটিল, পরিচারক জুটিল, সেবক-পরিজন জুটিল। প্রায়ই রাজবাড়ির 'সিধা' আসিতে লাগিল—শিক্ষক মহাশয়ের জন্য। তাহা ছাড়া রাজীবের চিকিৎসা করার অবকাশ জুটিল এবং জমিদারদের সহায়তায় দশটি হিতকর কর্মে রাজীবের সাহায্য করিবার ক্ষমতাও হইল। উদ্যোগ, দৈহিকবল ও সাহসের অভাব তাহার ছিল না, সুযোগ লাভ করিতেই তাহাও বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। চিকিৎসক হিসাবে সে লোকের আস্থালাভ করিতে পারিল, প্রতিষ্ঠা অর্জন করিল।

জমিদারীর বেশ কতকটা অংশ পাহাড়। রাজীবের ইচ্ছা শিকারে যায়—জয়নারায়ণ বন্দুক ছুঁড়িতে শিখুক। ইংরেজের আর্মস্ অ্যাক্ট দেশের যুবকদিগকে কাপুরুষ করিবারই একটা অস্ত্র। কিন্তু পাহাড় অঞ্চলের জঙ্গলে অনেকটা জায়গাই জমিদারদের হাতে নাই। পূর্বতন রাজা নিজের ইচ্ছায় ও ডিপুটি কমিশনারের চাপে তাহা ইংরেজ চা-কর দিগকে নামমাত্র টাকায় ইজারা দিতে বাধ্য হইয়াছে। দশ বিশ বৎসরের মধ্যে সাহেবেরা শুধু চা-বাগানে নয়, এদিকে ওদিকে সমস্ত পাহাড়ই আত্মসাৎ করিয়া বসিয়া গিয়াছে। নিজের পাহাড়ে বনে শিকার করে, জমিদারের শিকারের অধিকারও স্বীকার করে না। চা-করদের প্রকাণ্ড ক্লাব শহরে, অপ্রতিহত ক্ষমতা জিলায়। রাজীব জয়নারায়ণের শিকারের সুযোগ চায় পাহাড়ে—কিন্তু সাহেবদের সঙ্গে সেই তর্ক করিবে কে? সে ত শিক্ষক মাত্র, জমিদারীর পরিচালক সরকার—অর্থাৎ ডিপুটি কমিশনার। আর তিনি নিজেই চা-করদের জাতির মানুষ। হরকান্ত দত্ত রাজীবকে উৎসাহ দেন না—শিকারে কি কাজ? আসলে, এ জিলায় কেন, সমস্ত আসামেই চা-করের রাজত্ব, সকলের ভালোমন্দের তাহারাই নিয়ন্তা, কেহ তাহাতে প্রশ্ন করিবার কথাও ভাবে নাই। সরকারি কর্মচারীদের ত কথাই উঠেনা, উকিল-মোক্তার দোকানী-পশারী অনেকেই নিজ নিজ জীবিকার জন্য সাহেবদের উপর অল্লাধিক নির্ভরশীল। চা-কর সাহেবদের টাকা আছে, খরচ করিতে পারে, খরচও করে। শহরের পথঘাট, আলোকের ব্যবস্থায়, মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপনে তাহারা যাহা দান করিবে, অন্য কেহ তাহার সিকি ভাগও দিতে পারে না। বাগানে সাহেবরা বাঙ্গালী কুলী ও কুলী কামিনদের লইয়া কি করে না করে, তাহা সকলেই যথেষ্ট জানে,—যাহা ঘটে তাহার অপেক্ষাও বেশি করিয়াই হয়ত শোনে। কারণ, বাগানেও বাঙালী কেরানী, দপ্তরি, তথাকথিত ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার আছে,—অন্য কাহারও প্রবেশের

অধিকার অবশ্য বাগানে নাই, উহা নিষিদ্ধ এলেকা। কিন্তু সেখান যাহা ঘটে তাহা লইয়া মাথা শহরে ঘামাইয়া কি হইবে? এই জঙ্গলী কুলীগুলিও আসলে মানুষ নয়—অসভ্য, বন্য মানুষ, আচার নীতি কিছুরই জ্ঞান নাই। চা-বাগানে উহারা আসে কেন? আড়কাঠিরা ভুলাইয়া আনে। তারপর, একবার আসিলে আর বহির হইবার উপায় নাই, চিরজন্মের মত বন্দী।— কিম্বা কালাজ্বরে মৃত্যু।

প্রথম শুনিয়া রাজীব বলিয়াছিল—একি দাস-প্রথা নাকি?

হরকান্ত দত্ত বিরক্ত হন—দাসপ্রথা সম্বন্ধে তাহার ধারণা নাই বলিয়াই রাজীব এইরূপ বলিতেছে। দাসপ্রথা ইংরেজই প্রথম পৃথিবীতে অচল করিয়া দিয়াছে। এই দেশেও তাহারাই দাসপ্রথা বাতিল করিয়াছে। ইহা 'চুক্তিবদ্ধ শ্রমজীবী নিযোগ'। অবশ্য চুক্তি এই কুলারা না জানিয়া, না-বুঝিয়া করে—আড়কাঠির প্ররোচনায়। শিক্ষালাভ না করিলে এই দশাই ইহাদের ঘটিবে।

হরকান্ত দত্তের সঙ্গে তর্ক করা অসম্ভব, তিনি অপমানিত বোধ করেন। তিনি মানী লোক, তাঁহার ছেলে মহেশ ব্যারিস্টার, গুপ্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় জামাতা হইতেছে। তর্ক না করিলেও রাজীব তথাপি বলে, ওরা না বুঝে চুক্তি করে। কিন্তু চুক্তি যারা স্থির করে, তারা শিক্ষিত,—এই চা-কর সাহেবরা।

কথাটার অন্যদিকে মোড় ঘুরাইয়া, তাহারা, আইনানুযায়ী চুক্তি স্থির করে, তাদের দোষ দেওয়া যায় না—হরকান্ত দত্ত আইনের ব্যাখ্যা করিতে থাকেন।

রাজীব আইন পড়ে নাই। তাই আইনের এই মহিমা সে বুঝিতে অক্ষম। সে কেন, তাহার উকিল বন্ধুরাও অক্ষম। কিন্তু হরকান্ত দত্তের সঙ্গে তর্ক করা চলিবে না। তিনি শুধু ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার তাঁহাদের নেতা নন, আইন-কানুনেও দৃঢ় বিশ্বাসী। পূর্বেও রাজীব তাহা

জানিত, কিন্তু এখন দেখিল এত বৎসর সরকারী চাকুরী করিয়া করিয়া সেই ব্রাহ্ম-পরিচয়ে গর্বিত রাশভারী হরকান্ত দত্তও কম পরিবর্তিত হন নাই। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহার এখনো আছে, কিন্তু আইন-আদালত, 'মহারাণীর ঘোষণা পত্র' ও ও 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য', এই সবের আনুকূল্য যে সত্যধর্মের প্রয়োজন—এবং সুকৌশলে তাহা সংগ্রহ করাও প্রয়োজন,—এই বোধ তাঁহার এখন একেবারে মজ্জাগত হইয়াছে। বরং এখন অতি সহজেই ইংরেজের নামে তিনি অবনত হইয়া পড়েন। রাজীব কিছু বলিল না, কিন্তু আরও সে বুঝিল—সরকারী চাকরি, বিদেশীয় সরকারের চাকরি, সেই গর্বিত তেজস্বী মানুষকেও কতখানি মোহগ্রস্ত করিয়াছে। ইঁহার নিকট কিছু আর প্রত্যাশা করা বৃথা। হরকান্ত দত্তও রাজীব চৌধুরীকে জানেন —সেই প্রথম যৌবন হইতে। তাই তিনি বুঝিলেন—রাজীব সন্তুষ্ট হয় নাই। তিনি কথাটির মোড় ঘুরাইয়া বলিলেন, অনিষ্টের আসল মূল ওই আরকাঠিগুলি—যারা ওদের যা তা বুঝিয়ে ওই চুক্তিপত্রে টিপসই নেয়। পৃথিবীতে এমন জঘন্য মানুষ আর হয় না। অথচ, আমাদেরই দেশের মানুষ তারা।

এই 'জঘন্য মানুষগুলিকে' নিযুক্ত করে কিন্তু সেই সভ্য সাহেবেরা।

রাজীব কিছুদিন পরেই আরও বুঝিল—এই জঘন্য মানুষদের ছাড়া অন্য কাহাদেরও দিয়া চা-বাগানের সাহেবের কাজ চলিত না। অনেক জঘন্য কার্য-সম্পাদন করানো তাহাদের প্রয়োজন।

চা-বাগানের পরিত্যক্ত কুলি-ছোকরাটা আসিয়া পড়িয়াছিল রাজীবের হাতে। ডুমরুর বৎসর চৌদ্দ বয়স। রাজীবের চিকিৎসায় সে বাঁচিল, তারপর রহিয়া যায় কুমুদিনীর গৃহে—কুমুদিনীর ছেলে দুইটিকে দেখে কাজকর্ম করে। রাজীবের আত্মপ্রসাদ—একটা মানুষকে সে সত্যই বাঁচাইয়া। কুমুদিনীরও কেমন ছেলেটার উপর মায়া পড়িয়া

গিয়াছিল। ডুমরু খোকাকে লইয়া নানা খেলা খেলে। কিন্তু এমন সময় বাগানের সর্দার আসিল—চল্।—ডুমরু চুক্তিবদ্ধ কুলী ত।

ডুমরু যাইবে না। চীৎকার করিয়া খুন। সর্দার তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। রাজীব গৃহে নাই, কুমুদিনী অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া নিষেধ করিতেছে।—কে শোনে? চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিল রাজীব; আগুন হইয়া উঠিল। তাহার আশ্রিত ডুমরু, কে তাহাকে জোর করিয়া বাড়ি হইতে লইয়া যায় তাহার অনুমতি ছাড়া?

সর্দার এবার বিনীত হাস্যে জানায়, উ বাগানের কুলী, হুজুর।

বাগান থেকে তারা ওকে তাডিয়ে দিয়েছিল মরতে। তবু বাগানের কুলী?

সর্দার জানায়, ঠিক। কিন্তু বাঁচিয়া যখন উঠিয়াছে তখন ত কুলীই।

তবু দাসপ্রথা নয়। ইহা আইনসঙ্গত চুক্তিবদ্ধ কুলীপ্রথা।

রাজীবের মাথায় শিরা দপ্‌দপ্‌ করতে লাগিল—ডুমরী চীৎকার করিতেছে, মা, মা! বাবা! কিন্তু এতদিনে রাজীব আইনের ফাঁকও জানিয়াছিল, বলিল, ওর ত চুক্তি করবার মত বয়সও হয়নি। কাজেই চুক্তিতে ও বাধ্য নয়।

এই সব যুক্তিও সর্দারের জানা।—উহার মালিক উহার বাপ-মা। বাপ-মা উহার খোরপোষ বাবদ চা বাগানের টাকা লিয়াছে,—সেই বাপ-মা'র মালিকানার উপরে হুজুরের দাবী খাটিবে না।

কিন্তু রাজীব চৌধুরী তাহা শুনিবে না। সর্দার শেষে ক্রুদ্ধভাবেই জানাইয়া গেল, যাইতে ত ওর হইবেই, তবে ওর বাগানে গেলে আর পিঠে চামড়া থাকিবে না। হুজুরেরা ব্যাপারটা বুঝিতেছেন না, ডুমরু বাগানের কুলী।

হুজুরেরা সত্যই বুঝেন নাই। সর্দার গেল, দরয়ান বরকন্দাজ মোচ চুমড়াইয়া লাঠি লইয়া ভোজপুরী বুলি আওড়াইয়া উপস্থিত হইল।

দেখিয়াই রাজীবের খুন চাপিয়া যাইতেছিল। গোলমাল শুনিয়া জমিদার বাড়ির রাণীমাও তাঁহার ভোজপুরী দরওয়ানদের পাঠাইলেন—মাষ্টার সাহেবের ইজ্জত রাখিতে হইবে। ভোজপুরীতে-ভোজপুরীতে কথা হইল, মৈত্রী বিনিময় হইল, পরিচয় সম্পূর্ণ হইল। একবার জমিদার বাড়ির দরয়ান বলিল: মাষ্টার সাহেব, এ লেড়কাকো ছোড় দেনাই আচ্ছা হায়। নহি ত সাহেব লোগ বন্দুক লেকর আয়গা।

রাজীব বলিল, দেখেঙ্গে উভি।

বলিতে বলিতে রাজীব চৌধুরীর মনে জাগিয়া উঠিল দেবনন্দন ওঝা, তাহার মূর্তিও সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি!

কুমুদিনী ভয় পাইল—রাণীমা নানা কথা বলিতেছেন। কুমুদিনী বুদ্ধি করিয়া বলিল, ওকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও না।—কিন্তু রাজীব তাহা শুনিবে না।

নিতান্ত শহর, তাই সাহেবেরা বন্দুক লইয়া আসিল না, থানার ওয়ারেণ্ট লইয়া আসিল। শুধু পলাতক কুলী নয়, ডুমরু মালপাহাড়ীয়া বাগানের জিনিস চুরি করিয়া পালাইতেছে। উকিল বন্ধুরা রাজীবকে নিরস্ত করিল—হাঙ্গামা করিয়া কি হইবে? আইন আছে ত, দেখিব আমরা। কিন্তু বাঙালী হাকিম তাহাদিগকে জামিনও দিতে সাহস করিল না।

রাজীবের জিদ্ আরও চাপিয়া গেল—ইহাই ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব!

ডুমরু ছেলেটার খোঁজ রাজীব পাইল না। থানা হইতেই সাহেবরা ডুমরুর জামিন হইয়া তাহাকে বাগানে লইয়া গেল। বাগানে তাহার অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যু ঘটিল। আর কিছু বলিবার নাই, করিবার নাই।

কুমুদিনী কাঁদিল, দুঃখ করিয়া বলিল, হয়ত প্রথমই ছেড়ে দিলে ভালো হত।

রাজীব জানে তাহাতেও ছেলেটা বাঁচিত না, খাটুনিতে মরিত। অন্যত্র পাঠাইলেও নিষ্কৃতি পাইত না, পুলিশ দিয়া চা-করেরা ধরাইয়া আনিত। কিন্তু তথাপি রাজীবের নিজের মনে এই অনুতাপ রহিয়া গেল —তাহারই জন্য এমন ছেলেটার মৃত্যু ঘটিল। দুর্বার ক্রোধ ও ক্ষোভে রাজীবের অন্তর এবার জ্বলিয়া উঠিল। 'বেইমানী, বেইমানী'— এই দেশে ইংরেজের সমস্ত ইতিহাসটাই বেইমানীর ইতিহাস। তাহারা সমাজ সংস্কারের প্রতিজ্ঞা লইয়াছে, সত্যব্রত গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিথ্যা-এই পরাধীনতা, তাঁহার বিরুদ্ধে কেন এত নিষ্ক্রিয় ?

কুমুদিনীর অত সাহস নাই। সে সাধারণভাবে সংসার করিতে চাহে। কিন্তু নিজের জীবনে সে এই ব্রাহ্মদেরই চেষ্টায় রক্ষা পাইয়াছে। মানুষের উপরে অবিচারে ইহারা ক্ষেপিয়া যায়;—ক্ষেপিয়া যাইবেও,— ইহাই ইহাদের স্বভাব; তাহাতে কুমুদিনী ভয় পাইলেও আপত্তি করিবার সাহস পায় না। মানুষের উপর অবিচারে সে নিজে তত ক্ষিপ্ত হয় না, শুধু দুঃখই পায়। দুঃখ পায় বলিয়াই ভাবে—হয়ত রাজীব অত বেশী জিদ না করিলেই ভালো হইত। বিশেষত, তাহার মাও রাণীমায়ের নিকট নানা কথা শুনিয়া ভয়ে অস্থির হন। বলেন, ছেলেপিলে আছে তোদের। তাদের কথাও কি রাজীব ভাবে না? কুমুদিনী আরও ভয় পায়। সন্তর্পণে রাজীবকেও শেষে বলে— একটু বুঝিয়া সুজিয়া চলিলে মানুষের মঙ্গল করা সহজ হয়। ডুমরুকে রাখিবার জন্য অমন জিদ্ না করিলে হয়ত ছেলেটাকে অমন করিয়া সাহেবেরা মারিত না।

রাজীবের চক্ষে সে দেখে তীব্র তিরস্কার ও বেদনা, তুমিও বলো এমন কথা!

কুমুদিনী রাজীবকেও জানে—এই মানুষ কোনোদিকে জ্রক্ষেপ

করিবে না। বুঝি তাহার দিকেও তাকাইবে না, ছেলেদের দিকেও না। কেমন একটা হতাশা আসে তাহার। তাহার মা গোপনে গোপনে এখন ঠাকুর-দেবতার পূজা মানত করে, কুমুদিনীকেও নানা প্রসাদ আনিয়া দেয়, কিন্তু কুমুদিনীর তাহাতে আস্থা নাই। সে আপন মনে প্রার্থনা করে, ভগবান! তুমি এই উন্মাদ পুরুষকে সুমতি দাও। আমার ছেলে-মেয়েদের রক্ষা করো। আমি অন্য কিছু চাই না, অন্য কথা বুঝিও না, কিন্তু আমি মন্দ কিছুই চাহি না। আমার ছেলেমেয়েরা সুখে থাক, স্বামী নিরাপদ থাকুন!—কুমুদিনীর ভয় তথাপি কাটে না—যে প্রকৃতির মানুষ রাজীব চৌধুরী!

চা-কর সাহেবের লাথিতে প্লীহা ফাটিয়া মরিল একটা কলার পশারী। সেই কলাওয়ালা—কুমুদিনীকেও যে মাঝে মাঝে কলা বিক্রয় করিয়া গিয়াছে। সাধারণ মানুষ, ছোট চোখ দুইটি, হলুদে হলুদে রঙ, হাসিত দাঁত দুটি বাহির করিয়া। কুমুদিনী আপনা হইতেই বলে, আহা! কিন্তু রাজীবের সম্মুখে সেই দুঃখ প্রকাশ করিতেও তাহার ভয়। রাজীব ছুটিয়াছে তথ্য সংগ্রহ করিতে—সংবাদ দিবে থানায়, প্রতিবিধান করিতে হইবে। অথচ ছুটাছুটিই সার। ইংরেজ বড় ডাক্তার রিপোর্ট দাখিল করিল লোকটির প্লীহা বড় ছিল, শক্ত কিছুর সংঘর্ষে তাহা ফাটিয়া গিয়াছে। থানায় রিপোর্ট হইল—সাহেবের বাংলোর কাঠের সিঁড়ি হইতে পিছলাইয়া পড়িতে পড়িতে লোকটা গুরুতর কিছুতে চোট পাইয়াছিল। কুমুদিনী শোনে—তাহারও দুঃখ হয়। কিন্তু এত পাগলামি কেন রাজীবের? স্ত্রী, পুত্র আছে তাহার। রাজীব ব্যথিত হয়—কুমুদিনীও কি রাজীবকে বুঝে না—বুঝিবে না তবে?

চোখের উপর চা-কর বিল সাহেব সান্তকে চাবুক মারিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিল। তাহার স্ত্রী বুধিনীকে বাঁধিয়া লইয়া তাহাদেরই বাড়ির সম্মুখ দিয়া টমটম হাঁকাইয়া নিজেদের বাগানে চলিয়া গেল। রাজীব

রোগী দেখিতে গিয়াছিল—আসিতেই কুমুদিনী তাহাকে বলিল, ওগো, কি সর্বনাশ! মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেল।—কুমুদিনী তখনো স্থির থাকিতে পারিতেছে না—এমনিতর বিভীষিকাই ত তাহাকেও একদিন গ্রাস করিতেছিল।

রাজীব আশ্বস্ত বোধ করিল—কুমুদিনী নারীর অমর্যাদা সহিবে না।

কিন্তু মামলা তুলিবে কে? সন্তু ওঁরাও হাসপাতালে, ভালো হইলেই সে চলিয়া যাইবে আবার বাগানে—কে বাধা দিবে? তৎপূর্বে কে মামলা তুলিবে?

বার লাইব্রেরীর নূতন উকীলেরা বলিল, আমরা বারের পক্ষ হইতে মাললা আনিব। কিন্তু সরকারী উকিল নানাভাবে আপত্তি করিলেন। একে তিনি সরকারী উকিল, তাহার উপর চা-করদেরও তিনিই উকিল। যুবক উকিলেরা তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ফল পাইল না। "বার এই সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য না জানিয়া এই দায় গ্রহণ করিবে না"—ইহাই বারের সিদ্ধান্ত হইল।

কুমুদিনী বলিল, তুমিই মামলা আনো। তোমার উকিল বন্ধুরা ত আছেন, ভয় কি? কুমুদিনী বুঝিয়াছে—না হইলে রাজীব শান্তি পাইবে না। যাহা হয় হইবে, সে কর্তব্য করুক।

রাজীব কৃতজ্ঞ অন্তরে কুমুদিনীর দিকে চাহিয়া রহিল, মনে হইল এমন বন্ধু আর কেহ তাহার নাই।

বন্ধুদের লইয়া রাজীব তখনই উপায় নির্ধারণে লাগিবে, কিন্তু কুমুদিনী সঙ্গে সঙ্গে বলিল; দ্যাখো, কলকাতায় খবর দাও। কেউ আসুন, সব দেখে যান, গিয়ে আন্দোলন করুন।

রাজীব এই পরামর্শ গ্রহণ করিতে উৎসুক—ঠিকই বলিয়াছে কুমুদিনী।

খবর অবশ্য আগেও গিয়াছিল। আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে খ্যাত ও অখ্যাতনামা ব্যক্তি ইতিপূর্বেই কলিকাতার সংবাদপত্রে চা-

বাগানের দুর্নীতির রাজত্বের সংবাদ প্রেরণ করিতেছিল। অনেকেই তাহারা ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্পর্কিত। একটা কিছু করা দরকার, কলিকাতার নেতারাও তাহা বোধ করিতেছিলেন। স্থির হইল— কলিকাতার একজন ব্যারিস্টার এই মামলা উপলক্ষ করিয়া যাইবেন এখানে, তাহার সঙ্গে যাইবে ব্রাহ্ম সমাজের কর্মী কেহ।

রাজীব চৌধুরী নিজেই মামলা উপস্থিত করিবে। তাহার উকিল বন্ধুরা তাহার সহায় আছে সে জানে, না হইলেও সে ভয় করে না। কোন্ উকিল মোক্তার সহায় ছিল তাহার সেদিন, যেদিন শৈলকে লইয়া সে পদ্মা পাড়ি দিয়াছিল? কুমুদিনীকে লইয়া পাদ্রিদের সঙ্গে বিবাদে নামিয়াছিল? আজ বরং কুমুদিনী তাহার পার্শ্বে আছে—তাঁহার সহধর্মিণী। কুমুদিনীর মা প্রতিমুহূর্তে শোনান—তাহার পুত্র আছে, কন্যা আছে। আছেই ত; তাই বলিয়া রাজীব নিজেকে ভাগ্যবনে মনে করিবে না? মনে করিবে—পুত্রকন্যা আছে বলিয়া সত্য ও ন্যায় রক্ষায় সে অক্ষম? স্ত্রীলোকের মান, মনুষ্যত্বের অপমান সে সহিবে মুখ বুজিয়া? কুমুদিনীই কি তাহাকে পুরুষ বলিবে, না, তাহার পুত্রকন্যারা তাহাদের পিতার পরিচয়ে কোনোদিন গর্ববোধ করিবে?

আপনার সহজ বুদ্ধিতে কুমুদিনী বুঝিল মামলা চলিবে, ভুগিতেও হইবে অনেক। তাহা হইবে, উপায় কি? বাঙালের গোঁ চাপিয়াছে। এখন রাগের মাথায় কাণ্ডজ্ঞান না হারাইলেই হয়।

কুমুদিনী একান্তে প্রার্থনা করিতে বসে: কৃপাময়, তুমি ইহাকে সাহস দিয়াছ, কর্তব্যবোধ দিয়াছ; এখন সুমতি দাও, কাণ্ডজ্ঞানও দাও। ইনি যেন বিপদে না পড়েন, আমরা যেন বিপদে না পড়ি। আমার শিশুপুত্রদের মুখ চাহিয়া যেন উনি স্থির হন, সংযত হন।—আবার মাকে ও ছোট রাণীমাকে প্রকাশ্যে সে আশ্বস্ত করিতে চাহে। একবার সতেজে

বলেও, অত ভয়ই বা কি, রাণী মা? না হয় পারব না সাহেবদের সঙ্গে ঝগড়ায়। তাই বলে চেষ্টাও করব না?

তাহার আশা—একবার কলিকাতার ব্যারিষ্টার আসিয়া গেলে চা-করদের সমস্ত কুকীর্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

রাণীমা বলেন, তা'ত হবে। কিন্তু তোমাদের কি রাখতে পারব আমরা? কমিশনার সাহেব—মাষ্টার সাহেবকে ছাড়িয়ে দেবেন।

কুমুদিনীর মা মেয়েকে বলিলেন, চল, ভদ্রকালীর পূজা দিব।—তিনি জাগ্রত দেবতা।

কুমুদিনী ভয়ার্ত হয়, বলে, না মা, ওসব তুমি কিছু কোরো না।

কেন, আমি হিন্দুর মেয়ে, দেবদেবীর পূজা দেব না? দেবদেবী মানো না বলেই ত এমন বিপদে পড়ছ।

হয়ত তাহা ঠিক, কিন্তু কুমুদিনী কিছুতেই যাইবে না। ছেলেটার জ্বর হইতেছে; ছাড়ে না, কুমুদিনীর আশঙ্কা বাড়িয়া গিয়াছে। মনে মনে ভগবান্‌কে নানাভাবে ভাবিল, নিজেকে তাঁহার নিকট সঁপিয়া দিতে চাহিল, মিনতি করিল, না, ঠাকুর, তুমি আমাকে ওঁদের নিকট মিথ্যাচরণ করিতে বলিও না। না, না, না, তাহা বলিও না।

রাজীব বলিল, ভয় কি, এ চাকরি যায়, আমি ডাক্তারি করিব। আমাকে চাকরির ভয় দেখাবে? তুমি রাঁধতে জানো– আমি বাটনা বাটা, জল তোলা সব জানি। ভয় পাও কি কুমুদিনী?

কুমুদিনী উত্তর না দিয়া বলিল—তুমি একটু প্রার্থনা করো।

রাজীব প্রর্থনা করিতে বসিল: ন্যায়ের অধীশ্বর, তোমার রাজ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত সাহস আমাকে দিয়াছ। প্রণিপাত করি তোমাকে। এই সত্য হইতে তুমি আমাকে বঞ্চিত করিও না। স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে তুমি আমাকে দীক্ষা দিয়াছিলে, কৈশোরের প্রারম্ভে আমি তোমার তীব্র আহ্বান শুনিয়াছি—পরাধীনতার বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তা

বেইমানী, তোমার সহিতও তাহা বিশ্বাসঘাতকতা। যৌবনের প্রারম্ভে মানুষের মর্যাদা, স্ত্রী জাতির মর্যাদা, স্বজাতির মর্যাদা, অক্ষুণ্ণ রাখিবার শপথ আমি লইয়াছি—তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। অন্য আশ্রয় যেন আর চাই না, চাই না—চাই না।

রাজীব নিস্তব্ধ হইল।—সামান্য মানুষ দেবনন্দন ওঝা, হিন্দুস্থানী সিপাহী। দেশে তাহারও স্ত্রীপুত্র ছিল। কিন্তু সে আপনাকে বলি দিল — বিদেশী শাসকদিগকে রাজা বলিয়া মানিল না। ইহাই ত সত্যব্রত, নিজের মনে মনে রাজীব তাহা স্বীকার করে। সে ধ্যান করিতে লাগিল —হে সত্যস্বরূপ, তোমাকে যেন ঐরূপ বীর্যের সহিত, তেজের সহিত গ্রহণ করিতে পারি।

কুমুদিনী আপনার ভাবে আবার প্রার্থনা করিতে লাগিল: হে ব্রহ্ম, আমি জ্ঞানী নই, সাহসী নই, কর্মী নই, নির্বোধ সাধারণ স্ত্রীলোক। তুমিই আমাকে বাল্যে অকূলে আশ্রয় দিয়াছিলে। তোমারই কৃপায় পাইয়াছি তারপর এই স্বামী, সংসার, পুত্র কন্যা। তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে চাহ; তাহা হইলে সেই শক্তি তুমিই আমাকে দিয়ো। না হইলে আমি দুর্বল, পারিব কেন? কিন্তু আমার সংসার,—আমার স্বামী, আমার পুত্র কন্যা, ইহাদের তুমি দয়া করিয়া সুখে রাখিও— আমি এইটুকু চাহিব। না চাহিয়া পারিব না। আমি স্ত্রীলোক, বড় দুর্বল, প্রভু। বড় কিছু আমি চাহিনা, বড় কথা বুঝি না। শুধু চাহি আমার স্বামীর মঙ্গল হউক, ছেলেদের মঙ্গল হউক।

রাজীব চৌধুরীর চাকরি গেল না। কারণ সরকার স্থির করিল—সেই পদের প্রয়োজন নাই। কলিকাতায় যোগ্যতর শিক্ষকের নিকট এখন ছোট কুমারের পড়াশুনা প্রয়োজন।

জয়নারায়ণ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল, মাষ্টার মশায়, মাকে দিয়ে

দরখাস্ত দিয়েও লাভ হবে না। সাহেব উল্টো যা তা মায়ের সম্বন্ধে বলেন। আমার সম্পত্তি ওদের হাতে, আমার শিক্ষা ওদের হাতে, আমার মায়ের মান-অপমানও যেন ওদের খেলার জিনিস।

রাজীব চৌধুরী গম্ভীর ভাবে বলে, 'নিজ বাসভূমে পরবাসী তুমি'—সে তুমি জমিদারই হও, আর প্রজাই হও। পরাধীন দেশের সবাই দাস।

যাক্ চাকরি, রাজীব ডাক্তারি ব্যবসা করিবে।

জয়নারায়ণ বলিল, আপনি কলকাতা চলুন। ডাক্তারি করবেন। আমরা যা পারি দেখব।

তাই যাব। এখন এই ব্যাপারের শেষ দেখে নিই আগে। ততদিন কোনোক্রমে চলবে।

জয়নারায়ণ ভীতস্বরে বলিল, না, এখনই বরং কিছুদিন অন্যত্র যান। পরে না হয় আবার আসবেন। খোকার জ্বরও ত এখানে সারছে না।

আশঙ্কায় জয়নারায়ণ ভুল কথাটাই বলিয়া ফেলিল, চা-কর সাহেবরা আপনাকে খুন করতেও পারে।

খুন করবে রাজীব চৌধুরীকে!—হাসিয়া উঠিল রাজীব।—তুমিত শুনেছ, আমার আপন ভাই সে চেষ্টা করে পারে নি। আর এই সাহেব—বিদেশী, আমার জাতির শত্রু, দেশের শত্রু, মানুষের শত্রু, বিধাতার শত্রু—ওদের ভয়ে এ জায়গা ছাড়ব?

আগুন জ্বলিয়া উঠে রাজীবের চক্ষে।

কুমুদিনীও জানিত কথাটা রাজীব শুনিলে উল্টা ফল হইবে। জয়নারায়ণ কথাটা না বলিলেই ভাল করিত।—মঙ্গলময় ভগবান, এ তুমি কি করিতেছ? কুমুদিনীর মা রাণীমায়ের ব্যবস্থা মত গোপনে বাহির হইয়া গেলেন, ভদ্রকালীর মন্দিরে গিয়া নাতির মঙ্গলের জন্য পূজা দিবেন। নিজের বুকের রক্ত চিরিয়া তাহাও নিবেদন করিলেন—'মা কালী! তুমি জানো রাজীবের মতিগতি যাহাই হউক, সে সাধু পুরুষ। আমার মেয়ে,

তাহার স্বামী, তাহার পুত্র কন্যাদের তুমি রক্ষা করো—এই ধরো আমার বুকের রক্ত। ছেলেটাকে বাঁচাও।'

কিন্তু খোকা বাঁচিবে কি? সে কালাজ্বরে ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিল।

একটা নূতন পর্বের পর্বোদ্‌ঘাতই মাত্র রাজীব করিল। কলিকাতার ব্যারিষ্টার আসিবার পূর্বেই আসিয়া পড়িল কলিকাতার দুঃসাহসী বন্ধুরা। অন্ধকার যবনিকা আর অটুট থাকিতে পারে না। তাহা ক্ষণে ক্ষণে উড়িয়া যাইতে বসে, আবার ইংরেজ ডিপুটি কমিশনার তাহা সজোরে টানিয়া আঁটিয়া ধরে।

আসামের চা-বাগানের কুলী-জীবনের মর্মন্তুদ অত্যাচারের কথা তখন বাঙলা সংবাদ পত্রের পাতা হইতে বাঙালীর চেতনাকে স্পর্শ করে: 'চা, না, কুলীর রক্ত।' কোথা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতে ছোটে রাজীব চৌধুরী ও তাহার বন্ধুরা। বাগানে-বাগানে বাঙালী ছোট-ছোট ডাক্তার-কম্পাউডার আছে। রাজীবকে তাহারা চিকিৎসাসূত্রে জানে। তাহাদের সঙ্গে গিয়া তাহারা ঢোকে দূরের চা-বাগানে, বন্ধুরা ঘুরিয়া বেড়ায় এই বাগান হইতে সেই বাগানে। চা-করেরাও খবর শুনিল, নিশ্চেষ্ট রহিল না। হুকুম হয়—যেখানে পাইবে শেষ করো ওই বাঙালী ব্যাষ্টার্ডদের। তাহাদেরই একজন ভুল করিয়া সত্যই পিটিয়া মারিয়া ফেলিল একজন অপরিচিত বাঙালীকে। আর একটা কোলাহল বাধিল। বাঙলা সংবাদপত্রে ছড়াইয়া ইংরেজী সংবাদ পত্রে এবার চা-বাগানের অত্যাচারের কথা ইঙ্গিত করা হইল—"মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যে এমন অরাজকতা অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা কি বিশ্বাস্য?" উকিল ব্যারিষ্টার আসিয়া অবতীর্ণ হইল। চা-কর ও ডিপুটি কমিশনার ক্ষেপিয়া গেলেন তাহাদের আইনের কচ্‌কচিতে: ডাম্‌ ইট্‌। এম্পায়ারের আইন কি আমাদের জন্য, না, কুলীদের জন্য?

রাজীবের পক্ষে এ দৃশ্যে যবনিকা পাত হইতেছিল; চমকিয়া সে দেখিল তাহার পুত্র প্রায় মৃত্যুমুখে। চিকিৎসা হইয়াছে, কিন্তু রাজীব নিজের ঝোঁকে রোগ গুরুতর বলিয়া ভাবে নাই; আপনার ঝোঁকেই মাতিয়া রহিয়াছে। আর দেরী না, ছেলেকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতা লইয়া যাওয়া প্রয়োজন।

এদিকে উদ্দীপনায় সাধারণ মানুষ একবার সাহস পাইল। কোন্ চা-কর সাহেব খেলার মাঠে ছেলেদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেই ছেলেরা ছুটিয়া আসিয়া সাহেবের চাবুক কাড়িয়া এমন মার মারিল যে সত্যই তাহাকে হাসপাতালে শয্যাশায়ী হইতে হইল,—পরে সে দেশে ফিরিয়া গেল। অবশ্য তখনি পুলিশ আসিল শাসন করিতে।—ঘর দ্বার ভাঙিয়া, মারিয়া জোরজার করিয়া পাড়া প্রায় উৎখাত করিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ডিপুটি কমিশনার রাজীবকে নোটিস দিল—অবাঞ্ছিত লোক হিসাবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে জিলা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

ছেলের পীড়া, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ প্রভৃতি ভাবনা সত্ত্বেও কুমুদিনী যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল—কলিকাতায় রাজীব সত্যই প্রাণে মরিবেনা।

'নিজ বাসভূমে পরবাসী তুমি'—রাজীব চৌধুরী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে। এই দেশ আমাদের দেশ নয়, ইংরেজের "এম্পায়ার।" যতক্ষণ ইংরেজ রাজত্ব থাকিবে, ততক্ষণ চা-করদের হাত হইতে কুলীদের কেন, কাহারও নিস্তার নাই।

পুত্রের পীড়ার জন্য সে প্রস্তুত হইতেছিল; তাই কলিকাতার উদ্দেশ্যে রাজীব রওনা হইল। বন্ধু-বান্ধবের সহায়তায় অভাব হইবে না কলিকাতায়; খ্যাতি এবং সম্মানেরও অভাব হইবে না,—কিন্তু কি এখানে সে করিয়াছে? সেই চা-করদিগের ক্লাব তেমনি ঐশ্বর্যের ঔদ্ধত্যে উদ্দীপ্ত; ঘোড়া হাঁকাইয়া চা-কর সাহেবেরা তেমনি শহর কাঁপাইয়া আসে যায়; দোকানী-পশারী, উকিল-মোক্তার সকলেই

তাহাদেরই অনুগ্রহপ্রার্থী। দূরে দূরে অজস্র চা-বাগানে কি ঘটিতেছে, কি না ঘটিতেছে, এখনো কে তাহার খোঁজ রাখে? সেই অসহায় জঙ্গলী মানুষেরা—সাঁওতাল, ওড়াও, মানভূমিয়া, মালপাহড়িয়া,—কোথায় কে বাঁচিতেছে, মরিতেছে কে তাহা বলিবে? অত জানা কাহারও সম্ভব নয়, কেহ জানিতেও চাহে না।

'নিজ বাস ভূমে পরবাসী তুমি'—রাজীব গাড়ীতে বসিয়া দেখিতে দেখিতে বারেবারে আবৃত্তি করিতে থাকে।

কলিকাতায় নামিয়া রাজীব অবাক্।

রাণীমায়ের নির্দেশমত জয়নারায়ণ স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছে—মাষ্টার মহাশয়ের জন্য বাড়িঘর ভাড়া করিয়া তাহারা ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। বলিল, 'চলুন!'

রাজীবের চোখে প্রায় জল আসিল—বিধাতার অভিপ্রায় কে বুঝিবে?

১৫

বছর পাঁচেক পরে।

গিরীশ সরকারী কাজে কলিকাতা আসিয়াছিল। একাই আসিয়াছে, শৈল ছেলেমেয়েদের লইয়া বোম্বাইতে আছে। একা? তাহাতে আর অসুবিধা কি? শৈল বিদেশে অবকাশ লাভ করিয়া এখন যথেষ্ট সাহসী ও কর্মদক্ষ, রাজীব তাহাকে দেখিতে পাইলে বুঝিত।

গিরীশকে এতকাল পরে পাইয়া রাজীবও পরম আনন্দলাভ করিল। গিরীশ অবশ্য তাহার গৃহে উঠে নাই। সত্যই সে জানিত না যে, রাজীব নানা বিপদের শেষে চিকিৎসক ও ঔষধের ব্যবসায়ী হিসাবে আজ কলিকাতার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তাই কাজকর্মের সুবিধায় জন্য আপিসের একজন খ্রীষ্টান বন্ধুর গৃহেই গিরীশ অতিথি হইয়াছে। বাঙলার বাহিরে বাস করিয়া গিরীশ নিজ অভিপ্রায়ানুযায়ী একটু সাহেবি চাল-চলন, পোষাক-আশাক গ্রহণ করিয়াছে, তাহা রাজীব জানিত। রাজীব জানে—গিরীশের দৃষ্টিভঙ্গি বরাবরই স্বতন্ত্র, তাহার বা চিন্তাহরণদা'র মত নয়। কিন্তু তাহাতে কি? কুমুদিনীর সহিতও গিরীশ গল্প করে সানন্দে। বেশ গর্বের সহিত সে বলে, শৈল এখন চমৎকার ইংরেজি বলে। দেখ্‌লে বুঝতে, রাজীব। ছেলেরা? তারা পড়ছে সেণ্ট পল্‌সে ও কন্‌ভেণ্টে। তারা বাঙলা বলবে কি করে? তবে যথার্থ এডুকেশন হচ্ছে।

রাজীবের চা-করদিগের সঙ্গে সংঘর্ষের কথা গিরীশ জানে। হাসিয়া বলিল, না, তুমি চা খেতে দেবে না, তা বলো। কিন্তু চা কুলীর রক্ত নয় তাই বলে, রাজীব।

রাজীব ঠিক হাসিতে পারে না। বলে, তবে কি?

আমাদের দেশের একটা সম্পদ।—'গিরীশ মুখে মুখে হিসাব দেয়—কত টাকার চা ভারতবর্ষ রপ্তানী করে।

তারপর বলে : হিংসা করে কি হবে সাহেবদের? তারা শিক্ষায়, উদ্যোগে, পরিশ্রমে এই সম্পদ আবিষ্কার করেছে। আসাম ত ছিল জঙ্গল। ওরা কি করে এই পঞ্চাশ বৎসরে তাকে 'বাগানে' পরিণত করেছে, সেই কাহিনীটা জানো? বৎসরের পর বৎসর কতজনে প্রাণ দিয়েছে আসামের জঙ্গলে—কী সে উদ্যোগ!—তবে ত আজ গড়ে উঠেছে এই সম্পদ—চা-বাগান।

রাজীব আপত্তি করে, তা বলে অত্যাচার সইতে হবে?

অত্যাচার কারো সইতে নেই—জমিদারেরও না, চাকরেরও না। সে হল স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সইতে হবে তাদের প্রাধান্য যারা উদ্যোগী। তা না চাও, চা-বাগান নিজেরা খোলো—নিজেদের কর্মশক্তির ও সততার পরীক্ষা দাও, প্রতিযোগিতায় তাদের পরাস্ত করো।

দেশী লোকের চা-বাগান?—রাজীব তাহা ভাবিতেই সাহস করে না। এত টাকা কোথায়? টাকা যদি থাকে শাসকেরা তাহাদের সহায়তা করিবে কি? অবশ্য, সাধুতা, কর্মশক্তির কথাও মিথ্যা নয়।

গিরীশ স্মরণ করাইয়া দেয়—আমরা এই দেশে শুধু জন্মিয়াছি, দেশকে চিনি নাই। পতিত জমি পড়িয়াই ছিল, আবাদ করিয়া সোনা ফলাইল সাহেবরা। শুধু চা-বাগান কেন, দেশের সমস্ত সম্পদ, তাহার কয়লা, তাহার তুলা, তাহার পাট—কিছুই আমরা সার্থক করি না। এ দেশের বিজনেস্,—তাহার রেলপথ, তাহার জাহাজ—সবই গড়িয়া তুলিতেছে বিদেশীয়রা।

রাজীবেরও মনে পড়িল : 'দিনে দিনে আয়ুহীন. ভারত হতেছে ক্ষীণ,'...ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইঁদুরে করলে সারা।..."

শুনিয়া গিরীশ হাসিয়া উঠিল। বলিল, গুড্‌নেস্ গিরীশ, তুমি

সেই হিন্দুমেলার ঝোঁক এখনো কাটাতে পারনি। সুরেন বাঁড়ুজ্জের মত কংগ্রেসও কর নাকি? কি ছিল আমাদের বলো ত যে শ্বেত ইঁদুরে সারা করবে? কাজকর্মে নেটিব্ স্টেটে আমাকে যেতে হয়েছে। সে সব রাজ্য দেখলে বুঝতে—কি ছিল আমাদের অবস্থা, আর ইংরেজ আমাদের কি দিয়েছে।

রাজীব নিস্তব্ধ হইয়া যায়। এ কোন্ গিরীশের সঙ্গে সে কথা বলিতেছে? একটু পরেই গিরীশ বলিল, দেশের লোককে মানুষ করো ত আগে। এখনো ত তারা রয়েছে 'হিদেন'।

'হিদেন' তাহারা?—আর খ্রীষ্টান সেই চা-বাগানের সাহেবরা, সেই ডেপুটি কমিশনার, তাহাদের কলিকাতার ট্রেড্ এ্যাসোসিয়েশন, তাহাদের ভিক্টোরিয়ার ইংরেজ কর্মচারিবর্গ। রাজীব যেন কানে শুনিতে পায় দেবনন্দন ওঝার চীৎকার—বেইমান! বেইমান!

গম্ভীরভাবে রাজীব বলে, কি করতে হবে?

গিরীশ বুঝিল রাজীব রাগ করিয়াছে। সে বুঝাইয়া বলে, করতে হবে যা আমাদের ব্রাহ্ম এজুকেশন এসোসাসিয়েশন করছে তা'ই। ট্রুথ্যুব্যলিটি, পার্সোনাল লিবার্টি,—এগু ইংলিশ এজুকেশন" যাতে এসব 'ট্রু রিলিজ্যন' আয়ত্ত হবে। 'নট এজিটেশন'—যা তোমাদের সুরেন্দ্রনাথ বলেন,—'বাট এজুকেশন'·· এজুকেশন, এজুকেশন, এজুকেশন।

রাজীবের অন্তরের ক্ষোভ প্রশমিত হয়; বহুকালেরই আদর্শ তাহাদের—শিক্ষা। ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের খাত বাহিয়া যে জোয়ার এখন রাজনৈতিক খাতে বহিয়া আসিতেছে, ইংরেজ ত তাহায় পথ করিয়া দিবে না শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া! এই ব্যবস্থা তাহাদেরই করিতে হইবে! ইহাই কি একটা কম সংগ্রাম? সেই রামমোহন রায়ের আমল হইতে বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ,—তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের নেতারা, এই শিক্ষার আন্দোলন কি কম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে চালনা করিতেছেন? দেশকে

শিক্ষা দিতে চাহে কে ?—গবর্ণমেণ্ট নয়, দেশের মানুষই।...'এজুকেশন, এজুকেশন, এডুকেশন ;' কিন্তু এই সোয়া শত বৎসরের ইংরেজ শাসনে তাহা কলিকাতা ও জেলার সদর ছাড়াইয়া অন্যত্র বিশেষ বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। তাই না আজও দেশ যে তিমিরে সে তিমিরে।

রাজীব বাহির হইতে দেখিয়াই গিরীশকে বিচার করিতেছিল। সেই গিরীশ কি অন্য মানুষ হইতে পারে ? ধুতি পরিয়া খাইতে বসিয়া সেই গিরীশ সব বিস্মৃত হইয়া যায়। কুমুদিনী রাঁধিয়াছে চমৎকার ! 'যাই বলো, মাছ খেলে মনে হয় আবার বাঙলায় চলে আসি।'

রাজীব বলে, নন্দীগ্রামে ফিরে যাই, চিত্রিসারে গিয়ে বসি।—

হাসিয়া উঠে দুইজনায়।

অনেক বৎসর বিদেশে নানা শহরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়া চিন্তাহরণও দেশে ফিরিয়াছে। হয়ত এখন হইতে বাঙলাতেই থাকিতে হইবে।

চিন্তাহরণের আগমনে রাজীব আশ্বস্ত বোধ করে। রাজীব জানে—চিন্তাহরণ যেখানে গিয়াছে আপনার শান্ত সমাহিত চরিত্রগুণে অর্জন করিয়াছে খ্যাতি শ্রদ্ধা। সমাজেও আজ সকলে তাহাকে শ্রদ্ধা করে। বিশেষ করিয়া সে পাঞ্জাবের শিখ ও উত্তর ভারতের সন্তদের সাধনার বিষয়ে সযত্নে অধ্যয়ন করিয়াছে, নিজের জীবনেও সেই ভক্তি সাধনার শান্ত আদর্শ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সবশুদ্ধ তাহার মুখমণ্ডলে আজ যে শান্ত শ্রী, করুণ গাম্ভীর্য আসিয়াছে তাহাতে বুঝিতে দেরী হয় না, এ লোক জীবনে কিছু একটা গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। আরও সৌভাগ্য তাহার—বিদেশের স্বাধীন পরিবেশে ও স্বামীর এই সাহচর্যে মনোরমাও এখন আত্মনির্ভরশীলা—দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ; আর চিন্তাহরণের পুত্ররা তীক্ষ্ণধী, কথাবার্তায় বুদ্ধির দীপ্তিতে যেন শুধু চিন্তাহরণ নয়, যৌবনের গিরীশের অনুরূপ। মনোরমাকে

পাইয়া কুমুদিনীরও মনে মিলনের আনন্দ জাগিয়া উঠিল। মনোরমা ছোট সহোদরার মত তাঁহার চিরদিনের হিতৈষিণী।

রাজীব চিন্তাহরণ দাদার নিকট নানা কথা শুনিয়া উৎফুল্ল হইতে পারে। তাহাদের দিনের সেই প্রচণ্ড ভাবস্রোত দেশের কত দিকে কত ধারায় বহিতেছে! সিন্ধু-পাঞ্জাব হইতে আসামের প্রান্ত পর্যন্ত এই কয় বৎসরে সেই নূতন চিন্তার ধারা তাহারাই বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে,—স্কুল গড়িয়াছে, সংবাদপত্র স্থাপন করিয়াছে, দাতব্য প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করিয়াছে ;—দেশের মানুষকে জ্ঞান দিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে, দিয়াছে নূতন আশা। সেই জাগরণেরই সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়াছে ঐ সংযোগে সংঘাতে আরও নূতন আন্দোলন, যেমন, আর্য সমাজ।

বাঙলাদেশেও ব্রাহ্মদেরই প্রভাবে,—আবার তাহাদেরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদে,—সনাতন পন্থীদের মধ্যেও দেখা দিয়াছে নূতন মতবাদ, আত্ম-সংস্কারের নূতন সংকল্প। ভূদেবের প্রবন্ধ অবশ্য সনাতন সমাজের সমর্থন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তি দিয়া হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা করিতে সচেষ্ট, খ্রীস্টের স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করিয়া সাহেবদের মুখ বন্ধ করাই তাহার উদ্দেশ্য। তবে বঙ্কিমের চিন্তায় কাহাকেও বিশেষ প্রভাবান্বিত করে না। শশধর তর্কচূড়ামনির বৈজ্ঞানিক হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা আর্যসমাজের বেদব্যাখ্যার মতই একটা কারচুপি। চিন্তাহরণ বলে তাই বলে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ, নূতন সাধন-পদ্ধতি গ্রহণ,—তা একটা তুচ্ছ বা মিথ্যা ব্যাপার নয়। আমরা মানুষকে ধর্মের মাহাত্ম্য বুঝোতে চাই। কিন্তু শুধু যুক্তি তর্কে মানুষের ধর্ম-পিপাসা মিটে না ; সাধনা বাদ দিয়ে ধর্ম হয় না। আমরা মানুষের প্রাণ স্পর্শ করতে পারছি না।

চিন্তাহরণের কথায় একটা দুর্ভাবনা ও সকরুণ জিজ্ঞাসার সুর, চোখে একটা সুদূর দৃষ্টি।

রাজীব যেন আপনার মনের একটা অস্পষ্ট ভাবনার উত্তর শুনিতে

পাইল। তাহার আপত্তি সত্বেও কুমুদিনীর মা নারায়ণের ছবি ঘরে আনিয়াছেন, তাহা পূজা করেন, স্পষ্ট বলেন, 'না হলে সান্ত্বনা পাই না।' কিন্তু কেন? এই কি সত্য?—আমরা সাধনা হিসাবে ধর্ম গ্রহণ করি নাই বলিয়াই মানুষের ধর্ম-পিপাসা মিটাইতে পারে নাই?

চিন্তাহরণ আবার বলে, সাধন-শক্তির অভাবও হয়ত আছে। কিন্তু শুধু তাও নয়—আমরা এ দেশের সাধন-ধারার সঙ্গে যোগ রাখছি না। শিখ ধর্ম, কবীরপন্থীদেব সাধনা, সূফীবাদ, এসবও ত নিরাকার পরম তত্ত্বের সাধনা, অথচ দেশের মানুষের ও মাটির সঙ্গেও তার যোগ আছে।

চিন্তাহরণ তারপর ভাবিতে থাকে। বলে, দক্ষিণেরশ্বরের এক রামকৃষ্ণ ঠাকুরের কথা শুনেছিলাম; তুমি দেখেছ? দেখ নি কেন? সমাজের অনেকে ত তাঁর কাছে যান, আমিও গিয়েছিলাম। সত্যই ভক্ত মানুষ, সাধক। এ ধরণের সাধক পশ্চিমেও আমি দেখেছি। তাঁরা একটা কিছু পেয়েছেন—এবং পানও পুরাতন সাধনাধারা অনুসরণ করে,—বলতে পারেন, 'পেয়েছি।' ঠিক এই কথাটাই আমরা বুক ঠুকে বলতে পারি না—"পেয়েছি।" অথচ আমরা বুক ঠুকে বলতে পারি—তাঁদের পুরনো পদ্ধতিতে অনেক অবান্তর জিনিস আছে, আবর্জনা আছে, অনেক বিপদ-সঙ্কুল অলিগলি আছে;—সে সব আমরা বর্জন করেছি। এবং গ্রহণ করেছি তার মূল তত্ত্ব। কিন্তু সত্য পেয়েছি কি? তা বলা শক্ত। আর ধর্মের প্রশ্নে এই পাওয়া দিয়েই ত লোকে আমাদের বিচার করবে। তেনাহং কিং কুর্যাম্ যেনাহং নামৃতা স্যাম্।

তারপর চিন্তাহরণ আবার বলে, অবশ্য সে বিচারও তারা করবে পরে। আগে তারা বুঝতে চায়—আমরা যাই গ্রহণ করি, তাদের গ্রহণ করেছি, না, বর্জন করেছি। আমরা ব্রাহ্মসমাজ গড়ছি শহরে; গ্রামেও প্রচারে যাই—যেখানে অবস্থাপন্ন কেহ আমাদের সম্বল। কিন্তু

শহরের বাইরে আমরা কোথায়? সাধারণ মানুষের কাছে আমরা পর হয়ে আছি—জীবনের সঙ্গে যোগ রাখছি না।

সত্য কি? রাজীব তাহা বোঝে না—চা বাগানের কুলী হইতে সাধারণ রোগী, দুঃখী, কাহাকে তাহারা বিস্মৃত হইয়াছে?

কুমুদিনী ও মনোরমার অনেকদিন পরে দেখা হইতেই কুমুদিনী ধরিয়া বসে, তুমি এখানে থাকো দিদি; আর বাইরে যেয়ো না।

কিন্তু চিন্তাহরণ স্থির করিয়াছে—কলিকাতায় নয়, মফস্বলে কোনো ব্রাহ্মমন্দিরের ভার গ্রহণ করিয়া সে ধর্ম-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবে। কর্তব্য স্থির হইয়াছে বটে, মীমাংসা হয় নাই। তাহাকে বৃত্তিদান করা ইচ্ছা থাকিলেও এখনকার সমাজের পক্ষে সম্ভব নয়; যেখানে সে যাইবে, গ্রামের সেই সাধারণ মানুষেরও তাহা সামর্থ্যে কুলাইবে না।

মনোরমা এই ধারণা লইয়াই আসিয়াছিল—এবার তাহারা বাঙলা দেশেই থাকিবে! পাঞ্জাবে তাহাদের সম্মানের স্বাচ্ছল্যের অভাব ছিলনা। শিক্ষা-দীক্ষায়, চরিত্রবলে, দেশহিতৈষণায় বাঙালী দেশে নবযুগ আনয়ন করিতেছে। উত্তর ভারতে বড বড় শহরে ভালো উকিল বলিতে বাঙালী, ভালো ডাক্তার বলিতে বাঙালী, ভালো অধ্যাপক-শিক্ষক বলিতে বাঙালী,—আর রাজনৈতিক আন্দোলনে ত তাহারাই পথপ্রদর্শক। চিন্তাহরণকেও সম্মান না করে এমন লোক নাই; মনোরমাও সকলের নিকট সম্মান শ্রদ্ধা সমভাবে লাভ করিয়াছে। বড় লোক তাহারা নয়, কিন্তু অভাবও তেমন বোধ করে নাই; ছোট বড় সকলের অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধায় সমাদরে তাহা প্রায়ই ভুলিয়া যাইতে পারিয়াছে। মনোরমা দেখিত যে, তাহার শিক্ষাদীক্ষার খ্যাতিও সে শহরে কম নয়, মেয়েদের মধ্যে সেই জন্যও সে সমাদৃতা—তাহার কথা পদস্থ ঘরের পাঞ্জাবী মেয়েরাও শোনে। 'কর্ত্রী বউ' বরাবর দশজনকে লইয়া চলিতে জানিত, দশজনকে

স্বচ্ছন্দভাবে চালাইতেও জানিত। কাহাকেও তাড়না না দিয়া পরিচালনা করিবার কর্ত্রী-সুলভ সহজ গুণ তাই মনোরমার এই পরিবেশে আরও বিকাশলাভ করিয়াছে। তথাপি সে বাঙলায় ফিরিল। কারণ, দেশে চিন্তাহরণের ডাক পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, দেশে না ফিরিয়া কতদিন বাহিরে থাকা যায়? তাহার ছেলে দুইটি ও মেয়ে দুইটি কি একেবারে বাঙলা কথাও শিখিবে না? আর একটা কথাও মনোরমা মনে মনে জানিত—কলিকাতায় চিন্তাহরণের ও তাহার সমাদর কম হইবে না; সমাজের নাম তাহারা বিদেশে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু কলিকাতায় ফিরিতে মনে হইল,—তাইত, এ যেন কেমন হইল।

গুপ্ত মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী ইদানীং চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। মেজ ছেলে বিলাত হইতে বিশেষ কিছু করিয়া আসিতে পারে নাই, অনেকগুলি টাকা নষ্ট হইয়াছে। ছোট মেয়ের জন্য যে পাত্রটি স্থির ছিল, বিলাত হইতে ফিরিয়া বড় সরকারি চাকরি পাইতেই সে অন্যকে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে—দেখিতে সে গৌরাঙ্গী এবং টাকাও তাহাদের অনেক। মাসী মা বলেন, আমরা ত টাকা জমাতে পারি নি, খরচই করেছি। এখনো ত দেখ—সব তাতেই আমাকে দিতে হবে। কিন্তু কোথা থেকে দি বলো ত?

মনোরমা চমকিয়া উঠে—কলিকাতায় ফিরিতে এই অভাব বোধ মনোরমাকে ঘিরিয়া ধরিতেছে।

একটি ভালো ছেলের নাম মনোরমা শুনিয়াছিল। মেধাবী, তেজীয়ান ছেলে, নিজের বৃত্তির জোরে ডাক্তারী পাশ করিয়াছে, ইতিমধ্যেই তাহার পশার দেখা যাইতেছে; এবং কুমুদিনী বলিয়াছে, আনন্দ-দায়িনীকে সে বিবাহ করিতেও চায়।

মাসী মা বলিলেন, আমিও শুনেছি—কিন্তু দু'জামাই বিলাত ফেরৎ,

শুধু ওর বেলা অন্য রকম করি কি করে? ও আমার ছোট মেয়ে—ওরও মন উঠবে না না হলে।

মনোরমা বুঝিল এই যুক্তিটা সহজ যুক্তি নয়। বিলাত ফেরং বর না হইলে আনন্দদায়িনী ক্ষুণ্ণ হইবে—সে ডাবটনে পড়া মেয়ে।

প্রার্থনার শেষে বিদেশের অভ্যাসে সেদিন মনোরমা হঠাৎ ছেলে-মেয়েদিগকে লইয়া হাঁটিয়া গৃহে আসিতে গেল—অত গাড়ী ভাড়া কোথায় সে পাইবে? এইত হেদুয়া কাছেই। কিন্তু কিছুটা আসিতে না আসিতেই একখানা ফিটন আসিয়া তাহাকে ধরিল।

মিসেস্ গাঙুলী। মিসেস্ গাঙুলী।

মনোরমা দেখিল ব্যারিষ্টার মিষ্টার মহেশ দত্ত। পার্শ্বে সম্মোহিনী ও ছেলেরা। সম্মোহিনী বলিল, 'আসুন, মনোরমাদি!'

মহেশদত্ত গাড়ী থামাইয়া বলিল,—করছেন কি? কোথায় চলেছেন হেঁটে?

মনোরমা জানাইল বাড়ি ফিরিতেছে, এই ত কাছে হেদুয়া।

তা আমি জানি। উঠুন, গাড়ীতে উঠুন। বুঝতে পারছেন না—'হেঁটে গেলে কি হয়?' কি মনে করবে এই রাস্তার লোকগুলো—আপনি ব্রাহ্ম মহিলা—হেঁটে যাচ্ছেন পথে!

বটে! পাঞ্জাবে মনোরমা ত হাঁটিয়াই সব কাজ করিত।

পাঞ্জাব!—সে আবার একটা দেশ! বিনাইটেড্ প্রোভিন্স্।

বিলাতেই কি অন্যরূপ?

মহেশদত্ত গম্ভীর হয়।—সে তুলনা দেবেন না। সেখানে যা চলে এখানে তা চলে না। আপনি ব্রাহ্ম মহিলা—ব্রাহ্ম সমাজের একটা প্রেস্টিজ্ আছে, তা ভুলবেন না।

ভুলিবার পথ আর রহিল না। মনোরমা দুই দিনের মধ্যেই বুঝিল—গাড়ীর অভাবে সে বাড়ির বাহির হইতে পারিবে না। আরও ভয়ানক কথা

—সমাজের ভাণ্ডারে চাঁদা যাহারা বেশি দেয় তাহাদের মুখাপেক্ষী না হইলে প্রচারকদিগের চলেও না। চিন্তাহরণ সকলের বাড়ি দেখা করিতে যায়, সেই পদস্থরা কিন্তু কেহ তাহাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসে না। মনোরমাকে লইয়া তাহাদের আরও বিপদ হইল—তাহার কর্মশক্তি বিদেশে স্ফূর্ত হইয়াছে। সেই শক্তি লইয়া সে কিছু করিতে গেলেই দেখে কেহ তাহাকে বিশেষ আমোল দেয় না।

মনোরমার আশা ছিল, চিন্তাহরণকে সমাজ কর্তৃপক্ষ প্রচারক হিসাবে বিলাতে প্রেরণ করিবেন। এমন যোগ্য মানুষ পাইবেন কোথায়? রাজীবের নিকট মনোরমা কথাটা পড়িতেই রাজীব উৎসাহিত হইল। কিছু ঘুরাফিরি করিয়া সে জানাইল, এখন ত হইবে না, বউঠান। কর্তৃপক্ষ বলছেন অত টাকা কোথায়? দাদাও যেতে চান না। বলেন, 'আমাদের সাধনার ধারা এদেশের। ওদেশে গিয়ে কি হবে?'

মনোরমা ক্ষুন্ন হয়। তিনি ত 'বনে' যাবেন। কিন্তু কি করবেন মফস্বলে গিয়ে? অমৃতও নিরঞ্জন ক্রমে উঁচু ক্লাশে উঠছে, খুকীরও পড়াশুনা দরকার। এখন কলকাতার বাইরে গেলে চলবে কেন? ছেলেমেয়ে মানুষ না করলে 'সাধনা' হবে?

চিন্তাহরণ যাহা ভাবিয়াছে তাহা বলিল, আমি নিজে ওদের নিয়মিত পড়াব।

মনোরমার তাহাতে সম্পূর্ণ আস্থা আছে। কিন্তু তাহার ছেলেরা ক্লাসে ফার্স্ট হয়, মেয়েরাও সমাজের দশটি মেয়ের মত তাহাদের সঙ্গে বাড়িয়া উঠে, ইহা সে কামনা করে। দেখিয়া শুনিয়া সে বুঝিয়াছে, ইহা প্রয়োজন। বড়লোক হইতে সে চায় না, কিন্তু ছেলেরা সকলকে লেখাপড়ায় অন্তত হার মানাইবে, ইহা মনোরমা চাহিবে। তাহার মেয়েদিগকে সুপাত্রের উপযোগী শিক্ষাও দিতে হইবে, সমাজের উচ্চ স্তরের মেয়েদের পোষাক

পরিচ্ছদে, ইংরেজি বাঙ্‌লা বুকনিতে তাহারা যেন ম্রিয়মান হইয়া না পড়ে। উহারা তাহাদের জীবনের গৌরব, তাহার ভবিষ্যৎ আশা।

সমস্যা জানিয়া জয়নারায়ণ আসিয়া রাজীবকে ধরিয়াছিল,—গাঙ্গুলী মশায়কে আমাদের ওখানে সমাজে পাঠান। আমি ওঁর সমস্ত খরচ বহন করব।

সে এখন সাবালক। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ না করিলেও মনে মনে সে ব্রাহ্ম, বিশেষত রাজীবের অনুগত। চিন্তাহরণ তৈয়ারী হইতেছিল, কিন্তু কুমুদিনী ও কুমুদিনীর মা শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন,—এমন সর্বনাশের জায়গা আর নাই; সেখানেই কুমুদিনীর প্রথম সন্তানটিকে কালাজ্বরে ধরে, তাহাকে রক্ষা করা যায় নাই।

মনোরমা এইবার বাঁকিয়া দাঁড়াইল। চিন্তাহরণ দুঃখিত হইল। তাহার প্রয়োজন ছিল বাহিরের শান্ত পরিবেশ, মনোরমা তাহা বুঝিতে চাহিল না। চিন্তাহরণ আপাতত কলিকাতাতেই তাহা হইলে থাকিবে—তাহার অভিজ্ঞতা সমাজেরও এখানে প্রয়োজন। রাজীব চেষ্টা করিয়া সমাজের অনুরোধ সংগ্রহ করিল।

১৬

আমি বিভূতি—

রাজীব লাফাইয়া উঠে—বিভূতি! বৎসর পঁচিশের একটি সুগঠিত-দেহ যুবক, ছাঁটা গোঁফ দাড়িতে একটু অযত্ন দেখা দিয়াছে, চুলে একটু টাকের আভাস, বলিষ্ঠ মুখমণ্ডলের বড় বড় চোখ দুইটির তলে একটু কালো রেখা; জীবনের ঝড় তাহাকে সহিতে হইয়াছে, বুঝা যায়।

মাস খানেক পূর্বে অকস্মাৎ রাজীব এক পত্র পাইয়াছিল :—চিত্রিসারে মধ্যইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে—চৌধুরীদের পুরাতন দীঘির পাড়ে জমি উঁচু করিয়া আপাতত তাহা স্থাপন করা গ্রামবাসীর ইচ্ছা। রাজীব চৌধুরী গ্রামের সুসন্তান। তিনি শতখানেক টাকা সাহায্য করিবেন, ইহা গ্রামবাসীর প্রার্থনা। চিঠির নিম্নে স্বাক্ষর ছিল 'শ্রীবিভূতিশঙ্কর চৌধুরী।' অতঃপর আর একটু পুনশ্চও, 'আপনার মনে থাকিতে পারে—আমি চৌধুরী বাড়ির দেবপ্রসাদ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র বিভূতি।'

এত বৎসর পরে চিত্রসারের গ্রামবাসীর প্রার্থনা! এক মুহূর্তে চৌধুরী বাড়ি দেবপ্রসাদ চৌধুরী ও মহেশ্বরী, বিভূতি চৌধুরী প্রভৃতি সকলকার স্মৃতি রাজীব চৌধুরীর অন্তরলোকে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। নানালোকের নিকট রাজীব শুনিয়াছে—বিভূতি ইঞ্জিনীয়ারিং পড়িতে আসিয়াছিল, আপনার উচ্ছৃঙ্খলতা বশে বিতাড়িত হইয়া পশ্চিমে যায়। সেখানে ঠিকাদারী করিয়া অর্থার্জন করিয়াছিল, বাড়িতেও তাহা প্রেরণ করিত, কিন্তু সেখানকার সংসর্গে সে আর চিত্রিসারে ফিরে নাই—পশ্চিমের শিথিল জীবনযাত্রায় ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ এই পত্র

পাইয়া রাজীব চমকিত হইল। সেই বিভূতি তবে চিত্রসারে ফিরিয়াছে, এবং সে-ই অগ্রসর হইয়াছে গ্রামে বিদ্যাবিস্তার করিতে। রাজীব চৌধুরীর মনে এই কর্তব্যবোধ এতদিন জাগ্রত হয় নাই। অথচ সে 'চিত্রিসারের সুসন্তান', তাহার অর্থাভাব আজ নাই, কিন্তু চিত্রিসারের জন্য সে কিছু করিল না। মনে পড়িল—সেই চিত্রিসার,—এতদিনেও একটা মধ্য ইংরেজি স্কুল সেখানে স্থাপিত হয় নাই, একটা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বোধ হয় ইহারা ভাবেও না। অথচ কত দূরদেশে তাহার পুত্রসন্তান রাজীব চৌধুরী, তাহারই কন্যা শৈল গাঙুলী জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা জ্বালিয়া বেড়ায়!

রাজীব অর্থ প্রেরণ করিবে। জানাইল, প্রয়োজন মত আরও অর্থ সে প্রেরণ করিবে ; এবং প্রতিষ্ঠা উৎসবে সে একবার যোগদানও করিতে ব্যগ্র।—বিভূতিশঙ্কর কি তাহাতে আপত্তি করিবে ?

বিভূতির আমন্ত্রণে রাজীব চিত্রিসার চলিল। আজ প্রায় পনের বৎসর সে চিত্রিসার দেখে নাই—আর সেই বাড়িতে পদার্পণ করে নাই।

বিস্মৃত প্রায় অসংখ্য কথা রাজীব চৌধুরীকে অভিভূত করিতে চাহিল। এইত তাহাদের চৌধুরী বাড়ি!—শঙ্কর চৌধুরী-সনাতন চৌধুরীর ভদ্রাসন। একদিন তাহারও আকাঙ্ক্ষা ছিল সে এই বাড়ির জীর্ণ সংস্কার করিবে, তাহার মর্য্যাদা পুনরুদ্ধার করিবে। কিন্তু ঘটনা বিপর্যয়ে তাহার সাহয্যেও অভাবে সেই পুরাতন ঘর-বাড়ি শুধু জীর্ণ নয়, প্রায় বাসের অযোগ্য হইয়াছিল, বিভূতি চৌধুরী তাহা এখন সংস্কার করিতেছে। তথাপি সেই পুরাতন দুর্গামণ্ডপ পড়িয়া গিয়াছে, যেই নাটমন্দিরে পাঠশালা বসিত তাহা নাই। পূজায় প্রতিমা অনেকদিন আসে না, ঘটেই পূজা সমাপ্ত হয়। শঙ্কর দীঘির পাড় কাটিতে কাটিতে ক্রমেই ঢালু হইয়া আসিয়াছে। সনাতন চৌধুরীর নীলমাধবের মন্দির ও পঞ্চবটী

তলাও প্রায় পরিত্যক্ত। পুরাতন বাগানের পরিচিত বৃক্ষগুলিরও যেন আর তেমন সতেজ শ্যামলশ্রী নাই—বাগান জঙ্গল হইতেছিল, গাছ কাটিয়া বিক্রয় করিয়া চৌধুরীদের তখন জীবিকা সংস্থান করিতে হইয়াছে। খালের জলে স্রোত বাড়িতেছে—নদীর সেই চর ভাঙিতেছিল, আবার নূতন পড়িতেছে। গ্রামের অনেক মধ্যবিত্ত বাড়িতেই কর্তারা কেহ না কেহ অনুপস্থিত, বিদেশে চাকরিতে বাহির না হইলে আর খাইতে পরিতে পায় না। জমিয়া উঠিতেছে শুধু চিত্রিসারের বাজার—সেনেদেব তাহা সম্পত্তি। সেখানে এখন মহাজনী নৌকা আসে দূর হইতে, হিন্দুস্থানী মাঝিদের নৌকাও এখন দেখা যায়। পালেদের গদি এখন লক্ষ্মীর কৃপায় ঝক্-মক করিতেছে,—তাহারা ধান-চাউলের মজুতি ব্যবসা করিত, এখন পাট চালান দেয়, বাজারে গুদাম রহিয়াছে। নীলের চাষ উঠিয়া গিয়াছে এখন পাটের চাষ বাড়িতেছে—তাহাতেই চাষীদের মুনাফা বেশি। কিন্তু চাষীদের হাতে জমি কোথায়? বহুদিনে জমি ভাগ-বিভাগ করিয়া এখন যাহা অবস্থা তাহাতে দাসপাড়ায়, ঢালীপাড়ায় অনেকেরই চাষ হইতে গ্রাসাচ্ছাদন চলে না। প্রত্যেকেই অন্যবিধ কোনো না কোনো কাজ করে—কেহ নৌকা কেরায়া দেয়, কেহ মাছ ধরে, কেহ হাটে-বাজারে মাল তুলিয়া দেয়। দুই একজন শহরেও যায়—দুই এক মাস কাজকর্ম করিয়া আবার বাড়ি ফিরিয়া আসে। কাঁসারী ও কামার পাড়ার সকলেরই কাজকর্ম প্রায় যাইবার পথে—তাঁতী, ছুতার প্রভৃতি জাতিরা যেন আরও বিপর্যস্ত; বিলাত হইতে মাল আসে, বিলাতী জিনিসের ব্যবসায়ীরাই বাজারেও সম্পন্ন ব্যবসায়ী।

রাজীবকে ভিড় করিয়া দেখিতে আসে সকলে—এই সেই রাজীব চৌধুরী, কত বৎসর হইল সে পৈতা ছিঁড়িয়া ব্রাহ্ম হইয়া গিয়াছিল। তাহার পরও দুই একবার সে দেশে আসিয়াছে, তাহারা দেখিয়াছে।

কিন্তু সেই যে কলঙ্কটা ঘটিল—কেহই স্পষ্ট করিয়া তাহা উল্লেখ করে না,—তাহার পরে আর দেশে মুখ দেখায় নাই। এখন নাকি প্রকাণ্ড লোক, বহু তাহার উপার্জ্জন, বহু সম্মান, বহু সৌভাগ্যের অধিকারী। ইস্কুলে সেই একশত টাকা দিতেছে। আরও টাকা দান করিতেও চায়—গ্রামের লোক কাজ আরম্ভ করিলেই হয়। দেশের লোকের সঙ্গে সেইসব আলোচনাই করিতেই সে গ্রামে আসিয়াছে।

মধ্য ইংরেজি স্কুলের কথা প্রথম উঠিল। কি নাম হইবে স্কুলের?

রাজীব বলিল, আসুন মহাপুরুষের নামে আমাদের স্কুলের নামকরণ করি, 'রামমোহন স্কুল' ইহার নাম হউক।

রামমোহন? রামমোহন কে?—গ্রামের লোক পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

রাজীব বিস্মিত হয়। বলে, রামমোহন—রাজা রামমোহন রায়। আমাদের এ দেশের এ যুগের যুগপ্রবর্তক। বিদ্যায়, জ্ঞানে, তেজস্বিতায়, তাঁর মত মানুষ আর এ যুগে জন্মেনি। তিনিই প্রথম সত্য ধর্মের পথ প্রদর্শন করেন, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, জাতীয় স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন।

রাজীবের বক্তব্য শেষ না হইতেই কে বলিল: ওঃ! আপনাদের ব্রাহ্মদের পেগাম্বর।

মুহূর্তের মত রাজীব নিস্তব্ধ হইয়া গেল। বুঝিল আবহাওয়া প্রতিকূল, বিভূতি এইরূপ আশঙ্কার কথা পূর্বেই বলিয়াছিল। রাজীব বলিল, পয়গম্বর ব্রাহ্মদের কেউ নেই। কিন্তু রামমোহন ভারতবর্ষে আধুনিক-কালের যুগপ্রবর্তক।

আবার একজন বলিল, তা তিনি আমাদের কে?

রাজীব হতাশ হইতেছিল, তাই এবার একটু উত্তেজিত হইয়া পড়িল। —আমাদের কে? আমাদের সব। আমাদের গুরু, আমাদের পিতা,

আমাদের পথ-দ্রষ্টা।—রাজীব ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা শুনিয়াছে; বাগ্মী না হইলেও এইসব কথা তাহার মুখস্থ। সে বলিয়া চলিল—রামমোহন রায় কে।

কিন্তু কেহ কথা বলে না। একটু পরে মনে হইল শোনেও না। একটা গুন গুন শব্দ আবার শোনা যায়—আমরা তাঁর নামও শুনিনি গ্রামে।

তা'ই ত আমাদের দুর্ভাগ্য!

বিভূতি শঙ্কর তাড়াতাড়ি রাজীবকে বলিল: এখন এ কথা আর না বলে গ্রামের কারো নামে বালিকা স্কুলের নাম রাখতে বলুন। নইলে ওরা রাজী হবে না।

গ্রামের কারো নামে? রাজীব তাহাও ভাবিয়াছিল, তাই বলিল, গ্রামের কারো নামে যদি রাখতে আপনাদের মত হয়, তাহলে বালিকা বিদ্যালয়ের নাম আমার মায়ের নামে রাখুন না—হরিলক্ষ্মী।

কে একজন বলিল, আপনার মা—ভালো লোক ছিলেন, স্বর্গে গেছেন। কিন্তু তিনি ত মহাপুরুষ নন, আপনারা ছেলেরাও মহাপুরুষ নন—তবে তাহার নামে কেন হইবে?

লোকটি ঠোঁটকাটা। সেনেরা তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছে তাহাও সকলে জানে।

রাজীব আহত হইল। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া বলিল, মহাপুরুষ আমাদের গ্রামে কে জন্মেছেন? ধার্মিক সনাতন চৌধুরীর নামে নাম রাখবেন ছেলেদের ইস্কুলের?—সম্ভবত তিনি ছিলেন ভক্ত মানুষ। আর আছেন শঙ্কর চৌধুরী—তিনিই এ গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি সম্ভবত ছিলেম বীরপুরুষ। আমার মত যদি নেন—তবে বলব, দেবপ্রসাদ চৌধুরীর নামে ইস্কুলের নাম রাখুন। মহাপুরুষ না হোন, তিনি আজীবন এই গ্রামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান করেছেন, তিনিই

প্রথম ইংরেজি শিক্ষার জন্য এ গ্রামে উদ্যোগী হন, অশেষ কষ্টে নিজেও ইংরেজি শিখেন।

সকলে বুঝিল—এইটি বিভূতি চৌধুরীর কৌশল, নিজের পিতার নামে ইস্কুলের নাম করিতে চায়। কেহই উৎসাহ দেখাইল না।

কে একজন শেষে বলিল, কলিচিতার দারোগা বাবুর নামে নাম রাখলেই ঠিক হয়। আমাদের এদিকে এমন বড়লোক আর কে হয়েছে ?

লোকটি সরল, সরলভাবেই বলিয়াছে। কিন্তু একটু পরেই বুঝা গেল কলিচিতার সেনেরা চৌধুরীদের কাহারও নাম রাখিতে দিবে না। আসলে চিত্রিসারে স্কুল যাহাতে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারে তাহারই চেষ্টা সেনেরা করিতেছে। স্কুল যদি হয় হইবে কালচিতায়, হইবে সেনেদের চেষ্টায়, ইহাই তাহাদের মত। চৌধুরীরা কে—যে স্কুল স্থাপন করিতে চাহে এ অঞ্চলে ? তাও আবাব রাজীব চৌধুরী আসিয়া জুটিয়াছে—আপন পিসতুত বোনকে লইযা যে গৃহত্যাগ করিল। সে কথা ত না-জানা নাই কাহারও, তখন সে মেয়েটার বেসামাল অবস্থা। তারপর যাহা হয তাহা হইয়াছে। পীতাম্বর গাঙ্গুলীর ছেলে তাহাকে বিবাহ করিয়াছে। বাপে বিবাহ করিতেছিল, তাহা নয় ছেলে বিবাহ করিয়া বসিল বাপের বাগদত্তাকে। ব্রাহ্মদের আবার মা মাসী কি, বিবাহই বা কি ? উহা 'সাঙ্গা' মাত্র।

শুধু বালিকা বিদ্যালয় নয়, মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রস্তাবটাও রাজীবের আলোচনায় বানচাল হইতে বসিল। কলিকাতাতেই বিভূতি সসঙ্কোচে নানা আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছিল—অবশ্য এতটা সেও তখন বুঝিতে পারে নাই।—আপনি যা ভাবছেন তা হবে না। গ্রামের লোক আপনাদের নামও শোনে নি! তা ছাড়া, আপনারা হিন্দুদের নিজেদের শত্রু বলে মনে করলেন।

রাজীব বুঝাইতে চাহে, না, না, বিভূতি। হিন্দু কুসংস্কারেই আমরা আপত্তি করেছি।

কিন্তু নানা বিপর্যয়ে বিভূতিরও এখন কুসংস্কারের উপর তত রাগ নাই। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বরং একটু অনুরাগই জন্মিয়াছে।

বিভূতি চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিল, কুসংস্কার ত সকল ধর্মেই আছে। ধর্ম মানলে তার কুসংস্কারকে এত বড় করে দেখব না।

রাজীব তাহাকে বুঝাইতে লাগিয়া যায়—কুসংস্কার ধর্মের শত্রু! বিভূতি তর্ক করিল না, বলিল, কি জানি, আপনারা যেন চারদিকেই কেবল শত্রু দেখেন—

রাজীব তথাপি উৎসাহভরে দেশে আসিয়াছিল—রাজীব নিশ্চয়ই এইবার দেশকে ও দেশের প্রাণকে স্পর্শ করিবে। হতাশ বিরক্ত চিত্তে রাজীব আলোচনা স্থল হইতে বাহির হইয়া আসিল—কিছুই হইল না। ইহারা বালিকা-বিদ্যালয় এখনো চাহে না, কালচিতার সেনেরা মধ্য ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠায় বাধা দিল,—আর রামমোহনের নামও ইহারা জানে না। না, চিত্রিসারে সে না আসিলেই ভাল করিত। দূর হইতেই ভালো ছিল চিত্রিসার, দূরেই ভালো। ইহাদের নৈকট্য শুধু চিত্তকে তিক্ত করিবে, হতাশায় ভরিয়া দিবে, মনে ক্ষোভ জমাইয়া তুলিবে। কূপ-মণ্ডুকের মত ইহাদের জীবন-যাত্রা—অথচ আসাম হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ আজ নূতন চেতনায় জাগ্রত, জোয়ারে উদ্বেল।

আমার বাড়ি আইলা না, রাজীব কর্তা?—সম্মুখে দাঁড়াইয়া গহর ঢালী, রাজীবের বাল্যবন্ধু। তাহাদের পাড়ায় যাইবার কথা ছিল রাজীবের, রাজীব তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিল। শ্রান্ত মনে রাজীব উঠিল—চলো, গোরাই।

কালাচাঁদ নাই, মারা গিয়াছে গ্রামে এত তাড়াতাড়ি ইহারা মরে!

—আহারও নাই, চিকিৎসাও হয় না। রাজীবের বাল্য বন্ধুদের মধ্যে গোরাই অবশিষ্ট আছে। তাহারও বিশাল বলিষ্ঠদেহ হুইয়া পড়িতেছে। দাড়ি প্রায়ই পাকা, মাথার চুল উঠিয়া যাইতেছে—বাবড়িকাটা বলিয়াই এখনো টাক দেখা যায় না। চোখে একটু ক্লান্তি আসিয়াছে, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তাহা এখনো আনন্দে নাচিয়া উঠে—বিশেষত আগেকার দিনের কথা স্মরণ করিয়া। সেই গোল্লা ছুট, সেই ডাংগুলি খেলা, আর সেই গাঙে নৌকার বাওয়া, 'মনে পড়ে রাজু কর্তা?' তারপর—সেই যে তাহারা দুইজনে,—সে আর কালাচাঁদ, রাজীব আর শৈলকে নৌকায় পৌছাইয়া দিয়া আসিল ইলশাজারির ঘাটে? এখনো চিত্রিসারের কেহ জানে না—কি করিয়া শৈলী ঠাকুরাণী পালাইল। ভুলেও বলে নাই কালাচাঁদ, ভুলেও বলিবে না গোরাই ঢালী—রাজীবের বাল্য বন্ধু তাহারা।

বলিতে বলিতে বলে গোারাই, আমরা কিন্তু জানতাম—তুমি যে সেই গেলে, গেলে; আর আমাদের কথা মনেও রাখা না, রাজীব কর্তা। —হাস্যমিশ্রিত বিষাদের সুর গোরাইর কণ্ঠে।

রাজীব চমকিত হয়।—সে কি গোরাই, তোমাদের কথা আমি মনে রাখব না? আমার আর শৈলর যে তোমরা সব থেকে বড় উপকারী।

হঃ!—বিশ্বাস করে না গোরাই। হাসে।

বিশ্বাস কর, গোরাই।

গোরাই তখনো হাসে। বলে, বিশ্বাস ত করি।—এই নাওতে তোমরা পার হইয়া যাইবা, আমরা শুধু নাওয়ই বামু।

রাজীব চমকিত হয়। এই কি সমস্ত হতভাগ্যদের অভিযোগ—তোমার বিরুদ্ধে রাজীব? তোমাদের সকল শিক্ষিত ভাগ্যবানদের বিরুদ্ধে? তোমরা পার হইয়া যাইতেছ; কই আসিয়া ত কেহ বলিলে না কে রামমোহন রায়। রামমোহন ইহাদের নিকট পর রহিয়া গেলেন—

নিঃশ্বাস পতনের শব্দও শোনা গেল না। তেমনি চলিয়াছে গোরাই—চিরন্তন সত্য কথা লইয়া আর ভাবিতেছেও না। এইরূপই ত হয়; এইরূপই হইয়াছে। কে আর মনে রাখে ছোটদের কথা? না, পাতার মরমর নয়—রাজীব যেন সমস্ত চিত্রিসার গ্রামের দীর্ঘশ্বাস শুনিতে পাইতেছে। শুনিতে পাইতেছে চৌধুরীদের ভদ্রাসনের মৌন ক্রন্দন। শুনিতেছে সমস্ত দেশের বিলাপও। তাহারা যে তিমিরে, সে তিমিরে।

রাজীব তাহাদের কে?

মনে পড়িল দেবপ্রসাদের কথা—সে পৈতা ছিঁড়িয়া ব্রাহ্ম হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "সমাজ কুসংস্কারে আবদ্ধ, অধঃপতিত। তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেলে তুমি না হয় নিজে অগ্রসর হইবে, কিন্তু অন্যেরা ত সেইখানেই পড়িয়া থাকিবে।—রশি যে তুমি রথ হইতে খুলিয়া লইয়াছ, টানিবে কি? রশিটাকেই টানিবে—রথ নয়, সমাজ নয়।"

ইহাই কি সত্য? তা'ই কি ইহারা বলিল, 'রামমোহন রায় কে?' সত্যই ত, কে রামমোহন রায় ইহাদের কাছে? তুমি ত ইহাদিগকে তাঁহার সহিত পরিচিত করাইয়া দেও নাই। পরিচিত করিবে কি? তোমরা যে উল্‌টা নিজেদেরই ইহাদের নিকট হইতে পৃথক করিয়া নূতন পরিচয় সৃষ্টি করিয়াছ! কোথায় সেই এক ঈশ্বর, এক জাতি, এক রাষ্ট্র, আর স্বাধীনতার আদর্শ? কাহাকে লইয়া তোমাদের জাতি?—তোমার ও তোমার মুষ্টিমেয় বন্ধুদের লইয়া? কাহাকে লইয়া তোমার দেশ, রাজীব? শুধু কলিকাতার কয়জন বন্ধুকে লইয়া?

সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিতে লাগিল দুইজনা। সামনে অগ্রহায়ণের জলহীন একটা গর্ত, খানিকটা কাদা। পার হইতে রাজীব ইতস্তত করিতেছিল। হাসিয়া গোরাই বলিল, আইস, কোলে তুইল্যা পার কইর‍্যা দিই।

রাজীব বাধা দিতে গেলে শুনিল না; বলিল, আরে এই আর কি?

আমাদের কান্ধে চাইড়্যা তোমরা বাবুরা চিরদিনই পাব হইছ—খালবিল, সাপকোপ।

সহজ মানুষের মুখে সহজ কথা, সহজ হাসি মুখে।

রাজীব পরিষ্কার করিয়া ভাবিতে পারে না, তাহারা কি করিয়াছে ইহাদের জন্য। শুধু কাঁধে চড়িয়াই পার হইয়াছে, শুধু আপনাদেরই সুযোগ খুঁজিয়াছে। এই যে তাহারা 'সত্যব্রত' গ্রহণ করিয়া আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিল, এই যে তাহারা একেশ্বরের আরাধনায় আপনাদেব নিয়োজিত করিল—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, স্ত্রী স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা, এই সমস্ত মহৎ সাধনায় উন্মাদের মত কত কি করিল—এই তাহার শৈশবের বন্ধু—দেশের অশিক্ষিত কোটি কোটি সাধারণ মানুষের নিকট কি মূল্য সেই সবের?

আবার রাজীব ভাবে,—মূল্য কিছু আছে, নিশ্চয়ই আছে। অনেক তাহারা করিয়াছে—কিন্তু তাহাদের কাজ আরও অনেক—অনেক বড তাহাদের কর্তব্য, অনেক বড় ভবিষ্যৎ। কিন্তু কোথায় একটা গরমিলও রহিয়া যাইতেছে এই কাজের হিসাবে। এত ত্যাগ, এত কর্ম, এত দুর্জয় প্রতিজ্ঞা,—ভাবগঙ্গার এমন আলোড়ন,—ইহা মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়, রাজীব নিজেকে বুঝায়। কিন্তু তবু তাহাতে কোথায় গরমিলও ঘটিতেছে। তাহাও ভুলিতে পারে না।

তোমরা পার হইয়া যাও—তোমরা ইহাদেরই বুকের উপর দিয়া পার হইয়া যাও—তোমাদের ধনের, জ্ঞানের, মহৎ সাধনার লক্ষ্যে,—সাথী করিয়া লও না দেশের মানুষকে, পর করিয়া দাও তোমাদের চিরজন্মের আত্মীয়দের। মানুষকে পরই করিতেছ—তাই পরই হইতেছ।....

মহেশ্বরীর কথায়ও রাজীব এই অব্যক্ত সাক্ষ্যই শুনিতে পায় আর এক সুরে। আপনার কনিষ্ঠ পুত্রকে দেখাইয়া তিনি বলেন তোমার

দেওয়া নামই ত রয়েছে ওর—জ্ঞান। তোমাকে ত দেখেনি জ্ঞান, শুনেছে তুমিই দিয়েছ তার নাম। নাম দিলে হবে কি, নাম ত সার্থক করতে পারে না। ইস্কুল নেই কাছে পিঠে। সেই মধ্যমগ্রামে ইস্কুল—যাওয়া সহজ নয়। নৌকায় কেউ না নিলে যেতে পারে না—।

রাজীবের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে সেই তরুণ কিশোর—এই রাজীব চৌধুরী! দেবপ্রসাদ চৌধুরীর ভ্রাতুষ্পুত্র তিনি—তিনিও শঙ্কর চৌধুরী বংশধর। অভিযোগ নাই, বিস্ময় শুধু সেই বালক দৃষ্টিতে—এই সেই আজন্ম শ্রুত কীর্তিমান পুরুষ রাজীব চৌধুরী!

এই গ্রামে ইস্কুলে পড়িবার সুযোগ নাই তাহারও—যাহার নাম রাজীবই রাখিয়াছিল "জ্ঞান।" রাজীব চৌধুরীর সম্মুখে যেন দেবপ্রসাদ চৌধুরী নীরব দুটি চক্ষু ভাসিতেছে—অভিযোগহীন চক্ষু।

মহেশ্বরী কিন্তু বলিতেছিলেন, কতকাল দেখিনি তোমাদের। যা করেছি আমরা তোমার সঙ্গে, তারপরে ত আর তোমাকে দোষ দিই না। তুমি আর আমাদের আপনার বল্‌বে কেন?

রাজীব তাহাদিগকে আপনার করে নাই, আপনার করে নাই তাহাদিগের নিকট তাই রামমোহনকেও; তাহারা যে তিমিরে সে তিমিরে! সেই বা কোথায় তবে? কোন্ আলোকপ্রাপ্ত স্বর্গ শিখরে? পর হইয়া গিয়াছে, পর করিয়া দিয়াছে সকলকে।

তথাপি রাত জাগিয়া রাজীবের জন্য চিরাকুটা ও নাড়ু তৈয়ারী করিয়াছেন সেই ছোট মা মহেশ্বরী ও বউঠান অনন্তের স্ত্রী।

তোমাকে খাওয়াবার মত কিছুই ত নাই গ্রামে—আমের দিনও নয়,—আছে শুধু এই চিঁড়ে মুড়ি, নাড়ু, মোয়া আমসত্ব!

কোথা দিয়া রাজীবের মন স্নেহাভিষিক্ত হইয়া উঠে। শুধু কুসংস্কারই তেমনি নাই, সেই প্রাণগুলিও তেমনি রহিয়াছে—স্নেহে মমতায় তাহারা

তেমনি অকুণ্ঠিত। কিন্তু তুমি কোথায়, রাজীব ? তোমার প্রাণে ইহাদের স্থান কোথায় ?

রাজীব কলিকাতায় ফিরিয়াও নিজের সংশয় হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না। তাহারা রথের রশিটাই টানিতেছে, কিন্তু জাতির জীবন-রথ হইতে সে রশি যে কাটিয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়াও দেখিতে চাহে না। তাহারা ধর্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার ও জাতীয় মুক্তির মন্ত্র লইয়া ভারতের দিকে দিকে ছুটিয়াছে, শহরে শহরে আজ তাহাদের প্রতিষ্ঠিত কত কীর্তি, কিন্তু তাহারা দেশের সাধারণ মানুষের দিকে ফিরিয়াও তাকাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কোথায় বা তবে তাহাদের ব্রাহ্মদের 'ভারতবর্ষীয়' সমাজ, আর কোথায় বা তাহাদের 'সাধারণ' সমাজ ?

নিজের চারিদিকে রাজীব তাকায়। কাহারা আজ তাহাদের সমাজের প্রধান ? দুর্দমণীয় দুই চারিজন তেজস্বী পুরুষের ও উদারপ্রাণ ভাগ্যবান মানুষের নাম করিয়া লাভ নাই। কোচবিহার ও ময়ূরভঞ্জের রাজদাক্ষিণ্য যাহারা অবজ্ঞা করিয়াছে তাহারাও সমাজে, ধর্মে, জীবনে কত জন পারিয়াছে 'সাধারণের' প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে ?—সমাজের অর্থভাণ্ডারের জন্য বড় চাকুরের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকেন তাহার ত্যাগী কর্মীরা, প্রচারক-গোষ্ঠী। তাই একপাশে সরিয়া ধ্যান ধারণায় নিমগ্ন হইতে চাহেন চিন্তাহরণ,—মনোরমা ক্রমশই দেখে তাহার ছেলেরা মেয়েরা দৈন্য-সচেতন হইয়া উঠিতেছে। পোষাক পরিচ্ছদ কেন, বইপত্রও তাহারা কিনিতে পারে না। প্রচারকের ত্যাগ ব্রত যদি বা অন্যদের নিকট গ্রাহ্য, মনোরমার 'কর্ত্রীত্ব' কেহ সহিবে না, কোথাও তাহা খাটে না। সকলের মাথার উপরে সভ্যতার ফ্যাশানের আদর্শ হিসাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে নূতন বিলাত-

ফেরতারা। স্ত্রী, পুত্রকন্যাদের দলেও তাহাদেরই প্রাধান্য যাহারা এই অর্থভাগ্যে, বিলাতীনামের ভাগ্যে দেশে-সমাজে প্রধান! চিন্তাহরণ মনোরমাও সেখানে খর্বিত, সাধারণ সমাজে সাধারণেরা তবে কোথায়?

আরও পাঁচ বৎসর পর।

বিভূতিশঙ্কর রাজীবের সহিত কলিকাতায় দেখা করিতে আসিয়াছে। কাশী হইতে চিত্রিসার ফিরিতেছে। তাহার সঙ্গে তাহার মা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানশঙ্করও আছে। কাশীতেই তাহারা বিভূতির নিকট এই কয় বৎসর ছিল; জ্ঞানের লেখাপড়া দেশে চলিত না; মহেশ্বরীও তাহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতেন না। কয় বৎসর পরে আবার তাহারা দেশে ফিরিতেছে। বিভূতি বিবাহে স্বীকৃত হইয়াছে, মহেশ্বরী, দেশে গিয়া পাত্রী স্থির করিবেন।

রাজীব ব্যস্ত হইয়া উঠিল, খুড়ীমা আছেন, তোমার ছোট ভাই: জ্ঞানও আছে। কোথায় তাহারা? কালীঘাটে কোথায় উঠ্‌লে?

প্রথম প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্য আসিয়াছে এইবার রাজীব চৌধুরীর জলন্ত চক্ষুতে। একটা মমতার আলোক সেখানে—শ্মশ্রু গুম্ফে এখানে ওখানে শুক্ল রেখা।

বিভূতি জানায় কালীঘাটে, তাঁহাদের পুরোহিত বংশীয় একজনার গৃহে তাহারা আছে।

রাজীব দুঃখিত হইল, আমার এখানে এলে না কেন? জাত যেত না, দেখ্‌তে। শাশুড়ী মহাশয়ার ত কথাই নেই—তিনি তাঁর ঘরে ঠাকুরের ভোগ দিয়ে তবে খান। তোমার বউঠানেরও বামুন না হলে চলে না—অন্য জাত বড় অপরিষ্কার, তাদের হাতে খেতে ওঁর রুচি হয় না।

—হাসিতে লাগিল রাজীব চৌধুরী। বলি, না হয়—ছোট খুড়ীমা নিজে রেঁধে খেতেন—ব্যবস্থা করে দিতাম। আমরাও একটু তাঁর হাতের নিরামিষ রান্না খেতাম। সেই 'মরিচের ঝোল', সেই সব আর এখানে পাই কই বলো?

রাজীবের পীড়াপীড়িতে একদিন তাহার গৃহে সকলে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিল—মহেশ্বরী ফলমূল খাইবেন, অন্যদের জন্য ব্রাহ্মণের যথাবিহিত রন্ধন। তাহা ছাড়া, এখন চিন্তাহরণ মনোরমা এখানে, গিরীশ শৈল এখানে; তাহাদের সঙ্গে একবার দেখা করিবে না বিভূতিশঙ্কর ও ছোট খুড়ী মা?

কুমুদিনী সমস্ত দিনই ব্যস্ত। রন্ধনগৃহে সে ইচ্ছা করিয়াই আজ পদার্পণ করে নাই—যদি বিভূতি শঙ্করদের আপত্তি হয়। তথাপি রন্ধনের নানা ব্যাপারে সে নিযুক্ত। শৈল ও গিরীশের জন্যও ভাবনা তাহার কম নয়; অন্যদিকে ইহারা হিন্দুঘরের আত্মীয়। এক সঙ্গে ইহাদের খাপ-খাওয়ানো সহজ নয়। রাজীব গিরীশের পুরাতন বন্ধু, কিন্তু শৈল ত আর গুপ্ত মহাশয়দের আশ্রিতা সেই প্রথম শিক্ষার্থিনী গ্রামের মেয়েটি নাই। তাহার ছেলেকে বিলাতে রাখিতে সে গিরীশের সঙ্গে বিলাতে গিয়াছিল, মেয়েরা দুই জনে ডবটনে পড়ে, গৃহে বাবুর্চি খানসামা, নিজেও শৈল বিলিতি খানাই পসন্দ করে। রাজীব বুঝিলেও এই সব মানিবে না। সে ভাবিতে চাহে—যত বড় হউক শৈল, 'শৈলী' ছাড়া সে আবার কি থাকিবে?—গিরীশ না হয় চিরদিনই উন্নতিকামী পুরুষ।

নিজের উদ্যোগে, নিজের কর্মশক্তিতে আজ গিরীশ চাকরি জীবনের শিখরে উঠিয়াছে—যোগ্যতা থাকিলে ইংরেজ কি তাহার সমাদর না করিয়া পারে? তাহার এই ধারণা মিথ্যা হয় নাই। সে নিজেই তাহার বক্তব্যের প্রমাণ। শৈলও বোম্বাই সিমলায় থাকিয়া বুদ্ধিতে, প্রখরতায় দিনের পর দিন তাহার যোগ্য সহধর্মিণী, হইয়া উঠিয়াছে—আলাপ আলোচনায়, সুশিক্ষিতা বাঙালিনী গৃহকর্ত্রী হিসাবে সে পার্শী মহারাষ্ট্রীয়া সকলের বিস্ময়; ইংরেজ-পত্নীদের দ্বারাও মিসেস গাঙুলী অস্বীকৃতা নন। যোগ্যতা থাকিলে কেহ তাহা অস্বীকার করিতে পারে না—শৈলও জানে সে তাহার প্রমাণ।

কুমুদিনী শান্ত মানুষ, তাই স্বস্তি বোধ করে না!

মহেশ্বরী সভয়ে বলেন, শৈলীও বিলাত গিয়াছিল?

তিনি বলিলেন না, কিন্তু কুমুদিনী বুঝিল—কোন আশঙ্কা মহেশ্বরীর মনে—শৈলীও তাহা হইলে সেখানে অখাদ্য খাইয়াছে। আশঙ্কা যে অমূলক নয়, কুমুদিনী তাহা জানে। শৈল নিজেই কুমুদিনীকে সগর্বে বলে, ওসব না খেলে ও দেশের মানুষের এত শক্তি হত দেহে? তবে গুড্ চিকেন্ কিন্তু খেতে অনেক ভালো। এদেশে তা স্মার্ট করে বেশী। আমি অন্ততঃ এদেশে চিকেন্ই পসন্দ করি।

বিভূতিশঙ্করকে পরিহাস করিয়া কুমুদিনী এখন বলিলেন, তোমাদের চৌধুরী গোষ্ঠীর ভাগ্নী ত; বলে, 'চিকেন্ না খেলে হেল্‌থ্ থাকে না।'

বিভূতিশঙ্করও হাসিয়া বলে, সত্য কথা, চিকেন্ই যদি না খান্ তবে ব্রাহ্ম হবেন কেন?

তাই নাকি? বলো তোমার দাদাভাইকে। ওগো, শোনো শোনো। তোমার হিন্দু ভাই বল্‌ছে কি শোনো—তুমি ত খোকাকে কিছুতেই বাড়িতে মুর্গী খেতে দিলে না, নিজে ত খেলেই না জীবনে।

রাজীব শুনিয়া হাসিতে লাগিল।—তোদের ধারণা বুঝি—ব্রাহ্ম হলেই মুর্গী খাবে?

বিভূতি শঙ্কর সরল হইলেও স্বচ্ছন্দ। বলিল, শুধু তা'ই? আমরা বলি মুর্গী খেতেই ব্রাহ্ম হয়।

রাজীব হাসিতেছিল, কিন্তু একটু ব্যথিত হইল—যে না খায়? আস্‌বেন ত চিন্তাহরণদা' একটু পরেই, দেখবে কি খান্ তিনি। মাছ-মাংস কিছু খান না সেই দীক্ষা গ্রহণের দিন থেকে।

বালক জ্ঞান ও বৃদ্ধা মহেশ্বরী একই কালে চমৎকৃত হইল। বিভূতি শঙ্করও একটু বিস্মিত হইল। পরিহাস ছাড়িয়া সে বলিল: হিন্দুরা বলবে তাহলে উনি ব্রাহ্মই নন, বোষ্টম।

রাজীব হাসে,—ব্রাহ্ম তবে কারা ?

হিন্দুদের কথা শুন্‌বেন ? আমার বন্ধু যাদব ব্রাহ্ম হতে গেল—যাদব সেন, চিনেন ত ? এখন উকিল। ওর বাবা বল্‌লেন, 'মুর্গী খেতে চাস, তা বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। গুরু পুরোহিতকে দক্ষিণা দিতে না চাস, তোকে দিতে হবে না। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিবি না ? তা আমি দেখব। জ্ঞাতি আত্মীয়দের দায়িত্ব এড়াতে চাস্,—তা তোর উপর কেউ চেপে বস্‌বে না। বল্ তবে ব্রাহ্ম হবি কেন ?"

রাজীবের মুখের হাসি ম্লান হইয়া যাইতেছিল—সে রাজীব আত্মীয় কুটুম্বের দায়িত্ব এড়াইতে চাহিয়াছে কি ?—রাঘবের দায়িত্ব, অনন্তের দায়িত্ব কি সে পালন করে নাই ? তথাপি এই তাহাদের সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের ধারণা। এত মিথ্যা, কদর্য প্রচার তাহাদের বিরুদ্ধে চলে, আর তাহা বিশ্বাসও করে লোকে ?

রাজীব তথাপি হাসিয়া বলিল, তাঁরা বুড়োরা যা বলে বলুন। তোমরা যুবকেরা কি বলো—শুনি।

এবার বিভূতি শঙ্কর বলিল, আমরা ? আমরা যা পারি তাই বলি। যাদব যখন এখানে ব্রাহ্ম সমাজে ঘোরাফিরি করত আমি বল্‌তাম রামমোহন রায়ের পৌত্রের মতই, 'তুই ত্রিশ কোটি কেটেও শেষে একটায় গিয়ে ঠেকলি। আমি সেই একটাকেও নাকচ করছি।'

রাজীব বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত বলিল, তার অর্থ ?

বিভূতি বলিল, আমি তখন পজিটিবিষ্ট। আমাদের বন্ধু দেবেন্দ্র ছিল একজন সাহিত্যামোদী। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' নিয়ে সে মত্ত, সে 'অনুশীলন' নিয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে আমরাও শুন্‌লাম মিল বেন্থাম, কোঁৎএর নাম। জুটে গেল আমাদেরও গুরু, হাইকোর্টের জজ, উকিল, প্রোফেসর। তারপরে নানা থানে ঘুরেছি, কাশীতেও সাধু সন্ত দেখলাম। বুঝেছি—ভগবান্ থাক্‌তেও

পারেন। তবে থাক্‌লে মন্দিরে, মসজিদে, চার্চে, সবখানেই থাক্‌বেন। তাঁর ম্যানেজিং এ্যাজেন্সি লাগে না; ভাইস্‌রয় নেই, সিবিল সার্বিসেও তাঁর কাজ নেই।

রাজীব একবার মনে মনে ভাবিল 'যত মত তত পথ', এই সেই কথাই। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের নিকট ইহাই শুনিয়াছে চিন্তাহরণও, কেশবচন্দ্র উহা লইয়া মাতিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু রাজীব তাহা মানিতে চাহে না। সে যে জানিয়াছে 'এক ঈশ্বর, এক জাতি, এক দেশ'—ইহাই সত্যকারের সাধনা। কিন্তু কথাটা লোককে পাইয়া বসিতেছে—'যত মত তত পথ'। এখন নানাভাবে হিন্দুভাব দেশে বাড়িতেছে। সেই যাদব সেন ও তাহার আরও দুই একটু ব্রাহ্মভাবাপন্ন বুদ্ধিমান যুবক ওই রামকৃষ্ণ ঠাকুরেব পাল্লায় পড়িয়া ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া দিল। স্বয়ং চিন্তাহরণ পর্যন্ত সেদিকে ঝুঁকিয়াছিল—অত 'কালী কালী' না করিলে হয়ত জুটিয়া যাইত—এখন চাহে দূরে কোথাও গিয়া নিভৃতে সাধনা করিতে।

চিন্তাহরণ মনোরমা পূর্বেই আসিয়াছিল, গিরীশ-শৈলও আসিয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘর যেন ঔজ্জ্বল্যে ভরিয়া গেল। চিন্তাহরণের সম্মুখে শৈল একটু সংকোচ বোধ করে, তিনি ভাসুর। কিন্তু তাহা যে একটা সংস্কার মাত্র তাহা শৈল জানে। তথাপি মাথার কাপড় বেশ একটু টানিয়া দিল, কথায়ও একটু সংযম রক্ষা করিল, একটু দূরত্বও রক্ষা করিল চলাফেরায়, আসনে, আলাপে। শুধু ভাসুর বলিয়া নয়, চিন্তাহরণ প্রচারক মানুষ, বড় বেশি স্থির প্রকৃতির, শ্মশ্রুগুম্ফ বিমণ্ডিত মুখ প্রসন্ন হইলেও বেশ গম্ভীর। মহেশ্বরী শৈলকে দেখিতে, তাহার কথা শুনিতে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু শৈল কোনরূপে সে পরিচয় শেষ করে,—মহেশ্বরীর প্রশ্নে সে অসচ্ছন্দ হইয়া উঠে—মনে পড়ে সেই চৌধুরী বাড়ির স্মৃতি—সেই বঞ্চনা, সেই লাঞ্ছনা, সেই অমানুষিক পরিশ্রম,—বাড়ির সমস্ত কঠিন

কাজই 'শৈলীর',—আর গলগ্রহের উপর অভাবগ্রস্ত চৌধুরীদের সেই সেই দৌরাত্ম্য। না, শৈল মহেশ্বরীর কথাও প্রশ্ন শুনিতে চাহে না। কোনরূপে জ্ঞানকে দেখিয়া বলে: তোমাকে দেখেছি নাকি আগে? দেখেছি?

মহেশ্বরী শান্তভাবে কহিল, কত কোলে করে বেড়িয়েছ। সেই তুমি রাঁধছিলে, যখন কই মাছ দিয়ে গেল কালাচাঁদ সেদিন—ওছিল তোমার কাছে—

তাই? আমার কিছু মনে নেই ওসব কথা।

শৈলর কিছুই মনে নাই। মহেশ্বরীও তাহাকে দেখিয়া তাহা বিশ্বাস করে—এই শৈল যে সেই শৈলীই নয়। মনে থাকিবে কিরূপে? সৌন্দর্য্যে, সৌভাগ্যে, কথার ছটায় এযে এক পরম ঐশ্বর্য্যময়ী, প্রায় অপরিচিতা নারী।

মহেশ্বরী বিশ্বাসই করিতে পারে না এই সেই শৈলী। আ', আজ যদি শৈলীর মা দেখিতেন শৈলীকে। মহেশ্বরী বলিতে থাকেন, বিভূ কলকাতা পড়তে গেলে সে কি আগ্রহ তাঁর। বিভূ কি তোমাকে কলকাতায় দেখেছে কোথাও? একটা কথাও কি কিছু লিখেছে শৈলীর সম্বন্ধে? তখন ত তাঁর মৃত্যুশয্যা—সেই তোমরা চলে গেলে আর তিনি ঘরের বাইরে আস্‌তে চাননি। তবু আমাকে ডাক্‌তেন—'বিভূর চিঠি এসেছে? কি লিখেছে সে?—দেখা হয় না শৈলীদের সঙ্গে তার?'

শৈল অস্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে। কথাটা পাণ্টাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িতে চায়,—বিভূতি তখন কতকাতা পড়ত নাকি? কি পড়ত?

কি পড়িত, মহেশ্বরী তাহা ভালো বুঝেন না। কিন্তু শৈলীর মা ভাবিতেন—দেখা কেন হয় না বিভূর সঙ্গে শৈলীর। মহেশ্বরী তাই আবার শুরু করেন, ভালো হয়েছে, সুখী হয়েছ,—যদি তিনি দেখতেন একবারও। শেষ পর্যন্ত ওই বলে বলেই মরলেন 'ভালো হোক, সুখে থাক্'।

শৈল দাঁড়াইয়া উঠিল। সে শুনিবে না এই কথা।

মহেশ্বরী বলেন, একটু বসো, শৈলী, শুনি ছেলেমেয়েদের কথা।

শৈলী বলিল, আসছি—বিভূর সঙ্গে কথা বলে—কলকাতায় সে পড়ত, তা শুনি নি ত।

শৈল পালাইয়া বাঁচিল। কেমন একটা বিরক্তি তাহার মনের মধ্যে পাক খাইয়া উঠিতে লাগিল। কি বলিতে চাহেন এই তাহার এক কালের ছোট মামী মা? শৈলীকে বুঝাইতে চাহেন--তাহার মা, হয়ত বা মামা রাঘবও, ছিল শৈলীর হিতাকাঙ্ক্ষী? শৈলীই মন্দ, তাহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ! এইজন্যই ত শৈল চিত্রিসার-নন্দীগ্রামের কাহারও সহিত দেখা করিতে চাহে না,—মনোরমা কুমুদিনীকেও তাহাদের অসহ্য ঠেকে। কিন্তু গিরীশ বুঝিবে না,—সে বলিবে—রাজীবের বাড়ি যাইতেই হইবে নিমন্ত্রণে।

বিভূতিশঙ্করকে শৈলর মনে আছে। কিন্তু এতদিন পরে বিভূকে চিনিতে পারিত না।

বিভূতিশঙ্কর মনে মনে হাসিল। মুখে বলিল, তা ঠিকই। আপনার কথা ত আমার কত মনে আছে, কিন্তু হঠাৎ দেখলে চিন্‌তে পারতাম কি তাই বলে?

বিভূতিশঙ্কর বলিল না—চিবুকের নীচে যে উল্কি আঁকা ছিল তাহাও মুছিয়া ফেলিয়াছে শৈল বিলিতী ডাক্তারের বহু সহায়তায়; কিন্তু চিবুকে তাই ধবলের রেখার মত একটা দাগ পড়িয়া গিয়াছে, বিলিতী অঙ্গরাগে তাহা একেবারে মিলাইয়া দেওয়া যায় নাই। অতি প্রয়াসে আপনাকে ঢাকিতে গিয়াই এইরূপে শৈল আপনাকে ধরা দিতেছে, একেবারে ঢাকিতে পারিবে না। এই কথাটাই রাজীবও জানে, সবাই জানে, এবং কুমুদিনী সহজভাবে ইহাই বুঝাইয়া দিয়াছে সহজ কথায়, 'তোমাদের চৌধুরীদের ভাগ্নী ত,—বলে মুর্গী না খেলে হেল্‌থ

থাক না।' অথচ রাজীবের মুর্গীতে অনুরাগ নাই, আর চিন্তাহরণ নিরামিষাশী।

'শৈলীদি' যেন জীবন্ত অস্বীকার।

প্রথম কৈশোরের ভীত, সংবেদনশীল চক্ষু মেলিয়া জ্ঞানশঙ্কর দেখিতেছি এই অদ্ভুতকর্মা আত্মীয় কুটুম্বদের—কতবার, কত সূত্রেই না ইহাদের নাম, কীর্তি, এবং 'অকীর্তির কথা' সে শুনিয়াছে।

প্রৌঢ় সার্থককীর্তি পুরুষ—দীর্ঘশ্মশ্রু, পরিচ্ছন্ন বেশবাস, এই রাজীব চৌধুরী,—বলিষ্ঠ দেহ, চোয়ালের বলিষ্ঠ গঠন, উদার, উচ্চহাস্যে মুখর—আর জ্ঞানকে নানাভাবে স্নেহে কাছে টানিয়া পরিতৃপ্ত—তিনিই রাখিয়াছিলেন জ্ঞানের নাম জ্ঞান। কোটটাই ও ইজের পরা গিরীশ, ইংরেজ সভ্যতার শ্রী ও ঐশ্বর্যে মুগ্ধ। যে বিলিতী মিড্‌ল ক্লাসের কথা আচার্য কেশবচন্দ্র বলিতেন সে স্বয়ং এবার তাহার পরিচয় গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানেই শুধু তাহারা শ্রেষ্ঠ নয়, তাহারাই বিলাতের মেরুদণ্ড—তাহারা বিজনেস্‌-ম্যানও। তাহারাই রাজনীতিতে গ্লাডস্টোন, ডিজরেলি হয়, পৃথিবীতে একটা সভ্য, পরিচ্ছন্ন, এবং 'অনেষ্ট' জীবন-যাত্রার পথ-প্রদর্শক। উৎকর্ণ হইয়া জ্ঞান ইহাঁদের কথা এক পার্শ্বে বসিয়া শোনে —অপলক চোখে দেখে। গিরীশ বলিতেছে, সেই রকম একটা মধ্যবিত্ত সমাজ না গঠিত হইতে এই দেশের মুক্তি নাই।

এই সব কথা রাজীব তাহার মুখে পূর্বেও শুনিয়াছে। একেবারে অস্বীকার সেও করিতে পারে না। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ আছে, সে জানে; কিন্তু কোথায় তাহাদের মধ্যে সেই উদ্যম? গিরীশ যাহা বলে 'বিজনেস অনেষ্টি এণ্ড ডিসিপ্লিন' তাহাই বা কোথায়? কিন্তু তাহা সত্বেও রাজীবের আপত্তি করিতে ইচ্ছা যায়। না, আমার দেশ এত জঘন্য নয়। কি বলিয়া আপত্তি করিবে সে? মামুলী কথাই।

রাজীব বলিল, শিক্ষাই লাভ করিল না এখনো দেশের মানুষ—সোয়া শত বৎসরে। গিরীশ এই যুক্তি জানে, সে বলিল, যারা পেয়েছে তারাই বা কি করছে ? বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম করছে, নয় বার লাইব্রেরীতে গলাবাজি করছে, নয় ব্যবসায়ে দু পা বাড়াতেই চাইছে লাখ টাকা। কিম্বা ইলবার্ট বিল নিয়ে ছড়া কাটছে 'বেঁচে থাক মুখুজ্জের পো, একটি চালে করলে বাজিমাৎ।' কি জানো—আমাদের এই ভদ্রলোক মধ্যবিত্তেরও মর‍্যালিটি বড় নীচু, এইটাই আসল কথা। তারপর তারা অযোগ্যও—বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ, এই সবের নামগন্ধও দেশে নেই। 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' ভগবানের বিধান, ডারুইনের এই কথাটা ইংরেজকে দেখলে মানতে হয়। আর, অযোগ্যের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী, এই কথাটাও আমাদের দেশে বুঝতে হয়।

রাজীবের মন চীৎকার করিয়া উঠিতে চাহে : মিথ্যা, মিথ্যা এই কথা। কিন্তু কি করিয়া বলিবে তাহা সে জানে না।

আপত্তিটা বিভূতিই করিল। - ইচ্ছা করলেই কি দেশের কিছু করা যায় সহজে ? সুযোগও থাকা চায়। আমাদেরকে সে সুযোগ আমাদের শাসকেরা দিবে কেন ?

গিরীশ ক্ষুন্ন হইল। কি বলো তুমি, বিভূতি ? একটা সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করেছি আমরা ? ইংরেজি শিক্ষা পাই, কিন্তু চলি গুরু-পুরুতের মন্ত্রে—বিজ্ঞান পড়ি না, একবার নামও করি না—ইন্‌ডাষ্ট্রির, ব্যাংকিং-এর, বিজ্‌নেসের।

বিভূতি বলিল, বিজ্ঞান কিন্তু আমরা চাই—দেখুন মহেন্দ্রলাল সরকার কত চেষ্টায় সে ব্যবস্থা করছেন। তবে ব্যবসা বাণিজ্য করছি না।

আবার বলিল, কিন্তু করব কি করে আমরা ? একটা যন্ত্র গড়তে গিয়েছিলাম—হয়ত গড়তে আমি পারতাম না,—কিন্তু তার আগেই ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সাহেবরা আমাকে তাড়াল—'নেটিবের'

যন্ত্র-গড়ার স্পর্ধার জন্য। ব্যবসা করতে গেলাম—ঠিকাদারীর কাজ। আমার ইঁট ফিরিঙ্গীরা কিনে নিলে হয় ফার্স্ট ক্লাশ, তা আমার থাকলে থার্ড ক্লাশ। তুলে দিলাম ইঁটখোলা। করতে গেলাম রেলে ঠিকাদারী। একই কাঠ, আমি বিক্রী করতে গেলে নেয় না।—ঘুষোঘুষি হয়ে গেল ফিরিঙ্গী ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে—আমার কাজকে নষ্ট করে টাকা আটকে রাখছে, ঘুষ না দিলে ছাড়বে না। বলুন তারপর করব কি? যতক্ষণ বণিক শাসক, ততক্ষণ বাণিজ্যে আমাদের পথ বন্ধ, পুরানো কার-ঠাকুর কোম্পানি প্রভৃতির দশা থেকে তা বুঝ্ছেন। আমি জেলাবোর্ডের পথ ঘাট, ড্রেন, পুল তৈরী করতাম, তাও ছেড়ে দিয়ে এলাম। দেশে গিয়ে পারি মুদি দোকান দোব—নয় ইস্কুলে পড়াব।

গিরীশ তর্কে বিরত হইত না—এই বিপথগামী ছেলেটা বাহাদুরী করিতেছে। আসলে তাহার চরিত্রশক্তি নাই, গ্রিট্ নাই। কিন্তু তৎপূর্বেই রাজীব বলিল,—অনেকটা গিরীশের আক্রমণ হইতে বিভূতকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায়,—বিভূতির জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতা সেবারই চিত্রিসারে সে শুনিয়াছে। এবং রাজীবের বিশ্বাস শিক্ষা ছাড়া পথ নাই।

সংযত চিত্তে রাজীব তাই পাশ কাটাইয়া বলিতে চাহিল, শিক্ষা না পেলে ত মানুষ অযোগ্য থাকবেই। ছাখো না, সোয়া শত বৎসরেও এদেশে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিস্তার করলে না। শহরে এখানে ওখানে দেশের লোক নিজের চেষ্টায় স্কুল কলেজ করছে। কিন্তু আমরাও গ্রামে শিক্ষা বিস্তার করতে পারছি না। সেবার বাড়ি গেলাম—বলিয়া রাজীব চিত্রিসারের কথা বলিতে গেল; শেষে বলিল, দেখলাম সেই চিত্রিসার যে তিমিরে সে তিমিরে।

শৈল বলিল, তা হবে না কি হবে?

রাজীব বলিল, হবে কেন? আমরা তবে কি করলাম?

কি না করেছি?—এখন গ্রামে গিয়ে বসে থাকবে নাকি?—শৈল

পরিহাসের কণ্ঠে বলিল, একি ইংলিশ কান্ট্রি, না, ইংলিশ হোম্! আমাদের যা 'হোম্'—তা তুমি ভুলে যেতে পার, কিন্তু আমি যাইনি।

তাহার বুক ঠেলিয়া যেন আজন্মের গঞ্জনা ফুঁসিয়া ফুঁসিয়া উঠিতে চাহিল। চোখ মুখও ক্ষোভে রক্তবর্ণ।

রাজীব মুখ নত করিল। বলিল, ভুলি নি। তাই ত বলছি—সেখানে আমরা না গেলে তা আরও নষ্ট হবে দিনে দিনে।

গিরীশ বলিল, সেখানে গিয়ে তুমিই কি মানুষ থাক্‌তে পারবে?

থাকতে না পারলে বুঝবে আসলে আমরা মানুষ হই নি। আমরা সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনকে এড়িয়ে গিয়ে আর একটা নূতন 'জাত' সৃষ্টি করছি। দেশের মানুষকে আমাদের ধর্মবোধ, নীতিজ্ঞান দিতে পারব না।

গিরীশ বলিল, গুড্ গড্! তাদেরকে ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য করবে নাকি?—বলিয়া সে হাসিল। ক্ষুব্ধ, নিস্তব্ধ শৈলও এইবার হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু রাজীব হাসিল না। বলিল, চেষ্টা করতে হবে ত। চিন্তাহরণদা' তা'ই চেয়েছিলেন গ্রামে গিয়ে ব্রাহ্ম আশ্রম খুল্‌বেন। কিন্তু আমাদের সমাজ টাকা দিতে পারল না।

গিরীশ হাসিতে লাগিল, ভালোই হয়েছে। নইলে ছেলেগুলোর লেখাপড়াও হত না। বউ ঠান চিরজীবন ভুগেছেন, আরও ভুগতেন।

মনোরমা উপস্থিত ছিল না, থাকিলে এই কথা তাহার পক্ষে অসহ্য হইত। কিন্তু রাজীব জানে—এই কথা সত্য; মনোরমাও আর তাহা গোপন রাখিতে পারেন না—এমন কঠিন সত্য। রাজীব নিজেও বুঝিয়াছে—প্রচারকরা নিজেদের আদর্শ লইয়া যতই অটল থাকুক, তাহাদের সংসার আছে, পরিবার আছে।—তাহাদের পুত্র পরিবার সংসারে চারিদিকে দেখে বড় চাকুরের, অর্থবানের প্রাধান্য। বিশেষত, বড়লোকও বিলাত ফেরতারাই অর্থে, কর্মে, প্রভাবের বলে ব্রাহ্ম সমাজের

মেরুদণ্ড। এই জন্যই ত কুমুদিনীও তাহার পুত্র সত্যকে বিলাত পাঠাইবে বলে। সমাজে এখানে-সেখানে আঘাত খাইয়া এই অপমানবোধ ও দর্প মনোরমার মনেও জমিয়াছে,—তাহার ছেলেরা বড় হউক, ইহার উত্তর দিক্। অমৃতও যে করিয়াই হউক বিলাত যাইতে তাই দৃঢ়সংকল্প। মায়ের ও বাপের উপর সে অভিমান পোষণ করে,—তাহারা কেন কাকাকে ধরিয়া তাহার জন্য অর্থ-ব্যবস্থা করে না? মনোরমা স্নেহবশে আর অমৃতকে বাধা দিতে পারে না, অমৃত তাই রাজীবের শরণাপন্ন,—তিনি কি গিরীশকে এই সাহায্যদানে রাজি করিতে পারিবেন না? চিন্তাহরণ তাহাকে বুঝাইয়াও ক্ষান্ত করিতে পারে নাই। তাহার প্রচারক-জীবনে সে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত লইয়াছে, অন্যকে তাহা গ্রহণ করিতে বলিবার মত তাহার শক্তি নাই। কিন্তু আজই কি পুত্রদের সেই প্রার্থনার কথাও গিরীশের নিকট উঠিয়া পড়িবে?—চিন্তাহরণ ভয়ে লজ্জায় মহেশ্বরীর নিকট উঠিয়া যাইবার কথা ভাবে। মনে যেন একটা সংকোচ, ভীতি কি বলিবে গিরীশ তাহা হইলে? দাদা শেষে এইরূপে ব্রহ্মসাধনা করিতেছেন?

গিরীশ ততক্ষণে স্বচ্ছন্দ হাস্যে বলিতেছে, দাদা ত চিরজীবনই আইডিয়াল নিয়ে পাগল। কি করতে চান তিনি গ্রামে? কাদের ব্রাহ্ম করবেন—শিক্ষা আছে তাদের?

রাজীব বলে, শিক্ষা দিতে হবে।

শিক্ষা ত পেয়েছে তোমাদের কেরানি, উকিল, মাষ্টাররা। তাদের ব্রাহ্ম-সমাজে আনবে তারা চাইলেই?—কেমন একটা অবজ্ঞার সুর গিরীশের কথায়।

চাইলে ত আনবই; এবং যেন চায়—তারও চেষ্টা করব।—রাজীব মনে-মনে আঘাত পাইয়াছিল, তাই একটু জোর দিয়া বলিল।

গিরীশ হাসিতে লাগিল। শৈলও যোগ দিল—এইবার স্বচ্ছন্দ হাস্যে।

গিরীশ বলিল, মাই ডিয়ার রাজীব, ডোণ্ট্ বি সিলি।—'কেন?' কেন, আবার কি? দেখেছ—এমনি সমাজের অর্থভাণ্ডার সামান্য। যত বাজে মানুষ এনে ঢোকাবে তার মধ্যে। অযোগ্য লোক দিয়ে কি হবে?

যোগ্যতার প্রমাণ কি? ধর্মনীতি, ত্যাগ,—

গিরীশ বলিল, ইয়েস্—এবং আরও কিছু—শ পাঁচেক টাকা মাসিক মাইনে।

শৈল হাসিল। রাজীবের বাঙনিষ্পত্তি হয় না। 'শ পাঁচেক টাকা মাসে মাহিয়ানা!' গিরীশ বুঝাইয়া বলিল, হাঁ. নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতাই দেখো না কেন? চারিদিকে আমাদেব কত বিরোধিতা। এর মধ্যে টাকা না থাকলে মাথা তুলে তুমি ক'দিন থাকতে পারতে—উইথ্ প্রিন্সিপল এণ্ড উইথ্ সেল্ফ্ রেসপেক্ট?

চিন্তাহরণের মনে পড়িল—'ত্যাগ মানুষকে ছোট করে না, অভাবই মানুষকে ছোট করে।' ত্যাগ সে করিতে পারিয়াছে; কিন্তু সেই ত্যাগ যে ক্রমে অভাব হইয়া উঠিয়াছে তাহার সংসারের দৈনিক জীবনে। আপনার বুকের জ্বালায় দগ্ধ হইয়াও মনোরমা স্বামীকে সেই ত্যাগের মহিমায় শান্ত চিত্তে চলিবার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে। কিন্তু অভাব এদিকে দৈন্য হইয়া, দুরাশা হইয়া, দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে অমৃতের মনে, তাহাদের পুত্রকন্যাদের পক্ষে। গিরীশও তাহা দেখিতেছে।

গিরীশ লক্ষ্য করিল—চিন্তাহরণ উঠিয়া গেল। তাই বলিল, দাদাকে বুঝিয়ে বলো রাজীব, আর যেন ক্ষ্যাপামি না করেন। অনেক সয়েছেন বউঠান—আর সি ডিজার্বস্ অনার এণ্ড রেষ্ট্। ছেলেরা ভালো হয়েছে, তাদের উন্নতি করতে দিন স্বাধীনভাবে—

রাজীব বিস্ময় ও ক্ষোভ নিজের মনেই দমন করিল—গিরীশ কোনো কালেই তাহাদের সঙ্গে একমত হয় নাই, কিন্তু গিরীশও সত্যই সেই মহেশ দত্তের মত বলে আজ—ব্রাহ্মসমাজ শুধু 'আলোক প্রাপ্তদের' জন্য।

না, যাউক এই প্রসঙ্গ। এইবার অমৃতের কথাটা রাজীবই তুলিবে—চিন্তাহরণ সম্মুখে থাকিলে তুলিত না। —অমৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় হইয়াছে। গিরীশ তাহার সেই সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করিল। রাজীব সূত্র ছাড়িল না : এখন কি করতে বলো ওকে ? ওর ইচ্ছা বিলাত যায়, আই-সি-এস্ হয়।

শৈল দূর হইতে শুনিতেছিল। কেমন অপ্রসন্ন মুখে উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল। গিরীশ মহোৎসাহে বলিল, বাই অল্ মিন্স্।

রাজীব বলিল, কিন্তু চিন্তাহরণ দাদার টাকা কোথায় ? তিনিত প্রচারের কাজও দারিদ্র্য ব্রতই গ্রহণ করলেন।

গিরীশ বলিল, সমাজকে উনি বলুন। উনি সমাজের প্রচারক, তোমরা ওঁকে দেখবে না ?

সমাজের অবস্থা ত জানো, সেখানে হবে না। আমি ভাবছিলাম—তুমি যদি সাহায্য করতে পারতে এখন, পরে নয় ফিরে এসে অমৃত তা শোধ করত।

গিরীশ গম্ভীর হইল। ধীরভাবে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল : আমার ত খরচ জানো,—এক ছেলে বিলাতে, অন্য ছেলে ও মেয়েরা এখানে বোর্ডিংএ। এদিকে নিজেদের খরচ। পাই কি, থাকে কি ? তারপর সমাজের ত সব কাজেই—'দাও', 'দাও'। আমি ধার করতে পারব না—সে প্রশ্ন ওঠেই না। কিন্তু আমি বলি এ দাদার ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়। সমাজের থেকে কেন প্রচারকদের পুত্রকন্যাদের শিক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হবে না ? এইটাই আমাদের শিখ্তে হবে—ইংরেজ ও আমেরিকান্ প্রোটেস্টান্ট চার্চ থেকে। আমরা কেবল প্রার্থনা করা, সার্মোন দেওয়া প্রভৃতি শিখেছি। কিন্তু ওদের অর্গ্যানিজেশান শিখ্ছি না চর্চের-ব্যাপারেও। বুঝছি না—ওদের কর্ম শক্তির মূল কি....

গিরীশের ইংরেজ প্রশস্তি আরম্ভ হইয়াছে। সত্য হইলেও রাজীবের

নিকট তাহা অস্বস্তিকর। শুনিতে শুনিতে সে মনে মনে বলে এওত সেই 'মহারাণীর দোহাই', সেই স্বজাতি নিন্দা। তথাপি রাজীব অপেক্ষা করিতে লাগিল—অমৃতের বড় আশা ভঙ্গ হইবে। এবং মনোরমাও মনে মনে কামনা করে—তাহার পুত্র ধনে মানে বড় হইয়া তাহার পিতার ত্যাগ ব্রতকেই এই অন্ধদের চোখে আরও উজ্জ্বলতর করিয়া তুলুক—তবেই মনোরমার ত্যাগ সার্থক হয়, তাহার অপমান বোধ দূর হয়।

রাজীব বলিল, অমৃতের তাহলে কি করা যায়?

গিরীশ বলিল, এখন ত বি-এ পড়ুক।

পরে যে আই-সি-এসের বয়স থাকবে না।

গিরীশ বলিল, না হয় ডিপুটি ম্যাজিষ্টেটের পরীক্ষা দিবে—আমিই কি আই-সি-এস্ পরীক্ষা দিয়েছিলাম, বিলাত গিয়াছিলাম?

শৈল এবার বলিল, সেকথা বলো কেন? সকলেই এখন বিলাত যেতে চায়. আই-সি-এস্ হতে চায়। আই সি এস্ কি এতই সহজ? জানো ত ওদের কোচিং নিতে হয়—আর কত খরচ তাতে!

কুমুদিনীর নিকট শৈল শুনিয়াছিল—সত্যকেও বড় হইলে সে বিলাত পাঠাইবে। কথাটায় বুঝি সেই সম্বন্ধেও ইঙ্গিত ছিল।

রাজীবেরও তাই লাগিল, বলিল, চাইবে না কেন? সকলেরই ত বড় হতে সাধ যায়।

গিরীশ হাসিয়া বলিল, তা ত অন্যায় নয়। অ্যাম্বিশন থাকা ভালো। কিন্তু সকলের ত যোগ্যতা সমান নয়। তা ছাড়া, মধ্যবিত্তরা ওদেশে বিজনেসে যায়, চর্চে যায়,—আমরা বিজনেসে অক্ষম, কিন্তু প্রচারকর্মে যোগ্য লোক চাই। অমৃতও দাদার ছেলে, কিন্তু প্রচারক হবে না কেন?

রাজীব অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, বলিল, সেও তার বাবার মত দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করবে, এই ত বলছ? চিন্তাহরণদা'র অত নাম, কিন্তু কিভাবে,

তার সংসার ও ছেলেদের নিয়ে কি করে, দিন গিয়েছে। তবু বউঠান মাথা উঁচু করে চলেন বলে সকলে মনে করে তাঁর ভয়ানক গর্ব।

কিন্তু মহেশ্বরী আসিলেন—গিরীশকে দেখিতে চান,—তাই আর কথা হয় না।

ভাবিয়া ভাবিয়া রাজীব স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিল—আহারান্তেই সে প্রস্তাব তুলিবে। যাহাই হউক তাহার নিজের পুত্রের, রাজীব অমৃতকে বিলাত পাঠাইবে। কিন্তু তারপর?—কুমুদিনীর বিবাহ কালে মনোরমা কুমুদিনীকে বলিত—তাহার পুত্রের সঙ্গে কুমুদিনীর ভাবী কন্যার সে বিবাহ দিবে। দুই সখীর সেই সাধ এখন কেহ মুখ ফুটিয়া ব্যক্ত করে না—ছেলেমেয়েরা বড হইয়াছে। রাজীব কাহাকেও কোনো প্রতিশ্রুতিতে বদ্ধ করিবে না, সেই অমুক্ত কথা আর তুলিবেও না। কিন্তু আহারান্তে সে আজ এই প্রার্থনাই করিবে—অমৃতকে সে বিলাত পাঠাইবে—মনোরমা, চিন্তাহরণ অনুমতি দিক্।

কুমুদিনী ও মনোরমা রান্নার কাজে ব্যস্ত। মহেশ্বরীকে লইয়া তাহারাই গল্প করিতেছিলেন। শৈল তাহাদের সহিত এক-আধকথা বলিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিয়াছে রাজীব ও গিরীশের কাছাকাছি। চিন্তাহরণ বারান্দায় বসিয়া কখনো বিভূতি, কখনো জ্ঞানের সহিত জোর করিয়া আলাপ করিতেছে—রাজীবও গিরীশের কথা যেন তাহার কানে না যায়।

দীর্ঘশশ্রু, শান্ত চক্ষু, মানুষটি বালক জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করে—সে কি পড়ে, কি তাহার ভালো লাগে, কাশীতে তাহারা কি দেখিয়াছে, দেশে ফিরিয়া এখন কি করিবে তাহারা। কখনো বিভূতিশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি লাহোরে ছিলে, তা ত জানতাম না। আমিও

ত তখন লাহোরে? দেখা করো নি কেন? একটাবার খবরও দিতে হয়। আমি কি তোমাদের পর?' বলিতে বলিতে চিন্তাহরণের মনে পড়ে পূর্ব কথা—দেবপ্রসাদ চৌধুরীর তাহাদের জন্য আকাঙ্ক্ষা উৎকণ্ঠা, তাহার উৎসাহ চিন্তাহরণের প্রথম পদ্য রচনায়। তাঁহার আশা ছিল চিন্তাহরণ কবিতা লিখিবে, সাহিত্য সৃষ্টি করিবে। দেশে নূতন ভাবের নূতন জীবনের স্রোত আসিতেছিল তখন, তাহাতে চিন্তাহরণ তাহার শক্তি লইয়া, রচনা লইয়া, আপনার জীবন-ভরা সাহিত্যিক দান লইয়া আপনাকে উৎসর্গ করিবে। অনেক স্বপ্ন ছিল দেবপ্রসাদ চৌধুরীর। সেই শান্ত মানুষের দৃষ্টিতেই তখন বুঝি ফুটিয়া উঠিয়াছিল নব-যুগের উষারাগ।—তাই তাঁহার আশা, উৎসাহ ও কল্পনার শেষ ছিল না। এবং তাঁহার সকল আশার আশ্রয় ছিল তাহারা তিনজন—চিন্তাহরণ, গিরীশ, রাজীব। বিশেষ করিয়া আবার তাঁহার ভবিষ্যৎ আশার কেন্দ্র ছিল সে, চিন্তাহরণ গাঙ্গুলী। সেই স্বপ্নের বিশেষ রূপটি ছিল এই—চিন্তাহরণ কবিতা লিখিবে, সাহিত্য লিখিবে, সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিবে, দেশ জাগ্রত হইবে, স্বাধীন হইবে। ইহাই তাহাদের নিজেদের কালের মহৎ সাধনা—সাহিত্য, সমাজ আর স্বাধীনতা। সেই সাধনার প্রথম দীক্ষা জানিয়া না-জানিয়া ত তাহারা সেই শান্ত মুখ-চোখ শ্যামবর্ণ শিক্ষানুরাগী মানুষটির নিকটই লাভ করিয়াছিল। তিনিই ত তাহাদের প্রথম গুরু।

অথবা তিনিই বা কে? গুরু সেই মহাগুরু আচার্য—

যিনি গুরুর গুরু!—সকল গুরুর, সকল আচার্যের, সকল শিক্ষাদাতার মধ্য দিয়া যেই পরমজ্ঞান আপনাকে প্রকাশিত করে;—সাহিত্যে, সমাজে, স্বাধীনতার সাধনায়ও যাঁহার প্রকাশ;—তিনিই সেইদিনকার সেই ফুটনোন্মুখ কিশোর-চিত্তের সম্মুখে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন রসধারারূপে—রসো বৈসঃ। সেই রসস্বরূপই বুঝি আবার তাহার সেই শুভ মহৎ ইচ্ছাকে নবকালের মহাভাবের গঙ্গা-

ধারার মত বাঙলার সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ উৎসারিত করিয়াছিলেন। তাহা পূর্ব ছুঁইল, পশ্চিম ছুঁইল, সিন্ধু পাঞ্জাব হইতে আসামপ্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র জাতির মনোভূমিকে অভিষিক্ত করিল; বাঙালীর চিত্তবনভূমিকে সাহিত্যে, ধর্মে, স্বাধীনতার প্রাণভরা সম্পদে—ফুলে, ফলে, লতায়-পাতায়—সরস সুন্দর করিয়া তুলিল। শুধু কাব্য, শুধু ধর্ম, শুধু সমাজ সেবা,—ইহাতেও বোধহয় তাঁহার প্রকাশ সম্পূর্ণ নয়। তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত জ্ঞান কর্ম কল্পনার মধ্য দিয়াও তিনিই বুঝি দাবী করিলেন—সাহিত্যে, সমাজে, সার্বজনীন উদ্যোগে সেই মহাভাবের পূর্ণতর প্রকাশ; তাঁহার মহৎ ইচ্ছার বিজয়-গাথা।

সেই লেখা কি তাহারা লিখিয়াছে নিজ নিজ খণ্ড জীবনে?

চিন্তাহরণ আবার তাকাইয়া দেখে—মনে করিতে পারে সে তাহাদের জীবনের রেখাপথ, কর্মে চিন্তার অঙ্কিত সেই জীবন-পট। হাঁ, কিছু বলিতে তাহারা চাহিয়াছে, কিছু আঁকিতে চাহিয়াছে।—কিন্তু এই চিত্র বড় অস্পষ্ট, বড় অসম্পূর্ণ, তাহাও চিন্তাহরণ জানে।—আকাঙ্ক্ষা তাহাদের ক্ষুদ্র ছিল না, স্বপ্নও তাহাদের বিরাট ছিল, সাধনাও ছিল তাহাদের পবিত্র। তবু যেন কোথায় রহিয়া গিয়াছে অসার্থকতা, কোথায় ঘটিয়া গিয়াছে অসঙ্গতি, সমস্ত অকপটতার মধ্যেও রহিয়া গিয়াছে কোন আত্ম-ছলনা। এইখানে এই মুহূর্তে বসিয়াও সে তাহা অনুভব করিতেছে—কি যেন বাঁকিয়া চুরিয়া যাইতেছে তাহাদের প্রয়াসে, কি তাহা? তাহারা এ দেশের সাধন-ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে;—অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু হইতে ত্রাণ পাইতেছে, কিন্তু অমৃতকে লাভ করে নাই.—চিন্তাহরণের ইহাই সন্দেহ। ইহাই কি সে সেই নিগূঢ় ত্রুটি? —কিম্বা, তাঁহারা এ দেশের ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণী সাধারণ মানুষের জীবন হইতে, সংস্কার হইতে, আপনাদের শিক্ষা-দীক্ষার দর্পে,—সত্য, সুনীতি ও সুরুচির নূতন অহঙ্কারে,—আপনাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া

লইয়াছে, রাজীবের এই ধারণাই সত্য?—না, ইহাই সত্য—গিরীশ যাহা বলে, শৈল যাহা না বুঝিয়াই এমন উগ্রভাবে আবৃত্তি করে—আমরা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী অগ্রসর হই নাই, উপযুক্ত হই নাই, ইংরেজ জাতির নিকট হইতে, তাহাদের ইতিহাসের নিকট হইতে, সেই সমাজের নিকট হইতে, সেই সভ্যতার নিকট হইতে,—জীবনের নবতন শিক্ষা গ্রহণ করিতেছি না, আঁকড়াইয়া আছি পুরাতন জীর্ণ সমাজের গলিত নীতি, গলিত আচার নিয়ম, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার, আর এখন তুলিতেছি কংগ্রেস করিয়া রাজনীতির ফাঁকা আওয়াজ? এই সত্য গ্রহণ করিতে অনভ্যস্ত বলিয়াই কি আজ সেই গিরশীকে তাহারও মনে হয় এত দূর, শৈলকে মনে হয় এত পর? গিরীশকে মনে হয় স্নব, শৈলকে মনে হয় সং?

মহেশ্বরী মনোরমাকে বলেন: না, বউমা, মনে করেছি এবার বিভূতির বিয়ে দোব—এতদিনে সে রাজী হল। তারপর বউ নিয়ে দেশেই থাকব আমরা—

কোথায় বিবাহ দেবেন?

তোমাকেই জিজ্ঞাসা করব ভেবেছি—তাই এলামও আজ। তোমার দাদা আদিত্যের একটি মেয়ে আছে,—তাঁরা লিখেছেন। এটি তাঁর তৃতীয় মেয়ে, কাদম্বিনী নাম। সে নাকি বড়ও হয়েছে। তাঁরা প্রস্তাব করেছেন।

আদিত্যনাথের পত্র এক-আধ সময়ে পাইত মনোরমা। তাহার তৃতীয় কন্যার জন্ম-সংবাদও পাইয়াছিল। সেবার আদিত্য শেষ সংবাদ দিয়াছিল—পীতাম্বর গাঙ্গুলীর মৃত্যুর পরে—পৈত্রিক সম্পত্তি অধিকার করিতে হইলে চিন্তাহরণ যেন অবিলম্বে আসে। কিন্তু চিন্তাহরণকে একথা লিখিয়া লাভ কি? আদিত্যনাথ আর পত্র লেখে নাই।

মহেশ্বরী বলেন, শুনেছি, মেয়েটিকে স্কুলে একটু লেখাপড়াও তিনি শিখিয়েছেন।

স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়েছেন মেয়েকে দাদা?

আদিত্যনাথ গোঁড়া ছিলেন না। কিন্তু কন্যাকে স্কুলে পাঠাইবার মত এত সাহস তাহার হইল, মনোরমার তাহা আশ্চর্য ঠেকে।

মহেশ্বরী জানান, তা হবে না কেন? শহরে ত কত মেয়ে স্কুলে পড়ে!

তা বটে।

মনোরমার মন দূরে অতীতে চলিয়া যায়। সামান্য লেখা পড়াও ছিল সেদিন সে শহরে কত দুর্ঘট জিনিস। আজ হিন্দুঘরের মেয়েরাও অবাধে স্কুলে যায়—সেই শহরেই। হয়ত মনোরমাদের জীবনের কঠিন সংগ্রাম ও বেদনা কিছুই সহিতে হইবে না তাহাদের! তাহারা বুঝিবেও না—কতখানি রক্ত ঢালিয়া এই পথকে প্রস্তুত করিয়াছে মনোরমারা—চিন্তাহরণরা।

মহেশ্বরী বলেন,—বুদ্ধি থাকে, ভালো চরিত্র হয়—তবেই হল। আমি ভাবছি ওখানেই ঠিক করব—তোমার ভাইরা ভালো হবে।

মনোরমা ভাবিতে থাকে—এই সেই শৈলী! সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ঐশ্বর্যে সৌভাগ্যে আজ সে যেমন সমুজ্জল তেমনি পৃথিবীর সকলের প্রতি গর্বে দর্পে দৃক্‌পাতহীন। একবার মহেশ্বরীর নিকটও বসিল না। আর সে মনোরমা—অভাবে, পরিশ্রমে, জীবন-সংগ্রামে বিগতশ্রী, ক্লান্তদেহ, উদ্বিগ্ন-মন, বিরক্ত, বিক্ষুব্ধ চিত্ত। অভাব তাহাকে ছোট করিতে পারে নাই, কিন্তু ত্যাগ তাহাকে প্রশান্ত শ্রী ও স্থির সৌন্দর্য দান করিতে পারিল কই? তাহার কন্যারা বিলাতী স্কুলে পড়িতে পায় নাই; সুপাত্রে বিবাহিত হইবে কি না কে জানে? তাহার পুত্র বিলাত যাইতে চায়, জীবনে সাফল্য সে লাভ করিবে কিনা

কে বলিবে? তাহার অভিমান বিক্ষুব্ধ মনও এতদিন তাহাদের জন্য এই সৌভাগ্য কামনা করিয়াছে। আজ কিন্তু এই মহেশ্বরীকে সে দেখিল,—এই বিভূতি, জ্ঞানশঙ্করকেও দেখিল;—ইহারা ত কেহই তাহার সৌভাগ্যের, সম্মানের অর্ধেকের অধিকারীও হয় নাই, তবু তাহাদের মনে অভিযোগ নাই কেন? ত্যাগের আত্মপ্রসাদও তাহাদেব নাই, অভাবের দাহনও নাই। এইরূপ সহজ ভাবেই গাঙ্গুলী বাড়ির বধূ মনোরমাও আপনার জীবনকে গ্রহণ করিত; তাহা হয় নাই। মনোরমা নিজেই সেই জীবন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। না, সেই নিশ্চল জীবনযাত্রা সে আর চাহেও না; সে ব্রাহ্ম ধর্মের যতটুকু উপলব্ধি করিয়াছে তাহাতে সে জানে—গাঙ্গুলী বাড়ির সেই সংসারেও শ্রেয়ঃ নাই, কল্যাণ নাই, কোনো মহিমা নাই। তাই সে আপনার সংসার আপনি গড়িবার অধিকার চাহিয়াছে—গড়িয়াছেও। সত্যই গড়িয়াছে—তাহার স্বামী আপনাব আদর্শ জীবনে উপলব্ধি করিবার অবসর পাইয়াছেন, তাহাতেই মনোরমার তপস্যা সিদ্ধ হইয়াছে। না, হয়ত এখনো তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। আপনাকে বিধাতার নিকট চিন্তাহরণ পূর্ণ নিবেদন করিতে চান—এই প্রচার তর্ক, সাংসারিক কর্তব্যে তিনি আবদ্ধ থাকিতে চাহেন না—তেনাহং কিং কুর্যাম্ যেনাহং নামৃতা স্যাম্।—বেশ ত, তাহাই হইবে তবে। মনোরমা তাহারই পার্শ্বে সেদিনের বল্কলধারিণী ঋষিপত্নীর মত রহিবেন—সহধর্মিণী।

আর তাহার পুত্রও তাহার কন্যারা?—কেন, তাহাদের পিতার সাধনা, মাতার সেবা কি তাহাদের কম ঐশ্বর্য?—পিতা তাহাদের বিদ্যাদান করিবেন, মাতা তাহাদের স্নেহদান করিবেন।—তথাপি তাহাদের ডাবটনে পড়িতে হইবে? বিলাত যাইতে হইবে? ঐ শৈলর পিছনে পিছনে তাহারই মত সঙ্ সাজিয়া, গিরীশের পিছনে পিছনে তাহারই মত গোলামীর তকমা বহিয়া বেড়াইতে হইবে? ইহারই জন্য

কি তাহাদের মাতা মনোরমা তাহার আত্মীয়-পরিজন ছাড়িয়া, তাহার জন্মগত রূপ, শ্রী ও লাবণ্য একটু একটু করিয়া খোয়াইয়া,—স্বাস্থ্য, আরাম, আয়েস সমস্ত বিসর্জন দিয়া—তাহাদের মানুষ করিয়াছে? ইহারই জন্য কি তাহাদের পিতা শপথ লইয়াছিলেন সত্য ব্রতের—'এ জীবনে সরকারী চাকরি গ্রহণ করিব না?'

মনোরমা উঠিয়া বসিল। আজই—গৃহে ফিরিয়াই—সে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিবে, নূতন করিয়া সত্যের শপথ লিখাইবে তাহার পুত্রকন্যাদের দিয়া—অগ্নিস্পর্শ করিয়া গ্রহণ করিবে সেই সত্যব্রত—অমৃত, নিরঞ্জন, স্বর্ণ—তাহারা এই গোলামী স্বীকার করিবে না, আক্ষুদ্র দেশের সাধারণ মানুষকে তাহারা আপনার ভাই বলিয়া গ্রহণ করিবে। তারপর?—চিন্তাহরণের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী তাহারা চলিয়া যাইবে সাঁওতাল পরগণার সেই পল্লীতে—ব্রাহ্ম-সাধনায়, এই ব্রতের উদ্‌যাপনে।

আহার্য প্রস্তুত। চিন্তাহরণই প্রস্তাব করিল,—এতকাল পরে আজ অনেকে আমরা একত্র হয়েছি। বড় আনন্দের দিন আজ। একবার এসো সকলে মিলে উপাসনা করে নিই আহারে বসবার আগে।

রাজীবের মুখ গম্ভীর, হয়ত সে আহত। তাহার মুখ নৈরাশ্যে বিষণ্ণ। চিন্তাহরণের অন্তরেও বেদনা জমিতেছে—অমৃত বুঝি মুসড়াইয়া পড়িবে ব্যর্থ আকাঙ্খায়।

গ্রেস্ বিফোর মিট্—শৈল বলিল—এ কিন্তু ইংলিশ ফ্যামিলিতে হবেই হবে।

একটু জোর দিয়াই মনোরমা বলিল, আমাদেরও পূজা আহ্নিক করত, গণ্ডুষ নিত।

সে আর এ এক কথা।—হাসিল শৈল।

মনোরমা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু না, চিন্তাহরণ বিমুখ হইবে না কাহারও প্রতি। বিমুখ হইবে না—বিধাতাব নিকট সে আত্মসমর্পন করিবে।

চিন্তাহবণ বিভূতিকে, মহেশ্বরীকে, জ্ঞানকেও ডাকিযা লইয়াছে। এসো, দেখবে ব্রাহ্মদেব উপাসনা। আমরা কি করি—এত ত শোনো।

বিভূতি অবশ্য ইহার সহিত পরিচিত। কিন্তু মহেশ্বরী তাহার কিছুই জানেন না। জ্ঞানও শুধু শুনিয়াছে, জীবনে তাহা দেখে নাই। তবু এখন আহারেব পূর্বে উপাসনা কবিতে হইবে শুনিয়া তাহারও কেমন হাসি পায়।

চিন্তাহরণ উপাসনা করিল। নাতিদীর্ঘ উপাসনা—মহেশ্বরী ভালো করিয়া বুঝিলেন না। বিভূতিশঙ্কর বেশি চমৎকৃত হইল না। কিন্তু শুনিতে শুনিতে চমৎকৃত হইল জ্ঞান—তাহার কিশোর মনের সম্মুখে এই ভাষা, এই ভাব, এই দীর্ঘশ্মশ্রু সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ়ের শান্ত বিষণ্নরূপ সবই মনে হইল সুন্দর, অকৃত্রিম, আনন্দদায়ক।

চিন্তাহরণ উপাসনা শেষ করিলেন: যোগ্যকে তুমিই সম্মান দিয়াছ, বিধাতা! কিন্তু অযোগ্যকে তুমিই দিয়াছ তোমার দয়া, সকলকে তুমিই দিয়াছ অধিকার। এই দেশ, এই জাতি, এই সংসার, তাহাকেও তুমি ধন্য করিয়াছ তোমার আশীর্বাদে—তোমার এই বিশ্বজোড়া পরিবারে তুমি মিলনের আনন্দ বিছাইয়া রাখিয়াছ।—তোমার সে আনন্দ, তোমার সে আশ্রয়, তোমার সে আশ্বাসে আমাদের সকলকে তোমার কর্মের, তোমার জ্ঞানের, তোমার প্রেমের যোগ্য করুক। সর্বজীবে, সর্বজীবনে, সকল সাধনায় তোমার সেই প্রেমের পরিচয় জাগিয়া উঠুক।

গিরীশ মনে করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে চাহিল—"তোমার সংসারে, বিধাতা, ফাঁকির জায়গা নাই। যেখানে যত ফাঁকি, তুমি শত চক্ষু দিয়া তাহা দেখ। যেখানে যত শক্তি তুমি শত পথে তাহা বিকশিত করো। কে ফাঁকি দিবে তোমাকে কোন্ ছলনায়? যোগ্যকে তুমি সম্মান দিয়াছ—মানুষকে শক্তি দিয়া করিয়াছ তোমার সেবার যোগ্য।"

মেঘাচ্ছন্ন চিত্তে রাজীব মনে মনে জপ করিতে চাহিল, "সংসারে গৃহে তোমার মিলনের আসরই পাতা। আজ সেই আসরে আবার আমাদের কয়জনকে একত্রিত করিলে বিধাতা, তুমি মহামিলনের অধীশ্বর। দেশ ছাড়িয়া, আশ্রয় ছাড়িয়া, আরাম ছাডিয়া আমরা কত দূরে ভ্রমণ করিলাম —কত দেখিলাম, কত শুনিলাম তোমার মহিমা। কত বিভ্রান্তও হইলাম তোমার মহিমা ভুলিয়া নিজের অহমিকায়। হে মানুষের অধীশ্বর, তুমি ত কোনো মানুষকেই ত্যাগ কোরো না।—এই দেশের মানুষকে এই সমাজের মানুষকেও তুমি ত্যাগ করো নাই। আমরা তাহাদিগকে ত্যাগ করিব কোন্ স্পর্ধায়? আমাদের রক্তের রক্ত, আমাদের প্রাণের প্রাণ, আমাদের বুকের তলাকার হৃদপিণ্ড সেই আমাদের দেশের মানুষ।—তুমিই সে হৃদ৷পণ্ডের রক্ত, সেই শ্বাসযন্ত্রের বায়ু, সেই মস্তিষ্কের চেতনা! হে মহাবায়ু, হে চৈতন্যস্বরূপ, আমাদের এক করো, এক করো, এক করো। হে একমেবোদ্বিতীয়ং, আমরা তোমার রাজ্যে যেন এক হই, তোমার মধ্যে যেন এক হই।'

বিভূতিশঙ্কর ভাবে—জোয়ারের জল বহিয়া চলিয়াছে, নূতন মাটি রাখিয়া যাইতেছে। যেখানে সে জল ঠেকিয়া যায় সেখানে তাহা বদ্ধ, পচা, কীটাণুময়। কিন্তু জোয়ারের জল ভাসায়ইা লইয়া যায় সকল আবর্জনা।

দালানে আসন পাতা। কোট-প্যাণ্টলুন-পরা গিরীশ জুতা খুলিতে লাগিল। জ্ঞানের পার্শ্বে বসিবে শৈল। 'এসো'—রাজীব ডাকিতেছে। সলেস বুট আঁটা পায়ে শৈল দাঁড়াইয়া পড়িল। সর্বনাশ! জুতা খুলিতে হইবে নাকি! ছিঃ ছিঃ। পা নগ্ন হইবে না অবশ্য—মোজা পায়ে আছে। শৈল'র কপাল বিরক্তিতে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, একেবারে হিন্দু বাড়ি করে ফেলেছ। অমন করে পা মুড়ে বসে খাওয়া যায়!

বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল রাজীবের আপাদমস্তকে। এই সেই শৈলী! স্থির নিষ্কম্প দৃঢ়তায় আর এক পর্দা নীচে নামিয়া গেল রাজীবের কণ্ঠ; হিন্দুর বাড়িতে হিন্দুর মতই ব্যবস্থা; তা ত্যাগ করব কোন্ স্পর্ধায়?

জোয়ারের জলে ভাসিয়া যায় সকল আবর্জনা!

—শেষ—